সেবা
প্রকাশনী
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৩৩
রকিব হাসান

ভলিউম-৩৩

তিন গোয়েন্দা

৯৭, ৯৯, ১০২

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1388-3
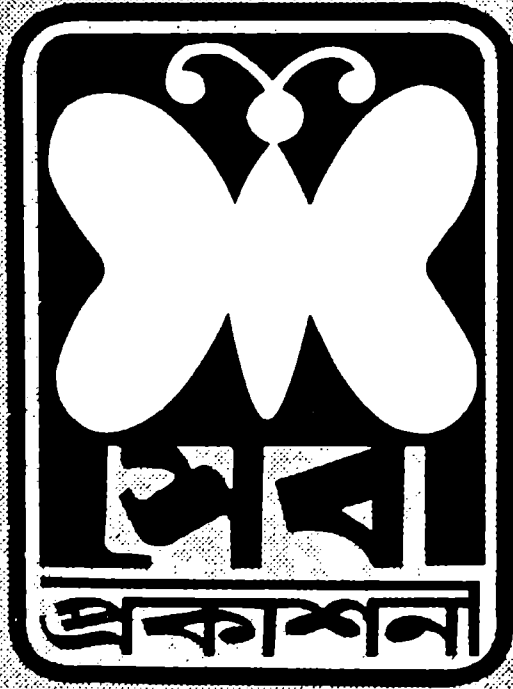
পঁয়ষট্টি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-33
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নামঃ
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৬১/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৬৫/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৭১/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৬৯/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)	
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৬৫/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৫৫/-

শয়তানের থাবা
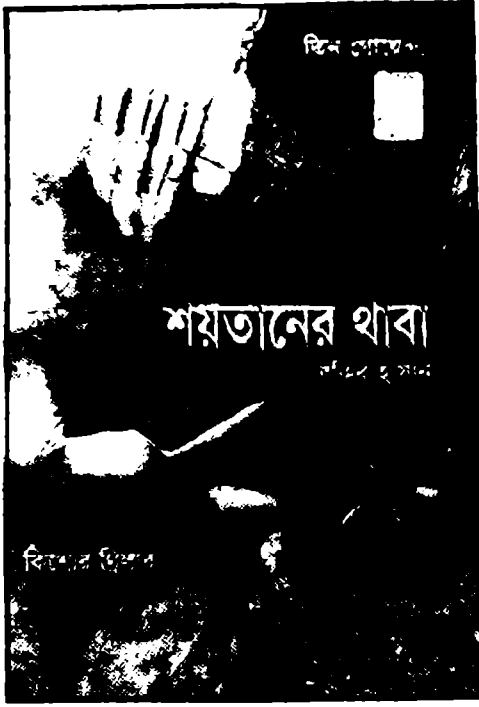
প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

'কাজটা কি?' জানতে চাইল রবিন।

'সব কথা বলার সময় নেই,' গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন বললেন, 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছি। তোমাদের কাজ হলো, জেটিতে গিয়ে ব্ল্যাক প্যারট নামে একটা জাহাজের ওপর নজর রাখা। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখা। জাহাজটার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না আমি, কেবল ধারণা করছি আমার কেসের সঙ্গে ওটার কোন সম্পর্ক আছে।'

হতাশ মনে হলো কিশোরকে। ভিকটর সাইমনের জরুরী তলব পেয়ে ভেবেছিল কোন কেসটেস হবে। বলল, 'অতি সহজ কাজ।'

হাসলেন সাইমন। 'কখন যে কঠিন হয়ে যাবে, টেরও পাবে না।'

'কিছু দেখলে কি আপনাকে ফোন করব?'

'না। সময় করে আমি তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তখন যা বলার বলবে।'

এই সময় ঘরে ঢুকল সাইমনের ভিয়েতনামী চাকর নিশান জাং কিম। বলল, 'স্যার, রাস্তার ওপাশে একটা লোক। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে। একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সে, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

'তাই নাকি?' উঠে দাঁড়াল রবিন, 'যাই, কথা বলে আসি ওর সঙ্গে। কেন চোখ রেখেছে জিজ্ঞেস করব।'

'না, না, যেয়ো না,' বাধা দিলেন সাইমন। 'মনে হচ্ছে আমার পিছে লেগেছে। তোমাদের পেছনেও লেগে থাকতে পারে, তবে যেহেতু কোন কেস নেই এখন তোমাদের হাতে, ধরে নেয়া যায় আমার পেছনেই লেগেছে। ওকে যে দেখে ফেলেছি এটা জানতে দিতে চাই না। সাবধান হয়ে যাবে তাহলে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল রবিন, 'তা ঠিক। আপনার কেসটা সম্পর্কে কি একটু ধারণা দেবেন আমাদের?'

জবাব না দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন সাইমন। 'এখুনি বেরোনোর দরকার ছিল আমার। বিপদে ফেলে দিল লোকটা!'

'পেছনের দরজা দিয়ে চলে যান।'

'ওদিকেও যদি আরেকজন বসে থাকে?'

'ছদ্মবেশ নেবেন নাকি?'

'এত সহজে ওদের ফাঁকি দেয়া যাবে বলে মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ফোনের দিকে এগোলেন তিনি, 'দেখি কি করা যায়…'

ডিরেক্টরি দেখে নম্বর বের করলেন। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বললেন, 'মিস্টার গার্ডনারকে ফোন করছি।'

'তিনি কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'গ্যারেজের মালিক। আমার গাড়ি খারাপ হলে তাঁর গ্যারেজেই পাঠাই।'

'গাড়ি খারাপ হয়েছে নাকি আপনার?'

'নাহ্।'

তাহলে গ্যারেজের মালিককে এখন কেন দরকার? অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কিশোরও কোন জবাব দিতে পারল না।

দশ মিনিটের মধ্যে বাইরের চত্বরে একটা পিকআপ থামার শব্দ হলো। ঘরে ঢুকলেন মিস্টার গার্ডনার। মাঝবয়েসী ভদ্রলোক। মাথায় নরম কাপড়ের ক্যাপ, গায়ে ওভারঅল। বিশাল বাঁকা নাক, ঘন ঝোপের মত ভুরু।

'গাড়ি মেরামত করতে ডাকিনি এবার, মিস্টার গার্ডনার।' বুঝিয়ে বললেন সাইমন, 'তার চেয়ে জরুরী একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। আপনার ক্যাপ আর ওভারঅলটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ধার দিন। ছদ্মবেশ নেব, দূর থেকে যাতে চেনা না যায়।'

অবাক হলেন না মিস্টার গার্ডনার। সাইমনের বন্ধু তিনি, অনেক দিনের পরিচয়। এ রকম সাহায্য আরও করেছেন। কিছুই জানতে চাইলেন না। ক্যাপ আর ওভারঅলটা খুলে দিলেন। দুজনে চলে গেলেন বেডরুমে। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন।

'বাহ্, চমৎকার,' প্রশংসা করল কিশোর। 'দুজনকে এখন যমজ ভাই বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

এই সময় ঘরে ঢুকল আবার কিম। থমকে দাঁড়িয়ে একবার এঁর দিকে একবার ওঁর দিকে তাকাতে লাগল।

হেসে বললেন সাইমন, 'অবাক হবার কিছু নেই, কিম। গোলমালটা তুমিই পাকিয়েছ।'

'আমি!' আরও অবাক কিম।

'একটা লোক নজর রাখছে এ কথা তুমি এসে না বললে এ সবের প্রয়োজন হত না।' কিশোর আর রবিনের দিকে ফিরলেন ডিটেকটিভ, 'শোনো, মিস্টার গার্ডনারের পিকআপ নিয়ে আমি বেরিয়ে যাব। ঘন্টাখানেক পর আমার গাড়িটাতে করে তাঁকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। তিনি পিকআপ নিয়ে চলে যাবেন, তোমরা আমার গাড়ি বাড়িতে রেখে যাবে। প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছ?'

মাথা কাত করল কিশোর।

'কিছু খাবেন?' জানতে চাইল কিম।

'না,' সাইমন বললেন, 'সময় নেই। খাবার রেডি রাখো। কিশোররা ফিরে এলে ওদের দিতে হবে।'

'মুসা থাকলে ভাল হত,' কিম বলল। মুসা খায় প্রচুর, রান্নার তারিফও করে প্রচুর, সে জন্যে তাকে খাইয়ে আনন্দ পায় সে।

'মুসা গেছে বেসবল প্র্যাকটিস করতে,' হেসে বলল কিশোর, 'অতএব আজ তাকে বাদ রাখতে হবে, কিম। আমাদের দুজনকে খাইয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে।'

'আজকের তালিকায় ইঁদুর-ফিঁদুর নেই তো?' শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তাহলে ভাই আগেই বলে দিন...'

তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল কিম, 'না না, ভয় নেই, ওসব না, খুব ভাল জিনিস আছে আজ।'

নিশ্চিন্ত হতে পারল না রবিন, 'কি?'

দাঁত বের করে হাসল কিম, 'কাল রাতে টেলিভিশনে খাবারের অনুষ্ঠানে দেখিয়েছে।'

'আপনি যে সব অনুষ্ঠান দেখেন তাতে তো দেখায় যত অখাদ্য-কুখাদ্য...'

জোরে জোরে হাত নাড়ল কিম, 'আরে বাবা, বলছি তো ভাল জিনিস। দেখলে খুশি হবে। কুখাদ্য নয়। খাঁটি বাংলাদেশী জিনিস। রাঁধতেও যেমন মজা, খেতেও তেমনি—ভাত, ডাল, আলুর ভর্তা, বেগুনের ভর্তা, কচুর ভর্তা, ইলিশ মাছ ভাজা—অবশ্যই আমেরিকান ইলিশ...'

'থাক থাক, আর বলতে হবে না,' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রবিনের মুখ। 'অবশ্যই আসব খেতে। দেখি, পারি তো মুসাকেও নিয়ে আসব। অমন সুযোগ মিস করেছে শুনলে হার্টফেল করেই মারা যাবে বেচারা।'

সবাইকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাইমন।

জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা।

পিকআপে চড়লেন সাইমন। তিনি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওরা দেখল রাস্তার ওপাশে একটা গাছের আড়াল থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে আবার সরে গেল। পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না।

'কাজ হয়েছে,' খুশি হয়ে বলল কিশোর, 'ফাঁকিতে পড়েছে লোকটা।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?'

'অনেকক্ষণ। মনে হচ্ছে মিস্টার সাইমনকে বেরোতে না দেখলে যাবে না সে,' হেসে মিস্টার গার্ডনারের দিকে তাকাল কিশোর।

মিস্টার গার্ডনারও হাসলেন।

চা দিয়ে গেল কিম।

খেতে খেতে রবিন বলল, 'ব্ল্যাক প্যারট, নামটাই জানি কেমন!'

'কাল সকালে যাব বন্দরে, নজর রাখতে,' কিশোর বলল, 'যাকগে, সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত রাস্তার ওপাশের লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।'

চা খেয়ে আবার জানালার কাছে এল রবিন। তাকিয়ে রইল গাছটার দিকে। মিনিট দশেক একভাবে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'কই, আর তো

মাথা বের করে না! চলে গেল নাকি?'

'যাবে না,' কিশোর বলল। 'আছে গাছের ওপাশেই। গাড়ির শব্দ না পেলে তাকাবে না।'

মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল। এক ঘণ্টা পর যেতে বলেছেন সাইমন। তাই বসে থাকতে হলো মিস্টার গার্ডনারসহ ওদের তিনজনকে।

একটু পর পর উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখে আসে। শেষে আর থাকতে না পেরে বলল, 'আমি যাচ্ছি, দেখে আসিগে ওকে।'

কিশোর বাধা দেয়ার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

জানালার কাছে দাঁড়াল কিশোর।

গাছটার কাছে গিয়ে ওটার অন্যপাশ দেখে জানালার দিকে ফিরে হাত নেড়ে বোঝাল রবিন, কেউ নেই। ফিরে এল।

কিশোর বলল, 'ওভাবে বেরোনো উচিত হয়নি তোমার...'

'লোকটার চেহারা দেখতে চেয়েছিলাম। তা ছাড়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, ভাবলাম, মিস্টার সাইমনের পিছু নিতে পারবে না আর...'

ঠিক এই সময় রান্নাঘর থেকে শোনা গেল কিমের চিৎকার, 'অ্যাই মিয়া, অ্যাই অ্যাই, তুমি এখানে কি করছ!'

দুই

রান্নাঘরে দৌড়ে এল দুই গোয়েন্দা। মিস্টার গার্ডনারও এলেন।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, কিম?'

'আরে দেখো না, একটা লোক, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। চিনি না। জিজ্ঞেস করলাম, কে, জবাব দিল না, ঘুরে দৌড় মারল। ওই যে, যাচ্ছে।'

একটা লোককে দৌড়ে রাস্তায় উঠে যেতে দেখল কিশোর। রবিনকে নিয়ে ছুটে বেরোল সে। লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটল। কিন্তু ওরা কাছে যাওয়ার আগেই একটা গাড়িতে লাফিয়ে উঠে চলে গেল লোকটা।

'দুজন ছিল ওরা,' কিশোর বলল। 'একজন বাড়ির পেছন দিকে চোখ রেখেছিল, আরেকজন সামনের দিকে। পেছনের লোকটা এসে উঁকি দিয়েছে রান্নাঘরে।'

'তাই তো দেখছি। কিন্তু কে সে?'

'আমারও সেই প্রশ্ন!'

ফিরে এসে ঘরে ঢুকল ওরা।

কিম বলল, 'পুলিশকে ফোন করা দরকার।'

'লাভ কি?' কিশোর বলল। 'লোকটা পালিয়েছে। পুলিশ এসে এখন আর কি করবে। বরং সতর্ক থাকুন, আবার যদি উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেন, চুপচাপ

একটা ফোন করে দেবেন পুলিশকে।' ঘড়ি দেখল সে। 'এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। মিস্টার গার্ডনার, চলুন, আপনাকে পৌছে দিই।'

'চলো।'

মিস্টার গার্ডনারকে পৌছে দিয়ে, সাইমনের গাড়িটা তাঁর বাড়িতে রেখে নিরাপদেই ইয়ার্ডে ফিরে গেল দুই গোয়েন্দা, আর কোন অঘটন ঘটল না। বিকেলটা কাটাল ওরা মুসার সঙ্গে, ওর বেসবল প্র্যাকটিস দেখে।

পরদিন সকালে বন্দরে রওনা হলো কিশোর আর রবিন। খেলা ফেলে মুসা আসতে পারল না, কিংবা বলা যায় এল না, কারণ তদন্ত করতে গিয়ে এখনও এমন কোন জরুরী ব্যাপার ঘটেনি যাতে তার সাহায্য লাগতে পারে।

সকাল বেলা বন্দরে এখন ব্যস্ত সবাই।

জাহাজটা খুঁজে বের করতে দেরি হলো না। হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই যে, ব্ল্যাক প্যারট।'

ঠেলাগাড়িতে বাক্স বোঝাই করে জাহাজটায় তোলার জন্যে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন কুলি। ক্রেনের সাহায্যে ভারী মাল তোলা হচ্ছে।

'জাহাজে না উঠলে কিছু জানতে পারব না,' রবিন বলল।

কথা বলল না কিশোর। তার সঙ্গে যেতে ইশারা করল। হাতে মালের তালিকা নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক, জাহাজের ফার্স্ট মেট, তার কাছে এসে দাঁড়াল। রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'ও আমার বন্ধু। জাহাজ দেখার খুব আগ্রহ আমাদের। কয়েক মিনিটের জন্যে কি ওঠার অনুমতি দেবেন ক্যাপ্টেন?'

প্রথমে অবাক হলো লোকটা। তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে। আঙুল নেড়ে ধমকে উঠল, 'যাও, ভাগো!'

কিশোর আর রবিন দুজনেই লক্ষ করল, লোকটার আঙুলে বিশাল এক আঙটি, তাতে বিচিত্র একটা চিহ্ন আঁকা।

'আহ্হা, রাগ করছেন কেন? আমরা তো শুধু...'

'যাবে, নাকি ঘাড়ে হাত দেব?'

বোঝা গেল, সামান্যতম ভদ্রতার ধারও ধারে না এই লোক। এর কাছে কোন আবদার খাটবে না। রবিনকে নিয়ে সরে এল কিশোর।

ফুঁসে উঠল রবিন, 'আস্ত একটা ছোটলোক!'

'আস্তে বলো। শুনতে পেলে জাহাজে ওঠার আশা একেবারে খতম হয়ে যাবে।'

'এখনও আশা করো নাকি তুমি!'

'উপায় তো একটা বের করতেই হবে।'

দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজটার ওপর নজর রাখল ওরা। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। এসে গেল সুযোগ। ঠেলাগাড়িতে করে মাল নিয়ে গিয়ে জাহাজের ধারে জেটিতে স্তূপ করে ফেলা হয়েছে। কুলি যা লাগানো হয়েছে তাতে কুলাচ্ছে না। আরও লাগবে—সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো ফার্স্ট মেটকে জানাল ডেকে দাঁড়ানো অন্য এক নাবিক।

কুলি লাগবে, শোনামাত্র এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।
দেখেই গর্জে উঠল ফার্স্ট মেট, 'আবার এসেছ!'
'কুলি লাগবে বললেন না?' নিরীহ স্বরে বলল কিশোর, 'আমরা কাজ করতে চাই।'
ভাল করে ওদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লোকটা। গায়ে জোর আছে কিনা, মাল তুলতে পারবে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ, করতে পারো। টাকা কিন্তু বেশি পাবে না, আগেই বলে দিচ্ছি।'
'কত পাব?'
খুব কম করে বলল লোকটা। এই টাকায় কোন কুলিই কাজ করবে না। কিন্তু রাজি হয়ে গেল কিশোর। সে তো আর টাকার জন্যে কাজ করতে চাইছে না, কোন একটা ছুতোয় জাহাজে উঠতে চায় কেবল।
কাজটা কঠিন। লেগে রইল ওরা। তদন্তের কোন অগ্রগতি হচ্ছে না, সারাক্ষণ ওদের পেছনে লেগে আছে লোকটা। একটা মুহূর্তের জন্যে অন্য কোন দিকে সরতে দিচ্ছে না। এ ভাবে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না, তবু হাল ছাড়ল না ওরা।
দুপুরের পর একটা ভারি মাল বহন করতে গিয়ে পা হড়কাল রবিনের। কাঠের বাক্সটা আছড়ে পড়ল ডেকে। শব্দ শুনে এগিয়ে এল জাহাজের ফার্স্ট মেট। কড়া গলায় ধমক দিয়ে বলল, 'অ্যাই, কি হচ্ছে কি! গায়ে জোর নেই...'
কিশোর বলল, 'পায়ের নিচে একটা দড়ি পড়ল ওর, তাই...'
'দড়ি তো পড়বেই! দেখে হাঁটতে পারো না!'
'আসলে...'
'কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না! এ সব অকেজো কুলির দরকার নেই আমাদের। কটা বাক্স তুলেছ? টাকা নিয়ে বিদেয় হও।'
ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না, বলে অনেক অনুরোধ করল দুজনে। কোন কথাই কানে তুলল না লোকটা। ওদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল।
দূরে গিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে রবিন বলল, 'এত কষ্ট করে কোন লাভই হলো না। সব পণ্ড করলাম।'
'আর কিছুক্ষণ থাকলেও লাভ হত না। জানতে পারতাম না কিছু। শকুনের নজর রেখেছে ব্যাটারা!'
'কি করবে?'
'কি আর করব। মনে হয় না কিছু দেখতে পাব, তবু থাকি আরও কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ি ফিরে যাব।'
সন্ধ্যায় ওঅর্কশপে বসে কি করে জাহাজে ওঠা যায় এ নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় এল মুসা। সব শুনে হাসতে লাগল। 'শেষমেষ তাহলে কুলিগিরি করে এলে।'

'তাতেও যদি কোন ফায়দা হত!' রাগ করে বলল রবিন। 'বেকার খাটা খাটলাম!'

রাতের খাওয়ার আগ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে গেল ওরা।

রবিন বলল, 'আচ্ছা, এক কাজ তো করতে পারি। নাবিকের ছদ্মবেশ নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ি না কেন?'

'তা ওঠা যায়,' মাথা দোলাল কিশোর, 'রাতের বেলা, অন্ধকারে। তবে তার পরেও বিপদের সম্ভাবনা থাকবে যথেষ্ট। ব্ল্যাক প্যারটের সব নাবিককেই নিশ্চয় চেনে ফার্স্ট মেট।'

'ঝুঁকি নিতেই হবে, আর কি উপায়!'

তা বটে। রাতের খাওয়া সেরে নাবিকের ছদ্মবেশে আবার বন্দরে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। জেটিতে আগের জায়গায় দেখতে পেল না জাহাজটাকে। একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, সন্ধ্যার পর পরই জেটি ছেড়ে চলে গেছে ওটা। ওদের পরনে নাবিকের পোশাক দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ব্ল্যাক প্যারটের খোঁজ করছ কেন? চাকরি দরকার? নাওনি, ভাল করেছ। জঘন্য সব লোক ওটার। কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, ব্যবহারও খুব খারাপ। সকালে এসো, নতুন একটা জাহাজ আসবে—সী কিং, চেষ্টা করলে ওতে কাজ পেয়ে যাবে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

ফেরার পথে আক্ষেপ করে রবিন বলল, 'কোনই লাভ হলো না। কিচ্ছু করতে পারলাম না। মিস্টার সাইমন খামোকাই দায়িত্ব দিয়েছেন এবার আমাদেরকে।'

তিন

বাড়ি ফিরলে কিশোরকে দেখে মেরিচাচী জানালেন, 'মিস্টার সাইমন ফোন করেছিলেন। তোকে চাইলেন। বললাম, বেরিয়েছিস। ফোন নম্বর চাইলাম। তিনি বললেন, তিনিই যোগাযোগ করবেন। একটা বইয়ের নাম দিয়ে বললেন ওটা তোদেরকে খুঁজে বের করতে। পাওয়া নাকি মুশকিল হবে, কারণ বহুদিন আগেই ওটার প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। আর ছাপা হয়নি।'

'কি বই?' খুব আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল রবিন।

এক টুকরো কাগজ বের করে দিলেন। তাতে বই আর লেখকের নাম লিখে রেখেছেন।

বইটার নাম Essays in Criminology, আর লেখকের নাম Weaver.

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার সাইমন আবার কবে ফোন করবেন, বলেছেন কিছু?'

'বললেন দু-চার দিনের মধ্যেই।'

রাত বেশি হয়নি। এত তাড়াতাড়ি শুতেও যাবে না, তাই আবার বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। রকি বীচের পুরানো বইয়ের দোকানগুলোতে বইটা খুঁজতে। কিন্তু পাওয়া গেল না। অবশ্য তাতে নিরাশ হলো না ওরা, মিস্টার সাইমন বলেই দিয়েছেন পাওয়া কঠিন হবে।

'কাল লস অ্যাঞ্জেলেসে যাব,' রবিন বলল। 'কি বলো, কিশোর?'

'তা যাওয়া যায়।'

মুসা বলল, 'বই খুঁজতে? আমি যেতে পারব না। আমার কাজ আছে।'

হেসে ফেলল রবিন। কাজ না থাকলেও যেতে রাজি হতে চাইত না মুসা। বইয়ের ব্যাপারে ওর আগ্রহ নেই। আর পুরানো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটাটা তার জন্যে যেমন রোমাঞ্চকর, মুসার জন্যে ততটাই বিরক্তিকর।

সুতরাং পরদিন সকালে তাকে বাদ দিয়েই লস অ্যাঞ্জেলেস রওনা হতে হলো কিশোর আর রবিনকে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর চোরাগলির মধ্যে একটা দোকানে বইটা পাওয়া গেল। দামদর করছে কিশোর, এই সময় একটা শো-কেসের সামনে থমকে দাঁড়াল রবিন। একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। এগিয়ে এসে কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। বইটা দেখিয়ে বলল, 'দেখো, প্রতীকটা চিনতে পেরেছ? ফার্স্ট মেটের আংটিতে দেখেছিলাম!'

বইয়ের কভারে ছাপ দেয়া লাল রঙের চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। চিনতে সে-ও পেরেছে। ঠিকই বলেছে রবিন, ফার্স্ট মেটের আঙটিতে এই ছাপই ছিল।

নামটা অদ্ভুত: Empire of the Twisted Claw.

দোকানের মালিক জানতে চাইল, 'ইনটারেস্টিং কিছু পেয়েছ?'

বইটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'দাম কত?'

নাকের ওপর ঠিকমত চশমা বসাল দোকানি, আনমনে মাথা নেড়ে বলল, 'আসল দাম জানতে হলে খুলে দেখতে হবে। তবে ওই র‍্যাকের কোন বইয়ের দামই হাজার ডলারের নিচে নয়। বেশিও আছে।'

হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। বলে কি! একটা বইয়ের দাম এত! হতাশ হলো খুব। ওই বই কেনার সামর্থ্য তাদের হবে না।

ওদের বিমর্ষ চেহারা দেখে যেন মায়া হলো দোকানির। মুচকি হেসে বলল, 'দেখতে দিতে পারি, তবে পাতা ছিঁড়তে পারবে না।'

বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। সত্যি বলছে দোকানি?

চাবি দিয়ে তালা খুলে বইটা বের করে রবিনের হাতে ধরিয়ে দিল দোকানি। বলল, 'যাও, যতক্ষণ ইচ্ছে দেখো।'

কাছেই একটা রীডিং টেবিল। বইটা নিয়ে এসে তাতে বসল রবিন। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে তার।

পাশে বসে কিশোরও দেখার জন্যে গলা বাড়াল।

কপিরাইট কবের, সেটা দেখেই বোঝা গেল বইটা ছাপা হয়েছে ১৭৮৬ সালে।

পাতার পর পাতা উল্টে চলল রবিন। বেরিয়ে আসতে লাগল এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকের ক্যারটল নামে এক ভয়ানক জলদস্যুর গল্প। তার জাহাজের নাম ছিল ব্ল্যাক প্যারট। আটলান্টিক মহাসাগরে চলাচলকারী বাণিজ্য-তরীগুলোর কাছে সে ছিল সাক্ষাৎ শয়তান, মূর্তিমান আতঙ্ক।

'তারমানে,' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রবিনের, 'আমরা যে জাহাজে তদন্ত করতে গেছি, ওটার নাম ব্ল্যাক প্যারট রেখেছে যে, সে ক্যারটলের কথা জানে!'

'সে-রকমই লাগছে,' একমত হলো কিশোর।

আবার পড়তে শুরু করল রবিন।

জানা গেল, ক্যারিবিয়ান সাগরের কোনখানে একটা দ্বীপ আবিষ্কার করেছিল ক্যারটল। ওটাকে তার হেডকোয়ার্টার করেছিল। নিজস্ব একটা রাজ্য গড়ে তুলেছিল ওখানে, নাম দিয়েছিল এম্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্ল, অর্থাৎ বাঁকানো বা বিকৃত দাঁড়ার রাজত্ব।

'বাপরে!' পড়তে পড়তে বলল রবিন, 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বটে লোকটার!'

'এই যে দেখো, এখানে কি লিখেছে,' একটা লাইনে আঙুল রেখে বলল কিশোর। 'দ্বীপে যে কজন আদিবাসী ছিল, সবাইকে জোর করে দলে ঢুকতে বাধ্য করেছে ক্যারটল। লুট করা জাহাজ থেকে ধরে আনা নাবিক আর বণিকদেরও গোলাম বানিয়েছে।'

পড়ে চলল দুজনে। জানা গেল, বাছাই করা লোকদের নিয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতদল গঠন করেছিল ক্যারটল। তাদের দেহবর্মের বুকে আঁকা থাকত লাল প্রতীক—কাঁকড়ার দাঁড়ার মত বাঁকা দাঁড়া, যেটা ছাপা আছে বইটার মলাটে। অবিকল একই জিনিস আঁকা দেখেছে বর্তমান ব্ল্যাক প্যারটের ফার্স্ট মেটের আঙটিতে।

বইয়ের শেষ দিকে বেশ কিছু পাতার লেখা সাগরের নোনা পানি লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। পড়া যায় না। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে না গিয়ে ওসব লেখার মর্ম উদ্ধার করা যাবে না।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'কপাল খারাপ আমাদের! ক্যারটলের হেডকোয়ার্টার কোন দ্বীপটায় করা হয়েছিল, জানতে পারলাম না।'

'বইটা নিয়ে যেতে পারলে কাজ হত!' শুকনো গলায় বলল রবিন।

'অত আশা করে লাভ নেই! আমাদের পড়তে যে দিয়েছে দোকানি, এটাই তার অনেক বেশি ভদ্রতা। বাইরে নিতে দেবে না। আর বলাটাও আমাদের ঠিক হবে না।'

নিরাশ হয়ে বইটা নিয়ে গিয়ে দোকানিকে ফেরত দিল রবিন।

যে বইটা কিনেছে তার দাম মিটিয়ে দিল কিশোর। দোকানিকে অনেক

ধন্যবাদ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

ফেরার পথে বাসে জলদস্যুর বইটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা।

রবিন বলল, 'ইস্, ওই বই যদি আর কোথাও পেতাম আরেকটা!'

'কই আর পাবে,' কিশোর বলল। 'অত সহজে পাওয়া গেলে কি আর অত দাম চাইত দোকানি? শুনলে না বলল, তার জানামতে এ বই আর কারও কাছে নেই।'

'নেই কথাটা আমি মানতে পারছি না।'

'থাকলেই বা কি? খুঁজে বের করবে কি করে?'

জবাব দিতে পারল না রবিন।

চার

বাস স্ট্যান্ড থেকে একটা সান্ধ্য পত্রিকা কিনেছে কিশোর। পড়তে পড়তে পিঠ খাড়া হয়ে গেল একসময়। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল।

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'দেখো,' নিউজটা দেখাল কিশোর, 'ব্ল্যাক প্যারটের কথা লিখেছে! ইঞ্জিনে গোলমাল হওয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'তারমানে তদন্ত করার আরেকটা সুযোগ দিল আমাদের!'

'এবং শেষ সুযোগ!'

'কখন যেতে চাও?'

'আজ রাতেই।'

ইয়ার্ডে পৌঁছে মুসাকে ফোন করল কিশোর। বলল, জরুরী খবর আছে, তাড়াতাড়ি যেন চলে আসে।

মুসা আসার পর সমস্ত খবর তাকে জানানো হলো। রাতের খাওয়ার পর নাবিকের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে।

ডকে এসে ব্ল্যাক প্যারটকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না।

সিঁড়ি নামানো আছে। কোন রকম দ্বিধা না করে উঠে পড়ল ওরা।

ডেকে পাহারা দিচ্ছে একজন নাবিক। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা?'

'নাবিক,' জবাব দিল কিশোর।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এই জাহাজের লোক নও তোমরা। কি চাই?'

'চাকরি···শুনলাম ব্ল্যাক প্যারটে লোক নেয়া হবে···'

'কই, আমি তো কিছু শুনিনি?'

'আমরা শুনেছি, নাহলে কি আর উঠতাম? কার কাছে যেতে হবে, ভাই,

বলুন তো?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল গার্ড। কিশোরের নরম ব্যবহার তাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, কঠোর হতে পারল না। গাল চুলকাল। তারপর কেবিনের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'ফার্স্ট মেটের কাছে যাও।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' বলে দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর, 'এসো। এটাতে চাকরি না পেলে বিপদে পড়ে যাব।'

তাড়াতাড়ি গার্ডের কাছ থেকে সরে এল ওরা।

কেবিনের ছায়ায় এসে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। সন্দেহ হতে পারে ওর, ফার্স্ট মেটকে জিজ্ঞেস করতে যেতে পারে। তার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের।'

'কি করবে এখন?' জানতে চাইল মুসা।

'কার্গো হোল্ডে ঢুকব। কি মাল বহন করছে জাহাজটা, জানতে চাই।'

দিনের বেলা জাহাজে কুলির কাজ করেছে, কার্গো হোল্ড কোনটা, কোথায় মাল রাখা হয় ভালমতই জানা আছে কিশোর আর রবিনের। অন্ধকারেও ঢুকে পড়তে পারবে সেখানে। মুসার অসুবিধে হবে। তাই মই বেয়ে নামার সময় কিশোর রইল আগে, মুসা মাঝখানে, আর সব শেষে রবিন।

কার্গো হোল্ডে ঢুকে টর্চ জ্বালল কিশোর। কাঠের বাক্সে বোঝাই। একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাক্সগুলো।

খুঁজে খুঁজে একটা শাবল বের করল সে। চাড় দিয়ে খুলল একটা বাক্সের ডালা। বৈদ্যুতিক তারের কয়েলে ভরা।

আরও কয়েকটা বাক্স খুলে দেখল ওরা। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চামড়ার তৈরি জিনিসপত্র থেকে শুরু করে মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি অনেক কিছুই আছে। বেশির ভাগ বাক্সের গায়ে আইসল্যান্ডের ঠিকানা লেখা, তারমানে আইসল্যান্ডে রপ্তানি করা হচ্ছে ওগুলো।

'সন্দেহজনক তো কিছু নেই এখানে,' কিশোর বলল।

'নিশ্চয় কোন অবৈধ কাজের কভার-আপ এগুলো,' রবিন বলল। 'এমন জিনিস রেখেছে যাতে পুলিশের সন্দেহ না হয়। ভেতরে ভেতরে কুমতলব আছে ওদের।'

খোঁজা চালিয়ে গেল ওরা।

একটা ধাতব দরজার ওপর মুসার টর্চের আলো পড়ল। তার ওপাশে কি আছে দেখতে গেল।

পাশে এসে দাঁড়াল রবিন, 'কি আছে?'

কিশোর বলল, 'চলো, দেখি।'

হুড়কো সরিয়ে পাল্লা খুলে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। দেখল, ছোট আরেকটা ঘর, স্টোর রুম। এই ঘরটাতেও অনেক কাঠের বাক্স।

বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল মুসা।

ভেতরে ঢুকল কিশোর আর রবিন।

একটা বাক্সের গায়ে আলো ফেলেই শিস দিয়ে উঠল কিশোর,

'বিস্ফোরক!'

ভেতরে কি জিনিস আছে দেখার জন্যে রবিনকে শাবল আনতে বলল সে।

কিন্তু আনা আর হলো না। বাইরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল। নিশ্চয় কিশোরদের ফিরতে দেরি দেখে সন্দেহ হয়েছিল গার্ডের, ফার্স্ট মেটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওখানে ওদের না পেয়ে দল বেঁধে খুঁজতে বেরিয়েছে।

কার্গো হোল্ডের বাইরে এসে দাঁড়াল দুজন। ভেতরে ঢোকা নিয়ে তর্ক করছে।

টর্চ নিভিয়ে দিয়ে শাবল তুলে নিল মুসা। অত সহজে ধরা দেবে না। যে প্রথম ধরতে আসবে, তার কপালে দুঃখ আছে।

হোল্ডের দরজা খোলার শব্দ হলো। টর্চ হাতে ঢুকল একটা লোক।

কিশোর আর রবিনকে ভেতরে রেখে ছোট স্টোর রুমের দরজাটা ঠেলে দিল মুসা। হুড়কো তুলে দিল। চট করে সরে গেল কতগুলো বাক্সের আড়ালে।

সোজা এসে স্টোরের দরজার সামনে দাঁড়াল লোকটা। তারমানে তার জানা আছে, বাইরের কেউ ওখানে ঢুকলে বিপদ। তাই সরাসরি চলে এসেছে ওখানে খুঁজতে। হুড়কোটা লাগানো দেখে সন্দেহ দূর হলো তার। ভাবল, ভেতরে কেউ নেই। কার্গো হোল্ডের মূল ঘরটাতে খুঁজতে শুরু করল।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা আর চালাকির সঙ্গে লোকটার পেছন পেছন ঘুরতে লাগল মুসা, কিছুতেই নিজের গায়ে আলো পড়তে দিল না। কয়েক মিনিট ঘুরে ফিরে দেখে কেউ নেই মনে করে সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। কার্গো হোল্ডের কাছ থেকে সরে গেল পায়ের শব্দ।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে হুড়কো খুলে দিল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'চলে গেছে! বেরিয়ে এসো!'

বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন।

কিশোর বলল, 'আর এখানে থাকা বিপজ্জনক। সমস্ত জাহাজে না পেয়ে আবার আসতে পারে এখানে। এবার আর একা আসবে না। ভালমত খুঁজবে। চলো, সময় থাকতে পালাই।'

নিঃশব্দে কার্গো হোল্ড থেকে বেরিয়ে জাহাজের পেছন দিকে চলে এল ওরা। বেরোনোর সময়ই বুদ্ধি করে এক বান্ডিল দড়ি নিয়ে এসেছে মুসা। জাহাজের পেছনটা যেখানে নির্জন, সেখানে এসে রেলিঙ থেকে দড়ি বেঁধে নিচে পানিতে ঝুলিয়ে দিল।

পুরোদমে খোঁজাখুঁজি করছে নাবিকেরা। সামনের দিকটায়। এই সুযোগে দড়ি বেয়ে পানিতে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকারে জাহাজ আর বোটের ফাঁকফোকর দিয়ে এগিয়ে চলল তীরের দিকে।

রেলিঙে বাঁধা দড়িটা যে কোন মুহূর্তে চোখে পড়ে যেতে পারে নাবিকদের। তার আগেই পালাতে হবে।

রাত বেশি হওয়ায় ডক এলাকা নীরব। অন্ধকারে নিরাপদেই তীরে উঠে পড়তে পারল ওরা। বাড়িঘরের ছায়ায় ছায়ায় সরে এল জেটির কাছ থেকে। ভেজা কাপড় নিয়ে বিপদ হলো। গাড়িতে বাড়তি কাপড় নেই।

কাপড় খুলে চিপে পানি ঝরিয়ে নিয়ে আবার ওগুলোই পরে নিয়ে গাড়িতে চাপল। অস্বস্তি লাগছে। কি আর করা। সহ্য করতেই হবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে মুসা বলল, 'এরপর কোন জাহাজে তদন্ত চালাতে এলে অবশ্যই বাড়তি কাপড় নিয়ে আসব। ভেজা থেকে মরে কে!'

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই ইয়ার্ডে চলে এল মুসা আর রবিন। ওদেরকে নিয়ে বেরোল কিশোর। বন্দরে এল ব্ল্যাক প্যারটকে দেখার জন্যে। কিন্তু এসে জানল, ওরা আসার কয়েক মিনিট আগেই ছেড়ে গেছে জাহাজটা।

পরিচিত এক নিগ্রো নাবিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মুসার। লোকটার নাম জো। ব্ল্যাক প্যারটের ব্যাপারে মুসারা আগ্রহী শুনে অবাক হলো। জাহাজটা সম্পর্কে তারও ধারণা ভাল না। ওটার গন্তব্য কোথায়, ঠিক বলতে পারল না। তবে কথায় কথায় নাকি ওটার এক নাবিক তাকে বলেছে, স্টর্মওয়েলে যেতে পারে।

ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'কানাডার স্টর্মওয়েল?'

মাথা ঝাঁকাল জো, 'মনে হয়। এদিকে আর কোন স্টর্মওয়েল আছে বলে তো জানি না।'

আর কোন তথ্য জানাতে পারল না জো।

ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

ইয়ার্ডে ঢুকেই মেরিচাচীর কাছে মিস্টার সাইমনের মেসেজ পেল, ফিরে এসেছেন তিনি। তবে বাড়িতে যাননি। সন্দেহ করছেন, তাঁর পেছনে স্পাই লেগেছে। বাড়িতে সেদিন যারা চোখ রেখেছিল, তাদের কেউও হতে পারে। একটা হোটেলে উঠেছেন। নাম আর রুম নম্বর দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ওদের যেতে বলেছেন।

তখুনি আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা।

হোটেলে পৌঁছতে দেরি হলো না।

ওদের অপেক্ষাতেই আছেন মিস্টার সাইমন।

কুশল বিনিময়ের পর তদন্তে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, সেটা জানাতে বসল তিন গোয়েন্দা।

বইটার কথা জানাল রবিন। তাতে কি লেখা আছে বলল।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন সাইমন। বললেন, 'দ্বীপের নাম এম্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্রু!'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

কিশোর বলল, 'নামটা অদ্ভুত! ওখানে রাজত্ব করত ক্যারটল নামে এক জলদস্যু।'

পায়চারি শুরু করলেন ডিটেকটিভ। ফিরে এসে তিন গোয়েন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজব গল্প শোনালে। মনে হয় এর সঙ্গে আমার কেসের সম্পর্ক আছে।'

'মানে?' জানতে চাইল কিশোর। রহস্য ঘনীভূত হতে দেখে আগ্রহ বাড়ছে তার।

'এখনও শিওর না আমি। কিন্তু যা শোনালে, তাতে বুঝতে পারছি জটিল হয়ে উঠছে রহস্য।'

চুপ করে রইল কিশোর। মুসা আর রবিনও কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে সাইমনের দিকে।

ওদের মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন তিনি। বললেন, 'তোমাদের সাহায্য দরকার হবে, বুঝতে পারছি। সব কথা খুলেই বলি। ভেগাবল মিউজিয়াম সোসাইটি আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে। কয়েকটা ডাকাতির তদন্ত করতে অনুরোধ করেছে আমাকে। পর পর ডাকাতি হয়েছে চারটে মিউজিয়ামে।'

প্রশ্ন করল কিশোর, 'কি নিয়েছে?'

'এই কেসের সেটাই সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার,' সাইমন বললেন। 'সব কটা মিউজিয়াম থেকে একই জিনিস নিয়েছে— ডিসপ্লেতে রাখা জনসন কালেকশন। তাঁর সংগ্রহ করা জিনিসই কেবল চুরি করেছে চোর। নেয়ার আরও বহু দামী দামী জিনিস হাতের কাছে পেয়েছে, ছোঁয়ওনি।'

'জনসন কালেকশন কি জিনিস?' জানতে চাইল রবিন।

সাইমন জানালেন, মিরহ্যাম জনসন একজন মস্ত ধনী, প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন হঠাৎ করে। কয়েক বছর আগে ক্যারিবিয়ানে ডুবে যাওয়া একটা গ্যালিয়ন জাহাজ আবিষ্কার করেন। জাহাজটা বোঝাই ছিল রাজকীয় সম্পদে। মুকুট, রাজদণ্ড এ সবও ছিল। আর ছিল দেহবর্ম, যেগুলোর বুকে আঁকা প্রতীক—লাল রঙের দাঁড়া।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'কাঁকড়া ছিল নাকি ব্যাটারা, দাঁড়া এত পছন্দ কেন!'

রবিন বলল, 'ওসব বর্ম তো পরত ক্যারটলের বিশ্বস্ত প্রহরীরা!'

সামনে ঝুঁকলেন সাইমন, 'সে-জন্যেই তো তোমাদের বিকৃত দাঁড়ার গল্প শুনে অবাক হয়েছি আমি।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'জনসন কালেকশনের কোন জিনিস কি আর কোন মিউজিয়ামে আছে?'

'আছে, মোট দশটা মিউজিয়ামে জিনিসগুলো ভাগ করে দিয়েছেন জনসন। চারটা থেকে চুরি গেছে, বাকিগুলো আছে এখনও।'

'আপনার কি মনে হয় বাকি ছটাতেও চুরির চেষ্টা চালানো হবে?'

'হবে।'

ছেলেদেরকে তাঁর সন্দেহের কথা জানালেন সাইমন— জিনিসগুলো আমেরিকা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। কি ভাবে নেয়া হতে পারে, সেটা নিয়েও ভেবেছেন তিনি। ছোটখাট জিনিস হলে পকেটে কিংবা ব্যাগে ভরে পাচার করা যেত, কিন্তু জিনিসগুলো অনেক বড় বড়।

'ভেবেচিন্তে মনে হলো জাহাজে করে পাচার করাটাই মোটামুটি সহজ হবে,' বললেন তিনি। 'বেআইনী জিনিস বহন করে বলে বদনাম আছে এমন জাহাজের খোঁজ শুরু করলাম তখন। খোঁজ পেলাম দুটো জাহাজের, একটার নাম ব্ল্যাক প্যারট, আরেকটা তার সিসটার শিপ ইয়েলো প্যারট। তথ্য দিল বটে, কিন্তু এর সপক্ষে কেউই কোন প্রমাণ দিতে পারল না। সে-জন্যেই নজর রাখতে বলেছিলাম তোমাদেরকে।'

'রেখেও কিছু করতে পারলাম না,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর।

'একেবারেই পারোনি কথাটা ঠিক না। আমি আরও শিওর হলাম, সত্যি বেআইনী কাজকারবার করে জাহাজটা।' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন সাইমন, 'আমি এখন হ্যারিস মিউজিয়ামে যাব, শেষ চুরিটা ওখানেই হয়েছে। যাবে নাকি?'

সানন্দে রাজি হলো তিন গোয়েন্দা।

ওদেরকে নিয়ে হ্যারিস মিউজিয়ামে এলেন সাইমন।

কিউরেটরের মনমেজাজ খুব খারাপ। বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, অ্যালার্মকে ফাঁকি দিয়ে ওরা ঢুকল কি ভাবে?'

'আমিও না,' স্বীকার করলেন সাইমন। 'অ্যালার্ম সিসটেমের কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি, সব ঠিক আছে।'

ফোন বাজল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন কিউরেটর। ওপাশের কথা শুনে বাড়িয়ে দিলেন সাইমনকে, 'আপনার। ভেগাবল মিউজিয়াম সোসাইটির মিস্টার হাচিনস।'

শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে গেলেন সাইমন। রিসিভার রেখে তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললেন, 'এখুনি লস অ্যাঞ্জেলেসে যেতে হবে আমাদের। কার্টার মিউজিয়ামে চুরি হয়েছে। জনসন কালেকশনগুলো নিয়ে গেছে।'

তাড়াহুড়ো করে হ্যারিস মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। লস অ্যাঞ্জেলেস রওনা হলো।

কার্টার মিউজিয়ামে এসে সাইমনকে তদন্তে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা।

দেখেশুনে ডিটেকটিভ বললেন, 'এটাতেও অন্যগুলোর মত করেই ডাকাতি হয়েছে। অ্যালার্ম সিসটেম ঠিক, চুরির সময় অ্যালার্ম দেয়নি, অথচ জিনিসগুলো গায়েব।'

'সিসটেমটা কাজ করে কি ভাবে?' জানতে চাইল কিশোর।

'চালু করে দিলে ঘরের সবখানে অদৃশ্য আলোক রশ্মি ছড়িয়ে যায়। ফটোইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে কাজ করে ওগুলো।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'কেউ ঘরে ঢুকলে বাধা পায় রশ্মি। সঙ্গে সঙ্গে

চালু করে দেয় অ্যালার্মের ঘন্টা।'

'খুব কার্যকর পদ্ধতি,' কিশোর বলল, 'এই জিনিসকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকল কি করে চোর! এমন উচ্চতায় থাকে আলোক রশ্মিগুলো, কেউ হেঁটে ঢুকলে ওগুলোতে বাধা পড়বেই। বেলুনের মত উড়ে উড়ে যদি ঢোকে, তাহলে আলাদা কথা...'

মুসা বলল, 'মানুষ কখনও বেলুনের মত উড়তে পারে না, ভূতে পারে...'

'ভূতুড়ে কাণ্ডই!' রবিন বলল।

তদন্ত শেষ করে রকি বীচে ফিরে এল ওরা। রহস্যটা নিয়ে আলোচনার জন্যে নিজের বাড়িতে ওদের নিয়ে গেলেন সাইমন।

'দশটার মধ্যে পাঁচটা মিউজিয়ামের জিনিস নিয়ে গেছে,' বললেন তিনি, 'বাকি রইল আরও পাঁচটা। এরপর কোনটাতে আঘাত হানবে চোরেরা, জানি না। সব কটাতে একসঙ্গে চোখ রাখতে হলে লোক লাগবে পাঁচজন, আমরা আছি চারজন, আরেকজন কোথায় পাব?'

'ল্যারি কংকলিনকে নিলেই হয়?' প্রস্তাব দিল কিশোর।

সাইমনের ব্যক্তিগত বিমানের পাইলট কংকলিন। গোয়েন্দা-গিরিতেও সহায়তা করে।

'তা হয়,' সাইমন বললেন। 'বেশ, একেকটা মিউজিয়ামের জন্যে একজন করে হয়ে গেলাম। কি করে নজর রাখব সেটা বোঝা দরকার।'

আলোচনা চলল। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে প্ল্যান করল গোয়েন্দারা।

পরদিন দুপুরে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। চুরি হলে রাতে হবে, সুতরাং পাহারাটা রাতেই দেয়া প্রয়োজন। ঠিক হয়েছে, একেকজন যাবে একেক শহরে। সবগুলো শহরই ক্যালিফোর্নিয়ায়। তার ডিউটি পড়েছে নিকারসন মিউজিয়ামে। সেখানে চলল সে।

ফোন করে সাইমন আগেই সব বলে রেখেছেন কিউরেটর জর্জ মাইকেলকে। কিশোর পরিচয় দিতেই তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে গেলেন তিনি।

জনসন কালেকশনগুলো দেখতে চাইল কিশোর।

কয়েকটা এগজিবিট রুমের পাশ দিয়ে ওকে নিয়ে এলেন মাইকেল। পুরানো আমলের চমৎকার একটা বাড়ি। মার্বেল পাথরে তৈরি মেঝে আর স্তম্ভ। বড় একটা ঘরে ঢুকল ওরা। প্রাচীন জিনিসপত্র সাজানো। এক কোণে রাখা হয়েছে জনসন কালেকশন।

'ওই যে ওগুলো,' হাত তুলে দেখালেন কিউরেটর।

এগিয়ে গেল কিশোর। বড় বড় কাঁচের কেসে সাজানো রয়েছে মুকুট, রাজদণ্ড আর দণ্ডের মাথায় বসানোর নানা ধরনের গোলক। একধারে একটা মানুষ-সমান দেহবর্ম। বুকে লাল রঙে আঁকা দাঁড়ার বিকৃত রূপ।

'আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় জিনিসের একটা ওই বর্ম,' মাইকেল বললেন।

দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি ধরনের অ্যালার্ম সিসটেম

ব্যবহার করেন আপনারা?'

'জানালা, দরজা আর দামী জিনিস ভরা কাঁচের বাক্সগুলোকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছি আমরা। তবে পুরো ঘর জুড়ে অ্যালার্মের ব্যবস্থা এখনও করতে পারিনি, টাকা নেই। টাকা আসার কথা আছে, পাওয়া গেলেই করে ফেলব। ফটো ইলেকট্রিক সেল বসানোর ইচ্ছে।'

'রাতে গার্ড থাকে?'

'অবশ্যই। চারজন। আরও কয়েকজন আসবে। চুরি শুরু হতেই সোসাইটিকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছি আরও লোক পাঠানোর জন্যে।'

এই সময় মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী এসে জানাল কিউরেটরের ফোন।

কিশোরকে দেখতে বলে তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন মাইকেল।

আরও কাছে থেকে জনসন কালেকশনগুলো দেখতে লাগল কিশোর। দেখা শেষ করে চলে এল আরেকটা ঘরে। এটাতে রয়েছে পাথরে তৈরি বড় বড় পুতুল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ থেকে আনা।

এ সব পুতুল সম্পর্কে পড়েছে সে। বিস্ময়কর একেকটা জিনিস। অবাক হয়ে দেখতে লাগল। টেরই পেল না পেছনে নড়ে উঠেছে একটা বিশাল ভারী পুতুল। উপুড় হয়ে পড়তে শুরু করল তার ওপর।

ছয়

ঘরের চকচকে পালিশ করা মেঝে বাঁচিয়ে দিল ওকে। পুতুলটা নড়ার প্রতিফলন দেখতে পেল মেঝেতে। সেই সঙ্গে সতর্ক করল তাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। চট করে ঘুরে তাকাল সে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একপাশে।

বিকট শব্দ করে মেঝেতে পড়ল পুতুলটা।

ছুটে এলেন কিউরেটর, একজন গার্ড আর কয়েকজন কর্মচারী।

'কি হয়েছে?' চিৎকার করে উঠলেন মাইকেল।

ছড়ে যাওয়া কনুই ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'আরেকটু হলেই ভর্তা বানিয়ে দিয়েছিল! পড়ে গেল হঠাৎ!'

পুতুলটা যে পড়েছে বিশ্বাস করতে পারছেন না কিউরেটর। ওটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়ে কি করে!'

একজন কর্মচারী বলল, 'গোড়াটা অনেক ভারী, পড়ার কথা নয়!'

'আপনাআপনি পড়তও না,' কিশোর বলল। 'ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে কেউ।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন মাইকেল। 'বলো কি! এটা ফেলতেও তো জোরের দরকার। তারমানে সাংঘাতিক শক্তি লোকটার শরীরে। কিন্তু ফেলল কেন?'

এত লোকের সামনে বলতে চায় না কিশোর। কিউরেটরকে একপাশে ডেকে নিল। বলল, 'আমার ধারণা, এরপর চুরির তালিকায় এই মিউজিয়ামটার নাম। আমি কে, কেন এসেছি, এটা চোরেরা জেনে গেছে। পুতুলটা ফেলে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বাধা দূর করতে চেয়েছে।'

'অতি-কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না? আমার মনে হয় এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা।'

'হতে পারে। তবে আমার পরামর্শ চাইলে বলব, এখন থেকেই পাহারা দেয়ার জন্যে আরও বেশি লোক রাখার বন্দোবস্ত করুন।'

'কিংবা আরেকটা কাজ করতে পারি, মনে মনে ভেবেই রেখেছি আমি এটা,' কিউরেটর বললেন, 'জনসন কালেকশনগুলো মিউজিয়ামের মাটির নিচের ঘরে নিয়ে যেতে পারি। ওখানে একটা স্টোররুম আছে আমাদের। দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে আসব।'

'তারপরেও প্রহরী বাড়াতে বলব। তালা দেয়া দরজা সব সময় চোর ঠেকাতে পারে না।'

'বেশ,' যেন হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলেন মাইকেল। 'তবে বড়জোর দুজনের ব্যবস্থা করতে পারি। বাকিদেরকে তাদের রেগুলার ডিউটি করতে হবে।'

'পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন...'

'প্রশ্নই ওঠে না। পুলিশ এলেই খবরের কাগজে চোখ পড়বে। দেবে উল্টোপাল্টা খবর ছড়িয়ে। লোকে ভাববে কি জানি কি ঘটছে এই মিউজিয়ামে। ভাববে, এমন অযোগ্য কিউরেটর রেখেছে, যে সাধারণ একটা চুরিও সামলাতে পারে না। নাহ্, পুলিশ ডাকতে পারব না আমি।'

কিউরেটরের কথা অবাক করল কিশোরকে। মিউজিয়ামের সংগ্রহ খোয়া যাওয়ার চেয়ে নিজের বদনামের কথা বেশি ভাবছেন ভদ্রলোক?

তার ভাবনা বুঝতে পেরেই যেন বললেন আবার, 'তা ছাড়া চোর যে আসবেই তার কোন প্রমাণ নেই। কেবল তোমার অনুমানের ওপরই ভরসা।'

ভরসা যে করতে চান না, স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন কিউরেটর।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। তার আর কিছু করার নেই।

এই সময় ঘরে ঢুকল লম্বা, পেশীবহুল এক লোক। হাতে একটা বড় কাঁচি। সেটা রাখল যন্ত্রপাতি রাখার বাক্সের ওপর। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল।

লোকটার ভাবভঙ্গি ভাল লাগল না কিশোরের। কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে?'

'আমাদের মালী। ফুলগাছের যত্ন ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে।'

'কতদিন ধরে আছে?'

'এই হপ্তাখানেক। কপাল ভাল, পেয়ে গেছি। এ কাজের লোকই আজকাল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এই বেতনে। খুব কম টাকা দিই।'

কিউরেটর জানালেন লোকটার নাম ফেরেট। আগে যে জায়গায় কাজ

করেছে, সেখানকার মালিকের কাছ থেকে প্রশংসা পত্র নিয়ে এসেছে।

ওসব প্রশংসা পত্র জোগাড় করা কোন ব্যাপার না, জানা আছে কিশোরের। সুতরাং ওগুলোর ওপর সব সময় ভরসা করার কোন মানে হয় না।

প্রহরী নিযুক্ত করার পর কিশোরকে তাঁর বাড়িতে ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন মাইকেল।

'থ্যাংক ইউ,' খুব ভদ্রতার সঙ্গে বলল কিশোর, 'আরেকদিন খাব। আজ তো মেলা কাজ। এখানে পাহারা দিতে হবে আমাকে। বেশি খিদে পেলে চট করে গিয়ে কোন দোকান থেকে বার্গার কিনে নিয়ে আসব।'

সন্ধ্যাবেলা গার্ডদের নিয়ে সমস্ত জানালা-দরজা চেক করল সে। তারপর ভাবল, খাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। একজন গার্ডকে দোকানের কথা জিজ্ঞেস করে জানল, কাছেই একটা দোকান আছে, ভাল খাবার বানায়।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে চলল কিশোর। কিছুদূর যেতেই মনে হলো, দুজন লোক অনুসরণ করছে ওকে।

গতি বাড়িয়ে দিল সে।

পেছনের লোকগুলোও বাড়াল। দ্রুত এগিয়ে আসছে। কমে যাচ্ছে মাঝখানের দূরত্ব।

ওরা তার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে রেস্টুরেন্টের কাছে চলে এল সে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। একটা টেবিলের সামনে বসল।

এগিয়ে এল ওয়েইটার। কিশোর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলল, 'সুপ শেষ। ভাল কিছুই নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ করে দেব।'

জবাব দিল না কিশোর। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকগুলো ভেতরে ঢুকছে না। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে ধরা পড়ে গেছে, তাই বাইরে অপেক্ষা করছে।

'স্যান্ডউইচ চাইলে দিতে পারি,' কিশোরকে অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে ওয়েইটার বলল। 'এর বেশি আর কিছু সম্ভব না।'

'তাই দিন।'

সাত

স্যান্ডউইচ এল। খেতে খেতে ভাবতে লাগল কিশোর, লোকগুলোকে ফাঁকি দিয়ে কি করে পালানো যায়? অবশেষে ঠিক করল, পুলিশকে ফোন করবে।

ওয়েইটারকে জিজ্ঞেস করল, 'ফোনটা কোথায়?'

'রেস্টুরেন্টে নেই। রাস্তার মোড়ে পাবলিক বুদ পাবে।'

'কিন্তু তার দেখতে পাচ্ছি,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর। 'একটা ফোন তো নিশ্চয় আছে।'

'আছে, রান্নাঘরে, রেস্টুরেন্টের নিজস্ব জিনিস। ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হয় কেবল। কাস্টোমারদের জন্যে নয়।'

'জরুরী অবস্থায়ও নয়? একটা ফোন করতে আমাকে দিতেই হবে!'

'মামার বাড়ির আবদার!' কর্কশ গলায় বলল ওয়েইটার। 'ঘটনাটা কি? কথা বলার জন্যে হেঁটে যেতে কষ্ট হচ্ছে?'

ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করল কিশোরের। রাগ চাপল কোনমতে। কয়েকজন কাস্টোমার বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। মরিয়া হয়ে অভিনয় শুরু করল কিশোর, মিথ্যে কথা বলল, 'উফ্, আমার পেট ব্যথা শুরু করেছে! হেঁটে যেতে পারব না! এই পচা স্যান্ডউইচ খেয়েই এমন হলো...'

'মিথ্যে কথা!' ভড়কে গেল ওয়েইটার। 'আমাদের জিনিস পচা হতেই পারে না! টাটকা জিনিস দিই আমরা!'

'তাহলে আমার পেট ব্যথা করছে কেন? এতক্ষণ তো ভালই ছিলাম। এটা খাওয়ার পর পরই শুরু হলো।'

কিশোরের অভিনয় দেখে ভয় পেল ওয়েইটার। আর তর্ক করার সাহস করল না। ছুটে গিয়ে মালিককে বলল।

ছোট অফিস থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন লোক। কিশোরের সামনে এসে বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি নাকি আমাদের খাবারের দোষ দিচ্ছ? বিশ বছর ধরে ব্যবসা করছি, কেউ কোনদিন খারাপ বলতে পারেনি।'

'এইবার থেকে বলা শুরু হলো আরকি! ওরি বাবারে, মরে গেলাম!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'উফ্, বাড়ি যাব! একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?'

ওয়েইটারের দিকে তাকিয়ে বলল মালিক, 'দাও, জলদি একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। খোদাই জানে, কি হয়েছে! যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়, বাঁচি!'

দুই মিনিটেই ট্যাক্সি নিয়ে এল ওয়েইটার। সে আর রেস্টুরেন্টের আরও কয়েকজন কর্মচারী মিলে কিশোরকে ধরে ধরে এনে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

'মিউজিয়ামে চলুন,' ড্রাইভারকে বলল কিশোর।

'কোন মিউজিয়াম?'

'নিকারসন।'

এত কাছে ট্যাক্সিতে চড়ে যাওয়ার দরকার কি, বুঝতে পারল না ড্রাইভার। অবাক হলো। তবে কিছু বলল না। কেউ যেতে চাইলে তার কি? ভাড়া পেলেই হলো।

চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। জানালা দিয়ে মুখ বের করে কিশোর দেখল, রেস্টুরেন্টের পাশের অন্ধকার গলি থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুজন লোক।

মিউজিয়ামে পৌঁছে সোজা নিজের স্টোররুমে নেমে এল সে। জিনিসগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে।

অলস ভঙ্গিতে কথা বলছে দুজন গার্ড।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে,' জবাব দিল একজন। 'কোন সমস্যা নেই।' রসিকতা করে বলল, 'অসুবিধে একটাই, জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।'

'যত কষ্টই হোক, ঘুমাবেন না দয়া করে। বেশিক্ষণ জাগতে হবে না। আপনাদের রেহাই দেয়ার জন্যে আরও দুজনের ব্যবস্থা করব শীঘ্রি।'

নিচ থেকে উঠে এল কিশোর। কিউরেটরের অফিসে ঢুকল মিস্টার সাইমনকে ফোন করার জন্যে। এ সময় তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

তবে পাওয়া গেল। পুতুল পড়ার কথা শুনে তিনি বললেন, 'বেঁচেছ! আমারও ধারণা আপনাআপনি পড়েনি। কেউ ঠেলে ফেলেছে।'

অনুসরণ করেছে যে লোকগুলো, ওদের কথা বলল কিশোর।

'এখনও আছে?' জানতে চাইলেন সাইমন।

'মনে হয়। এখানে আসার সময় একটা ছায়া দেখলাম বলে মনে হলো, লুকিয়ে পড়ল চট করে। ছায়াটা বড়। আমার সন্দেহ মালীকে। লোকটার নাম ফেরেট।'

'পুলিশকে জানাও। কিউরেটরের কথা শুনো না। ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে গেছে।'

এই সময় জোরে একটা শব্দ হলো। সাইমনকে ফোন ধরে রাখতে বলে কি হয়েছে দেখতে ছুটল কিশোর।

বেসমেন্টে নেমে এল সে।

উঠে দাঁড়িয়েছে গার্ড দুজন। সতর্ক। শব্দটা ওদের কানেও গেছে।

কিশোরকে দেখে উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস করল একজন, 'কি হয়েছে? একটা শব্দ শুনলাম!'

জবাব দিতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা হিসহিসে শব্দ ঢুকল কানে। তারপর সাদা, গন্ধহীন ধোঁয়ায় ভরে যেতে শুরু করল ঘর।

'কিসের ধোঁয়া?' চিৎকার করে উঠল আরেকজন গার্ড।

তার কথা শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল গ্যাস মুখোশ পরা কয়েকজন লোক।

বাধা দিতে পারল না কিশোর। শরীরের সমস্ত শক্তি কে যেন মুহূর্তে শুষে নিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকারও ক্ষমতা হলো না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

আট

'কি...হয়েছে...' জড়িত স্বরে কথা বলল কিশোর। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একজন পুলিশ সার্জেন্টের মুখ।

'কোন্ ধরনের গ্যাস ঢুকেছিল তোমার নাকে,' সার্জেন্ট বলল। 'বেহুঁশ

হয়ে গিয়েছিলে। গার্ডদেরও একই অবস্থা।'

টলমল ভঙ্গিতে উঠে বসল কিশোর। 'আপনারা এলেন কি করে? কে খবর দিল?'

'মিস্টার সাইমন থানায় ফোন করেছিলেন। বললেন, একটা আজব শব্দ নাকি শুনতে পেয়েছ। তাঁকে ফোন ধরে রাখতে বলে দেখতে গেছ। তারপর আর খবর নেই। উদ্বিগ্ন হয়ে থানায় ফোন করলেন তিনি।'

চারপাশে তাকাল কিশোর। আরও কয়েকজন পুলিশকে দেখল। কয়েকজন জায়গাটা পরীক্ষা করছে। বাকিরা গার্ড দুজনকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে স্টোররুমের দরজার দিকে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'জনসন কালেকশনগুলোর খবর কি? আছে, না নিয়ে গেছে?'

'স্টোররুম তো খালি, কিছুই নেই।'

'তারমানে নিয়ে গেছে...'

ঘরে ঢুকলেন কিউরেটর। বললেন, 'একটা টেলিফোন পেলাম। বলল, এখুনি এখানে চলে আসতে। কি হয়েছে...' ঘরটা যে শূন্য, এতক্ষণে খেয়াল করলেন।

'কালেকশনগুলো নিয়ে গেছে,' কিশোর বলল।

রক্ত সরে গেল কিউরেটরের মুখ থেকে। 'সর্বনাশ! তুমি ওদের ঠেকালে না কেন?'

অনেক কষ্টে রাগ চাপল কিশোর। 'আপনাকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, স্যার। পুলিশকে খবর দেয়া উচিত ছিল আপনার।'

'দোষটা আমার ওপর চাপাতে চাইছ নাকি?'

জবাব দিল না কিশোর। কিউরেটরের সঙ্গে অর্থহীন তর্ক করে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই তার। সূত্র খুঁজতে শুরু করল ঘরের ভেতর।

এক টুকরো দড়ি পড়ে থাকতে দেখল। হাতে তুলে ভাল করে দেখল, বাড়িয়ে ধরল সার্জেন্টের দিকে। 'আমি এটা রেখে দিই? আপত্তি আছে?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সার্জেন্ট। 'পরে আমাদেরও কাজে লাগতে পারে।'

'তা পারে। চাইলেই পাবেন।'

'রাখো।'

'থ্যাংক ইউ।'

'আঙুলের ছাপ নেয়ার ব্যবস্থা করছি আমরা,' সার্জেন্ট বলল। 'ইচ্ছে করলে তুমি ঘুমিয়ে নিতে পারো। কিছু পেলে তোমাকে জানাব।'

'তাই করি,' ক্লান্ত স্বরে বলল কিশোর।

কিউরেটরের অফিসে এসে একটা সোফায় শুয়ে পড়ল সে।

কয়েক ঘন্টা পর আলতো ঠেলা দিল তাকে কেউ, কোমল গলায় ডাকল, 'কিশোর, ওঠো।'

চোখ মেলল কিশোর। 'আরি, স্যার, আপনি! কখন এলেন?'

'ঘণ্টা দুই আগে। দেখলাম ঘুমাচ্ছ, বিরক্ত করলাম না।'

হাসল কিশোর। 'তারমানে ডাকাতির খবর পেয়ে গেছেন।'

'সেটাই স্বাভাবিক, তাই না। দোষটা মোটেও তোমার নয়, কিউরেটরের। এত গোঁয়ার লোক জীবনে দেখিনি আমি। তোমার কথা বিশ্বাস করা উচিত ছিল তাঁর, সাহায্য করতে না পারুন, পুলিশে খবর দিতে পারতেন।'

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

মাথা নেড়ে সাইমন বললেন, 'খুব চালাক একটা দল। ওরা জেনে গেছে আমরা ওদের পিছে লেগেছি। পরের ডাকাতিটা করার আগে সময় নেবে।'

'আমরা এখন কি করব?'

'নাস্তা করব, তারপর রকি বীচে ফিরে যাব। রবিন আর মুসাকে ফোন করে সব জানিয়ে দিয়েছি। পুলিশকেও জানিয়েছি। বাকি যে কটা মিউজিয়ামে ডাকাতি করা বাকি আছে, সবগুলোতে পাহারার ব্যবস্থা করতে রাজি হয়েছে তারা।'

কিশোরকে নিয়ে রকি বীচে ফিরলেন সাইমন। ইয়ার্ডের গেটে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ওর অপেক্ষায়ই ওঅর্কশপে বসে আছে মুসা আর রবিন।

দেখেই বলে উঠল মুসা, 'চোরেরা নাকি খুব একচোট কিলিয়েছে তোমাকে?'

'ঠিক খবর পাওনি,' কিশোর বলল, 'নাকে গ্যাস ঢুকিয়ে বেহুঁশ করেছে।'

হাসল মুসা। 'রসিকতা করলাম। কি হয়েছিল, খুলে বলো তো?'

বলল কিশোর। তারপর পকেট থেকে দড়িটা বের করে দেখাল, 'স্টোররুমের মেঝেতে পেয়েছি।'

'সাধারণ দড়ি,' মুসা বলল। 'এটা দিয়ে কি করা হয়েছে?'

'এটা দিয়ে কিছু করা হয়নি, তবে বড় দড়ির একটা টুকরো এটা। দড়িটা আনা হয়েছিল সম্ভবত চোরাই মাল বেঁধে নেয়ার জন্যে। দেখো, দড়িটা সুন্দর করে পাকানো।'

'তাতে কি?'

'কিছুই বুঝতে পারছ না?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রবিনের চোখ। 'তাই তো! নাবিকদের অভ্যাস! অনেক নাবিক হাতে দড়ি পেলেই অহেতুক পাকাতে থাকে। হেই, ব্ল্যাক প্যারটের নাবিকেরা ডাকাতি করেনি তো?'

'করতে পারে। তবে আমার ধারণা, ডাকাতি করার জন্যে আলাদা লোক আছে; জাহাজে করে পাচার করা হয় চোরাই মাল। আটঘাট বেঁধে ডাকাতি করতে নেমেছে শক্তিশালী একটা দল।'

'তারমানে ব্ল্যাক প্যারটে গিয়ে খুঁজতে হবে আমাদের?'

'পাচ্ছ কোথায় ওটাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'পাব,' কিশোর বলল। 'পত্রিকায় জাহাজের শিডিউল দেখলেই জেনে

যাব ব্ল্যাক প্যারটের খবর। রকি বীচে ফিরে আসতে পারে ওটা, কিংবা অন্য কোন বন্দরে ভিড়তে পারে।'

'স্টর্মওয়েল?' রবিন বলল।

ঝট করে তার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'ভাল কথা মনে করেছ তো! ঠিক, আপাতত ওখানেই ভিড়বে ওটা।'

নয়

সুতরাং পরের কয়েকটা দিন পত্রিকায় জাহাজের শিডিউলের দিকে নজর রাখল তিন গোয়েন্দা। ব্ল্যাক প্যারট বন্দরে ভেড়ে কিনা দেখল।

কিশোরের অনুমান সত্যি প্রমাণ করে সাত দিন পর স্টর্মওয়েল বন্দরে ভেড়ার কথা ঘোষণা করা হলো শিডিউলে। এর আগে কোথায় ছিল ওটা, কিছু বলল না পত্রিকায়।

'কানাডাতেই যাব,' তুড়ি বাজিয়ে বলল কিশোর। 'অনেক দিন থেকেই যাওয়ার ইচ্ছে। এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে। বেড়ানোও হবে, গোয়েন্দাগিরিও।'

'খরচটা কে দেবে শুনি?' যাওয়ার ষোলো আনা ইচ্ছে আছে মুসার, কিন্তু অত টাকা নেই এখন তার কাছে।

'টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'দশ-দশটা মিউজিয়াম, সবাই মিলে অল্প অল্প করে দিলেও আমাদের খরচ হয়ে যাবে। মিস্টার সাইমনকে ফোন করে বলব, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন।'

তার ধারণা ঠিক। ভেগাবল মিউজিয়াম সোসাইটির পরিচালককে কেবল একটা ফোন করলেন সাইমন, খরচ দিতে রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

দেরি না করে পরদিনই রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

বিকেলে স্টর্মওয়েলে পৌঁছে একটা হোটেলে উঠল।

গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েই মুসা বলল, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। খিদেয় পেটের মধ্যে বোধও নেই আর কোন।'

কিশোর বলল, 'চলো, যাই। হলের পাশেই ডাইনিং রুম, ওঠার সময় দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি,' মুসা বলল।

হেসে ফেলল রবিন, 'তা আর দেখবে না। ওটাই তো তোমার আসল জায়গা।'

'সবারই আসল জায়গা,' রেগে উঠল মুসা। 'দেখি, না খেয়ে থাকো তো দেখি একবেলা? আমি নাহয় একটু বেশি খাই···'

বাধা দিল কিশোর, 'থাক, থাক, ঝগড়ার দরকার নেই। চলো।'

ডাইনিং রুমে এসে কোণের দিকের একটা টেবিলে বসল ওরা।

ওয়েইটার এসে একেকজনের হাতে একেক কপি মেনু ধরিয়ে দিল। মুসাকে অর্ডার দিতে ইঙ্গিত করল রবিন।

আরেক দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পাশের টেবিলে বসা দুজন লোকের কথা শুনে কান খাড়া করে ফেলেছে।

'কালকের আগে ব্ল্যাক প্যারটের আসার কথা ছিল না,' রাগত স্বরে বলল একজন, 'অথচ আজকেই এসে বসে আছে। ঘণ্টা দুই আগে এল। আমাকে এখন আবার ডকিং শিডিউল বদলাতে হবে।'

'প্যারট গ্রুপের এই জাহাজগুলোকেই আমার পছন্দ না,' দ্বিতীয় লোকটা বলল। 'কোন একটা গোলমাল রয়েছে ওগুলোতে, স্টর্মওয়েলে না ভিড়লেই আমি খুশি হতাম।'

'বেশিক্ষণ অবশ্য থাকছে না ব্ল্যাক প্যারট। ভেড়ার কথা ছিল, তাই বোধহয় ভিড়েছে. তোলার মত মালটাল তেমন নেই। নাবিকদেরও মনে হলো বেশ তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছে।'

মুসার অর্ডার দেয়া তখনও শেষ হয়নি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। প্রায় ধাক্কা দিয়ে ওয়েইটারকে একপাশে সরিয়ে ম্যানেজারের অফিসের দিকে চলল। অবাক হয়ে তার পিছু নিল রবিন আর মুসা।

দ্রুত একটা ভাড়াটে ট্যাক্সির জোগাড় দিল ওদেরকে হোটেল ম্যানেজার। বন্দরে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

বন্দরের কাছে এসে হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই যে জাহাজটা। কি তুলছে?'

'আজব ব্যাপার!' মুসা বলল, 'ওই আস্ত আস্ত গাছ তুলছে কেন?'

কিশোর আর রবিনও দেখল, গাছের আস্ত গুড়ি তোলা হচ্ছে। ডজনখানেক হবে।

বড় একটা লরিতে করে আনা হয়েছে ওগুলো। গায়ে বড় বড় করে লেখা:

হেরিংটন টিম্বার কোম্পানি,
ক্লাউড লেক,
কানাডা

সাবধানে ব্ল্যাক প্যারটের খোলসে কাণ্ডগুলো ঢোকানো হচ্ছে। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছে নাবিকেরা।

মাল তোলা শেষ হতেই ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। ব্যস্ততা দেখা গেল নাবিকদের মধ্যে। চলতে শুরু করল জাহাজটা।

'এত অল্প সময়ের জন্যে এল?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল মুসা।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করল রবিন। 'কয়েকটা সাধারণ গাছের গুড়ি তোলার জন্যে বন্দরে ভিড়ল জাহাজটা!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। ওদের কথা তার কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। চিন্তিত ভঙ্গিতে আপনমনেই বলল, 'হেরিংটন টিম্বার কোম্পানি! খোঁজ নিতে যেতে হবে ওখানে।'

দুজন লোক উঠল লরিতে। চলতে আরম্ভ করল ওটা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বুঝলে?'

'কিছুই না। তবে টিম্বার কোম্পানিতে গেলে হয়তো কিছু বুঝতে পারব।'

হোটেলে ফিরে পুলিশকে ফোন করল কিশোর। হেরিংটন কোম্পানির কথা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' জানাল একজন অফিসার, 'চিনি, একটা কাঠের মিল। শুনেছি, বন্ধ করে দেয়া হবে।'

'ব্যবসা খারাপ?'

'কি জানি।'

'কোথায় ওটা?'

'এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ওল্ড পাইন রোডের ধারে।'

'থ্যাংক ইউ।' ফোন রেখে সহকারীদের দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো, মিলটায় যাব।'

'কিন্তু যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে,' রবিন বলল।

'জানি। উপায় নেই। যাওয়াটা জরুরী।'

তাড়াতাড়ি আবার এসে গাড়িতে চড়ল ওরা। স্টার্ট দিল মুসা। ম্যাপ দেখে দেখে কোন দিকে যেতে হবে বলে দিল কিশোর।

রাস্তা ভাল না। তা ছাড়া অপরিচিত জায়গা। জোরে চালাতে পারল না মুসা।

হঠাৎ দুলে উঠল গাড়ি। মাতালের মত এদিক ওদিক করতে লাগল।

'খাইছে!' ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে ফেলল মুসা। 'চাকা পাংচার!'

'বাহ্, চমৎকার!' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'আর সময় পেল না!'

গাড়িতে বাড়তি চাকা আছে। বের করে আনা হলো ওটা। কিন্তু লাগানোর পর মুসা জ্যাকটা খুলে আনতেই এই চাকাটাও দেবে গেল। বাতাস নেই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রবিন, 'এটাও ভাল না!'

'হুঁ, আটকাই পড়লাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'মিলটা অবশ্য বেশি দূরে না আর, বড়জোর দেড় কিলোমিটার হবে। চলো, হেঁটে যাই।'

যাওয়া ছাড়া আর কিছু করারও নেই। ফোন করতে হলেও ওখানে যেতে হবে, অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হলেও। এ সব বাদ দিলেও, ওখানে যাওয়ার জন্যেই বেরিয়েছে ওরা, অতএব আপত্তি করার কিছু নেই; রাজি হয়ে গেল মুসা আর রবিন।

অন্ধকারে হাঁটতে লাগল ওরা। অচেনা পথ, বড় বড় গাছ বাধা হয়ে আছে। তার মধ্যে দিয়ে এগোতে গতি হয়ে গেল ধীর।

কিছুদূর এগোনোর পর টর্চের আলোয় মাটির দিকে চোখ পড়তেই ঝুঁকে দাঁড়াল রবিন। 'দেখো, চাকার দাগ।'

কিশোরও দেখল। 'ভারী চাকা। লরির। বন্দরে যেটাকে দেখেছি সেটাও

হতে পারে।'

কান পেতে আছে মুসা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মনে হলো ঝোপের মধ্যে শব্দ শুনলাম!'

'কিসের? কোনদিকে?'

হাত তুলে দেখাল মুসা।

সেদিকে টর্চের আলো ফেলল রবিন। কিছুই দেখা গেল না। ডাল বা পাতাটাতা কিছু নড়ছেও না। 'হবে হয়তো কাঠবেড়ালি, কিংবা খরগোশ।'

'দেখো, আমার ভাল্লাগছে না!' মুসা বলল, 'আজ আর গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেও যেতে পারব।'

'রাতে থাকব কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন। 'বনের মধ্যে ওই চাকা নষ্ট হওয়া গাড়িতে? তার চেয়ে এগোনোই ভাল। মিলে রাত কাটানোর একটা ঘর অন্তত পাওয়া যাবে।'

তা ঠিক। জবাব দিতে পারল না মুসা।

আবার এগোল ওরা।

অবশেষে গায়ে গায়ে লেগে থাকা ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি চোখে পড়ল। আলো আসছে একটার জানালা দিয়ে।

'ওটাই নিশ্চয় মিল,' রবিন বলল।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পা বাড়াল সামনে।

আচমকা সামনে যেন হাঁ করে ফাঁক হয়ে গেল মাটি। গভীর গর্তে পড়ে গেল তিনজনে।

দশ

স্তব্ধ হয়ে গর্তের নিচে পড়ে আছে ওরা। কিনার থেকে টর্চ জ্বলে উঠল।

'অ্যাই দেখে যাও!' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল টর্চধারী, 'মেহমান এসেছে!'

'আরি,' আরেকটা লোক গলা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রথমজনের পাশে, 'তিনজন!'

'আপনারা কে?' কোনমতে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না কেউ।

একটা দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হলো গর্তে।

'উঠে এসো!' আদেশের সুরে বলল প্রথমজন। 'কোন রকম চালাকির চেষ্টা করবে না। আমাদের কাছে পিস্তল আছে।'

একে একে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। গর্তের বাইরে বেরোতে ওদের সাহায্য করল লোকগুলো। মোট তিনজন ওরা। প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল

এবং শক্তিশালী টর্চ।

'হ্যাঁ, বলো এবার!' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল প্রথমজন, 'এখানে কেন এসেছ তোমরা?'

'বন দেখতে,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর।

'মিথ্যে কথা বললে আবার গর্তে ফেলে দেব!' ধমক দিয়ে বলল লোকটা।

'মিথ্যে বলছি না।'

এগিয়ে এল তিনজনের মধ্যে লম্বা লোকটা। ভাল করে দেখে কিশোর আর রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'এদেরকে আমি চিনি! ব্ল্যাক প্যারটে কুলির কাজ করতে দেখেছি।'

'স্পাই না তো!' বলল প্রথম লোকটা। 'চলো, আমরা চলে যাই। বলা যায় না, পুলিশের চর হতে পারে এরা!'

'হ্যাঁ। কিন্তু এগুলোকে ছাড়া রেখে গেলে বিপদে ফেলে দেবে। একটা ব্যবস্থা করে যাই। পুরানো কুঁড়েটায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলে রেখে যাব।'

পিস্তল ঠেকিয়ে একটা কাঠের তৈরি বাড়িতে এনে ঢোকানো হলো তিন গোয়েন্দাকে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাত-পা বেঁধে রেখে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। বাইরে অন্ধকারে কথা শোনা গেল ওদের।

গড়িয়ে গিয়ে দেয়ালে কান ঠেকাল রবিন, শোনার জন্যে।

'এবার কি করা?' নিচু স্বরে একজন লোককে বলতে শুনল সে।

'পোর্ট ম্যানথনে চলে যাব,' বলল আরেকজন। 'ইয়েলো প্যারটকে মেরামত করার জন্যে ওখানে ডকে তোলা হয়েছে। ওতে উঠে বসে থাকব। মেরামত শেষ করে জাহাজটা যখন চলে যাবে, আমরাও যাব, বেরিয়ে যাব এ দেশ থেকে। পুলিশ আর কিছু করতে পারবে না। সময় নেই আমাদের হাতে, বড়জোর আর তিন-চার ঘণ্টা। লরিটা নিয়েই যেতে হবে।'

সরে এসে সব কথা সঙ্গীদের জানাল রবিন।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'পোর্ট ম্যানথন এখান থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে। হাত-পা খোলা থাকলে...' তার কথা ঢাকা পড়ে গেল লরির ভারি ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দে।

'চলে যাচ্ছে ওরা!' উত্তেজিত হয়ে বলল রবিন।

যাওয়ার আগে একটা অঘটন ঘটিয়ে গেল পুরানো গাড়িটা। এগজস্ট পাইপ থেকে ফুলঝুরির মত ছিটকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত কার্বনের স্ফুলিঙ্গ। পড়ল গিয়ে শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যাওয়া ঝোপের পাতায়। প্রথমে ধোঁয়া শুরু হলো, তারপর জ্বলে উঠল আগুন।

এ সবের কিছুই জানল না তিন গোয়েন্দা। নিজেদের বাঁধন মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা।

নাক, কান, চোখ—এ সব যন্ত্রগুলোর ক্ষমতা তিনজনের মধ্যে মুসারই সবচেয়ে বেশি। নাক কুঁচকে বাতাস টানতে টানতে বলল, 'ধোঁয়ার গন্ধ!'

কয়েক সেকেন্ড পর রবিন বলল, 'আমিও পাচ্ছি।'

চমকে গেল কিশোর। 'আগুন লাগল না তো!'

বাইরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তীব্র গতিতে ধেয়ে আসতে লাগল কাঠের কুঁড়েটার দিকে। পাতলা বেড়া ভেদ করে আসা আগুনের আঁচ লাগতে আরম্ভ করল ওদের গায়ে।

'বেরোতেই হবে এখান থেকে!' চিৎকার করে বলল রবিন। 'নইলে কয়লা হয়ে যাব!'

গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে চলে এল সে। দুই পায়ে লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল। ডাক দিল, 'জলদি এসো!'

মুসা আর কিশোরও একই ভাবে গড়িয়ে আসতে লাগল।

ততক্ষণে বাইরে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে রবিন।

পাথরে ধাক্কা খেয়ে থামল তার শরীর। বাঁধন কাটার মত কোন একটা জিনিস খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল সে। খোঁচা লাগছে পাথরে। বিদ্যুৎ চমকের মত তার মগজে খেলে গেল কথাটা—পাথরগুলো ধারাল! মরিয়া হয়ে ওই পাথরে হাতের দড়ি ঘষতে লাগল সে।

যেন ঘোরের মধ্যেই টের পেল, দড়ি কেটে গিয়ে হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেছে তার। নিজের পায়ের দড়ি খুলল, মুক্ত করল বন্ধুদের।

উঠে দাঁড়াল তিনজনে। আতঙ্কিত হয়ে দেখল ওদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে আগুনের এক বিরাট বৃত্ত। ভয়ানক গরম। আঁচেই মনে হচ্ছে চামড়া ঝলসে যাবে।

'গেছি আমরা!' কপাল চাপড়ে বলল মুসা।

মিলের প্রতিটি বাড়িতে আগুন ধরতে আরম্ভ করেছে। ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না।

দ্রুত ভাবনা চলছে কিশোরের মাথায়। এই অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরোতে হলে এখুনি কিছু করতে হবে।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা, 'শুনছ!'

'কী?'

কিশোরও শুনতে পেল শব্দটা। বাড়ছে ক্রমেই। একটু পরেই মাথার ওপরে দেখা গেল রয়াল ক্যানাডিয়ান এয়ারফোর্সের একটা হেলিকপ্টার।

'হ-হচ্ছেটা কি!' তোতলাতে শুরু করল মুসা। 'কপ্টার এল কোত্থেকে!'

'যেখান থেকেই আসুক,' কিশোর বলল, 'বেরোনোর ব্যবস্থা হয়ে গেল আমাদের।'

ওপর দিকে হাত তুলে পাগলের মত নাচানাচি শুরু করল ছেলেরা, সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার। একটা রেসকিউ স্লিং নেমে এল হেলিকপ্টার থেকে। সেই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে এক এক করে উঠে গেল তিনজনে।

বিশাল এক ফড়িঙের মত আগুনের ওপর উড়তে লাগল 'কপ্টারটা। আগুনের আলোয় চকচক করছে ধাতব শরীর। ঘুরে ঘুরে আগুনের শিখার ওপর রাসায়নিক ফেনা ছিটাতে লাগল। আরও একটা 'কপ্টার এসে যোগ দিল ওটার সঙ্গে। দুটোতে মিলে নিভিয়ে ফেলল আগুন।

এতক্ষণে গোয়েন্দাদের দিকে তাকানোর সুযোগ পেল রেসকিউ পার্টির একজন সদস্য। বলল, 'একেবারে সময়মত হাজির হয়েছি। কে তোমরা? রাতের বেলা এই বনের মধ্যে কি করছিলে?'

কি ঘটেছে, সংক্ষেপে জানাল কিশোর। আগুন কি ভাবে লেগেছে, বলতে পারল না।

'সিগারেট ধরিয়ে হয়তো ম্যাচের কাঠি ফেলে গেছে ওদের কেউ,' রবিন বলল। 'শুকনো ঝোপে পড়ে আগুন ধরে গেছে।'

'হতে পারে,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ভালমতই ধরেছিল। স্টর্মওয়েল থেকে আলো দেখা গেছে। তাই দেখেই তো এলাম।'

এগারো

কয়েক মিনিট পর একটা ছোট এয়ারফিল্ডে নামল হেলিকপ্টার। ছুটে এল পুলিশ। গোয়েন্দাদের তুলে দেয়া হলো তাদের হাতে।

আরেকবার একই কথা শোনাতে হলো তিন গোয়েন্দাকে।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে একজন অফিসার বলল, 'তোমাদের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে গতিবেগ লঙ্ঘন করার কারণে একটা লরিকে আটক করা হয়েছে। অ্যারেস্ট করা হয়েছে তিনজন লোককে। স্টর্মওয়েলের দিকে যাচ্ছিল ওরা। দুজনকে আমি চিনি। জালিয়াতি আর চুরির অপরাধে খোঁজা হচ্ছিল ওদের।'

হোটেলে পৌঁছে দেয়া হলো তিন গোয়েন্দাকে।

খাওয়ার টেবিল থেকে খাওয়া ফেলে উঠে গিয়ে এত সব কাণ্ড! না খেয়ে আর কোন কিছুই করতে যেতে রাজি নয় মুসা।

খাওয়ার পর রকি বীচে মিস্টার সাইমনকে ফোন করল কিশোর। সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

তিনি বললেন, 'কালই আসছি আমি। ওই তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তথ্য পাওয়া যাবে ওদের কাছে, আমি শিওর।'

'ঠিক আছে, আসুন। আমরা চলে যাব কাল পোর্ট ম্যানথনে, ইয়েলো প্যারটের খবর নিতে। কি বলেন?'

'যাও, ভাল হবে।'

গাড়ির চাকা যে পাংচার হয়েছে, হোটেলে পৌঁছেই ম্যানেজারকে জানিয়েছে কিশোর। খারাপ চাকা দেয়ার জন্যে রেন্ট-আ-কার কোম্পানিকে নালিশ করতে বলেছে। পরদিন সকালে আরেকটা গাড়ি ওদেরকে জোগাড় করে দিল ম্যানেজার। আর যাতে ওরকম বিপদে পড়তে না হয়, সে-জন্যে গাড়ির চাকাটাকা সব দেখে দিতে বলল কোম্পানিকে।

পোর্ট ম্যানথনে পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লাগল। বন্দরে পৌঁছে পানির ধার

ঘেঁষে চলে যাওয়া একটা রাস্তা ধরে এগোল মুসা। খানিক দূর এগিয়ে পার্কিং লট দেখে সেখানে গাড়ি রাখল।

নামল তিনজনে।

একটা পায়ারে বাঁধা ইয়েলো প্যারট জাহাজটাকে আগে দেখতে পেল রবিন। হাত তুলে বলল, 'ওই যে।'

দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'পোর্ট ম্যানথন বেশি বড় না। বড়জোর দু-তিনটে বড় জাহাজের জায়গা দিতে পারবে।'

'এই জন্যেই নিশ্চয় এখানে এসেছে জাহাজটা। ঝামেলা কম, নিরালায় কাজ করানোর সুবিধে পাবে।'

কাছে এগিয়ে ভাল করে জাহাজটাকে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। গলুইয়ের কাছে খোলের গায়ে ইয়াবড় এক গর্ত। ওটা মেরামত করছে কয়েকজন লোক।

'তোমরা এখানে নতুন, তাই না?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। তিন গোয়েন্দা ফিরে তাকাতে বলল, 'জাহাজের ব্যাপারে আগ্রহী?'

দাড়িওয়ালা এক বুড়ো। নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে।

'হ্যাঁ...' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম আমরা,' কিশোর বলল। 'বন্দরটা দেখে মনে হলো দেখেই যাই।'

'কি দেখবে, আজকাল আর কিছু দেখার নেই!' আফসোস করে বলল বুড়ো। 'ছিল বটে কয়েক বছর আগে।' হালকা একটা হাসি ফুটল তার দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখে। 'সাগর পছন্দ করে যে সব ছেলে, তাদের আমার ভাল লাগে।'

'আপনি কি এই এলাকার লোক?'

'হ্যাঁ। জন্মই আমার পোর্ট ম্যানথনে। ষাট বছর আগে এই বন্দর থেকেই প্রথম জাহাজে চড়েছিলাম। পাড়ি জমিয়েছিলাম মহাসমুদ্রে। আহ্, কি ছিল সে-সব দিন...' হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো, 'আমি ব্রিমল্যান্ড, ক্যাপ্টেন ব্রিমল্যান্ড। নামটা কঠিন মনে হলে শুধু ব্রিম বললেই চলবে।'

হাত মেলাল তিন গোয়েন্দা। নাম বলল। পরিচয় দিল টুরিস্ট বলে। তারপর ইয়েলো প্যারটকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি হয়েছে ওটার? এতবড় গর্ত হলো কি করে?'

'জানি না,' ব্রিম বলল। 'এর আগে আর কখনও দেখিওনি ওটাকে। নাবিকগুলো ভাল না। ঠিকমত কথা বলে না। ব্যবহারও খারাপ। আজকাল এমনই হয়েছে। নাবিকের সঙ্গে নাবিকের আন্তরিকতা কমে গেছে। অথচ আমাদের সময় এমন ছিল না।' দাড়ির মধ্যে চুলকাল বুড়ো। 'গর্তটা কি করে হলো একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সরাসরি মিথ্যে বলে দিল। অবাক লেগেছে আমার। কেন বলল, বুঝতে পারলাম না!'

'মিথ্যে বলে দিল?' বুড়োর কথার প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন। 'মানে?'

'বলল, পানির নিচের চড়া নাকি দেখতে পায়নি। পাথরে লেগে গর্তটা

হয়েছে। যত্তসব বাজে কথা!'

'কেন, পাথরে লেগে হতে পারে না?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, পারে না, এক নজর দেখেই যে কোন বাচ্চা ছেলেও বলে দিতে পারে এটা। দেখছ না, গর্তটা হয়েছে ওয়াটার-লাইনের ওপরে; যত বোঝাই নেয়া হোক, খোলের ওই পর্যন্ত পানিতে ডোবেই না। তবে আমি বলে দিতে পারি, কি ভাবে হয়েছে—গোলার আঘাতে।'

'গোলা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

'কামানের।'

খবরটা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল রবিনের। বলল, 'এতবড় গর্ত মেরামত করতে কতদিন লাগতে পারে?'

'কমপক্ষে দু-তিন দিন তো লাগবেই।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। কিছুক্ষণ দেখে ব্রিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো। পোর্ট ম্যানথনের একমাত্র হোটেলটা খুঁজে বের করল।

সেদিন বিকেলে স্টর্মওয়েল থানায় ফোন করে জিজ্ঞেস করল কিশোর, মিস্টার সাইমন এসেছেন কিনা। অফিসার জানাল, এসেছেন। কোন্ হোটেলে উঠেছেন, সেটাও বলল।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলল ওরা।

সাইমন জানালেন, 'আমার চেয়ে তোমরা এগিয়েছ অনেক ভাল। অনেক ভাবে জিজ্ঞেস করা হয়েছে লোকগুলোকে, মিউজিয়ামে ডাকাতির ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না। হয় সত্যি জানে না কিছু, নয়তো চালাকি করে চেপে গেছে। দেখি, কাল আরেকবার চেষ্টা করে দেখব।'

ইয়েলো প্যারটের কথা সাইমনকে বলল কিশোর। গর্তটার কথা, আর সেটা কি করে হয়েছে এ ব্যাপারে ব্রিমের ধারণার কথাও বলল।

'হুঁ, ইনটারেস্টিং,' মাথা দুলিয়ে বললেন সাইমন। 'খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করব।'

'তার চেয়ে বরং আরেক কাজ করি? গর্তটা কি করে হয়েছে জানতে পারব। প্যারট গ্রুপের জাহাজগুলো কি শয়তানি করছে, তা-ও জানা যাবে।'

'কি করতে চাও?'

'ইয়েলো প্যারটে চড়ে সাগরে পাড়ি জমাতে চাই!'

বারো

তীব্র আপত্তি করলেন সাইমন, 'ও কাজও করতে যেয়ো না, ভীষণ বিপদে পড়বে! ব্ল্যাক প্যারটের নাবিকরা তোমাদের চেনে। দুটো জাহাজ একই কোম্পানির। এমন যদি হয় ওটা থেকে ইয়েলো প্যারটে বদলি হয়ে এল কোন

নাবিক?'

'কিছুটা ঝুঁকি তো নিতেই হবে। তবে আমার মনে হয় না এসেছে,' কিশোর বলল। 'ওদের সেইলিং শিডিউল আমি দেখেছি। গত কয়েক হপ্তায় কাছাকাছি হওয়া তো দূরের কথা, একটা আরেকটার কাছ থেকে বহু মাইল তফাতে থেকেছে।'

'কিন্তু এ সব যুক্তি আমি মানতে পারছি না।'

'সাবধান থাকব আমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব থেকে সাইমন বললেন, 'বেশ, ভাল করে প্ল্যান করে তারপর উঠো।'

'আচ্ছা।'

পরদিন আবার বন্দরে এল তিন গোয়েন্দা। দূর থেকে দেখতে লাগল পায়ারে বাঁধা ইয়েলো প্যারটকে। জোরেশোরে মেরামত চলছে। অক্সি অ্যাসিটাইলিন টর্চ নিয়ে কাজ করছে কয়েকজন টেকনিশিয়ান, কয়েকজন একটা ইস্পাতের মোটা পাত চেপে ধরেছে গর্তের মুখে। ঝালাই করে পাত লাগিয়ে ফোকর বন্ধ করছে।

'কাজ শেষ হয়ে এসেছে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চলো, আমাদের কাজ শুরু করি।'

শহরে ফিরে একটা দোকান থেকে শ্রমিকের পোশাক কিনল ওরা। তারপর হোটেলে ফিরে এল খাওয়া-দাওয়ার জন্যে।

একটা ডেনিম জ্যাকেট গায়ে চড়াতে চড়াতে মুসা বলল, 'আল্লাহ না করুক, ব্ল্যাক প্যারট থেকে কেউ এসে না উঠলেই হয়।'

'আসবে না,' কিশোর বলল, 'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

বার দুই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল মুসা। বোঝাতে চাইল, ভরসা পাচ্ছে না সে।

মুখ তুলে তাকাল কিশোর, 'তবে কি তুমি যেতে চাও না?'

'না না, চাইব না কেন?' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা। 'তোমার কি মনে হয়, জাহাজে করে সাগরে বেরোনোর এমন সুযোগ আমি ছাড়ব! কোন কিছুর ভয়েই না!'

হাসল রবিন, 'ভূতের ভয়েও না?'

কালো মুখ আরও কালো করে ফেলল মুসা, 'দূর! যাত্রার শুরুতেই যত্তসব অলক্ষুণে কথা!'

আবার পায়ারে এসে সিঁড়ি বেয়ে ইয়েলো প্যারটের মেইন ডেকে উঠে এল তিন গোয়েন্দা।

গাট্টাগোট্টা, রুক্ষ চেহারার একজন লোক এগিয়ে এল, 'কি চাই?'

'ফার্স্ট মেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

'কেন?'

'কাজ চাই।'

কর্কশ স্বরে হেসে উঠল লোকটা। ডেকে বলল, 'হেই বমার। তিনটে

ছেলে এসেছে কাজের খোঁজে।'

কেবিনের পাশ থেকে বেরিয়ে এল লম্বা এক লোক। হাত আর গলার শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে ঝাঁজাল স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা?'

'আমি কিশোর। ও রবিন, আর ও মুসা।'

'এখানেই বাড়ি?'

'না, একেকজনের একেক জায়গায়। ঘুরে বেড়ানোর নেশা আমাদের। কাজ করি বেড়ানোর টাকা জোগাড়ের জন্যে। সাগরে বেরোনোর খুব ইচ্ছে।'

দ্বিধা করতে লাগল বমার। 'দেখি, ভাবতে হবে।'

'দিয়েই দিন না কাজ,' সুপারিশ করল রুক্ষ চেহারার লোকটা। 'রাজা সেদিন বলছিলেন কয়েকজন লোক দরকার। অল্প পয়সায় পাওয়া গেলে...'

'থামো!' লোকটাকে চুপ করিয়ে দিল বমার।

'রাজা!' কিশোর বলল, 'কে এই রাজা?'

'ক্যাপ্টেন,' প্রথম লোকটা বলল, 'মাঝে মাঝে তাঁকে রাজা বলে ডাকি আমি।'

'তোমার বকবকানি থামাবে!' আবার ধমক দিল বমার। তিন গোয়েন্দাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে নিলাম তোমাদের। কাল সকালে রিপোর্ট করবে। যাও।'

পরদিন খুব সকালে ইয়েলো প্যারটে এসে উঠল আবার তিন গোয়েন্দা। ডেকে তখন বম্যর ছাড়া আর কেউ নেই।

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বলল সে, 'সাগরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে গেছ। আমি ভেবেছিলাম আর আসবে না তোমরা।'

'কেন, আসব না কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কাল তোমাদের সঙ্গে খুব একটা ভাল ব্যবহার করা হয়নি তো। যাকগে, কাজ বুঝিয়ে দিই। দুই ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ ছাড়বে।' হ্যাচের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'লুক, দেখে যাও।'

গোল একটা গর্তের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল মাঝবয়েসী, হালকা-পাতলা এক লোক। 'বলুন, স্যার?'

'এই ছেলেগুলোর থাকার জায়গা দেখিয়ে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কার্গো হোল্ডে নিয়ে যাও। দেখো, ঠিকঠাক মত কাজ করে যেন।'

গোল গর্ত দিয়ে নেমে মইয়ের মত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল তিন গোয়েন্দা। ওদের শোবার জায়গা দেখিয়ে দিল লুক। ছোট্ট একটা ঘরে তিনটে বাংক।

'এত ছোট জায়গা!' মুসা বলল।

'দম ফেলাই তো মুশকিল!' সায় জানাল রবিন।

'দেখো, অভিযোগ করবে না,' ধমক দিল লুক, 'এ সব আমি একদম পছন্দ করি না! চাকরি যদি করতে চাও, মুখ বুজে কেবল কাজ করে যাবে।'

সঙ্গে আনা ব্যাগগুলো বাংকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লুকের পিছু পিছু কার্গো হোল্ডে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

মাল রাখার অনেক জায়গা। জাহাজের সামনের দিকটায় ফেলে রাখা হয়েছে কতগুলো গাছের গুঁড়ি। সেগুলো দেখিয়ে ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ঠিক এ রকম জিনিসই ব্ল্যাক প্যারটে তুলতে দেখেছি, তাই না, কিশোর?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই হুকুম দিল লুক, 'নাও, এই জিনিসগুলো চেক করা শুরু করো। ভুল যেন না হয়।'

যা বলা হলো, করতে শুরু করল ছেলেরা। ধীরে ধীরে গুঁড়িগুলোর কাছে সরে গেল ওরা।

'কি দেখছ?' জিজ্ঞেস করল লুক।

'কেন, মাল চেক করতে বললেন না?' জবাব দিল কিশোর।

'তোমাকে ওখানে যেতে বলেছি নাকি?'

'কোথাও যেতে মানা করেননি তো!'

আচমকা রেগে গেল লুক। 'আবার মুখে মুখে তর্ক!' কিশোরকে চড় মারল সে।

কিন্তু লাগাতে পারল না। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলেছে কিশোর।

আরও রেগে গিয়ে আবার মারার চেষ্টা করল তাকে লুক।

তার উদ্যত হাতটা ধরে ফেলল মুসা। বাঁকিয়ে পেছন দিকে নিয়ে এল।

'ছাড়ো! এই, কি করছ! ব্যথা লাগছে!' চিৎকার করে উঠল লুক। গায়ে জোর নেই, মুসার সঙ্গে পারা তার কাজ নয়। হাঁপাতে লাগল।

'শান্ত হোন, নাহলে ছাড়ব না,' মুসা বলল।

'বেশ, শান্ত হলাম!'

হাত ছেড়ে দিল মুসা।

কিশোর বলল, 'এবার নিশ্চয় গিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করবেন?'

সামান্য একটা ছেলের কাছে গায়ের জোরে হেরে গেছে, এটা জানাতে বোধহয় লজ্জা লাগছে লুকের। বলল, 'মোটেও না! তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা পরে করব আমি। যাও, কোয়ার্টারে চলে যাও।'

ফেরার পথে রবিন বলল, 'ঝামেলা করবে এই লোক।'

'সেটাই তো চাই না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

কোয়ার্টারে ঢুকেই বাংকের ওপর একটা কাগজ পড়ে থাকতে দেখল সে। এগিয়ে এসে তুলে নিল। ধক করে উঠল বুক। কাগজটায় একটা মাত্র লাইন লেখা:

এখনই জাহাজ ছেড়ে পালাও!

তেরো

অবাক হয়ে গেল রবিন, 'কে লিখল?'

'বুঝতে পারছি না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমরা কে, এখানে কারও জানার কথা নয়। অথচ হুঁশিয়ার করা হচ্ছে!'

ইঞ্জিন চালু হলো। কাঁপতে শুরু করল পুরো জাহাজটা।

'রওনা হচ্ছি আমরা,' মুসা বলল। 'খুব তাড়াতাড়িই মেরামত সারল ওরা।'

কাগজটা পকেটে রেখে কিশোর বলল, 'এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর আর সময় নেই। অনেক দেরি করে দিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও আর নামতে পারব না এখন।'

বাইরে থেকে লুকের ডাক শোনা গেল, 'অ্যাই, কোথায় গেলে তোমরা! জলদি এসো!'

তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল ছেলেরা। ওদেরকে ডেকে যেতে বলল লুক। একগাদা কাজ চাপিয়ে দিল। সেগুলো শেষ হতে না হতেই আবার আদেশ দিল, 'যাও, এবার নিচে গিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে বলো রঙের টিন দিতে। এখানে অনেক জায়গায় রঙ চটে গেছে, নতুন করে করতে হবে।'

যাওয়ার পথে রবিন বলল, 'যে ভাবে আমাদের পিছে লেগে আছে, তদন্তের সময়ই পাব না। ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করেনি বটে, কিন্তু অপমানের ঝাল তুলবে এ ভাবেই।'

'ধৈর্য ধরতে হবে,' কিশোর বলল, 'ছুটির সময় করব।'

রঙ করায় ব্যস্ত হলো ওরা। মইয়ে চড়ে একটা দরজার মাথায় রঙ করতে উঠল মুসা। আচমকা হাত থেকে রঙের টিন গেল খসে। আর এমনই কপাল, সেই সময় নিচ দিয়ে যাচ্ছিল বমার। টিনের রঙ পড়ল তার গায়ে-মাথায়। রেগে আগুন হয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই ছেলে, কানা নাকি! দেখতে পাও না!' হাত নেড়ে ডাকল, 'নামো! নেমে এসো!'

নেমে আসতে লাগল মুসা।

কাছেই কাজ করছিল কিশোর আর রবিন, দৌড়ে এল ওরা।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মুসার দিকে চেয়ে গর্জে উঠল বমার, 'কি ব্যাপার, ব্যাপার কি, অ্যাঁ?'

'আ-আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি···'

লাল হয়ে গেছে লোকটার মুখ। আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফেলেছ! অবশ্যই ফেলেছ! আমাকে আসতে দেখে শয়তানি করে রঙ ফেলে দিয়েছ আমার গায়ে। তোমাদের নেয়াই ভুল হয়ে গেছে···'

মুসার পক্ষ নিয়ে বলতে গেল কিশোর, 'আমার মনে হয়···'

'চুপ!' ধমকে উঠল বমার। 'তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না! সব এক জাতের! বুঝতে পেরেছি আমি!' মুসার শার্ট খামচে ধরল সে। 'তোমার শার্ট দিয়ে মুছব…'

আর সহ্য করতে পারল না মুসা। হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল শার্ট। এটা দেখে ফেলল আরেকজন লোক। পেছন থেকে বোমা ফাটাল যেন তার কণ্ঠ, 'কি হচ্ছে?'

ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। মাঝারি উচ্চতার, মোটা একজন লোক। ধূসর হয়ে আসা বিশাল গোঁফ। সাপের চোখের মত শীতল নীল চোখ।

'দেখুন না, ক্যাপ্টেন,' বিচার দিল বমার, 'এই পাজি ছেলেগুলোকে নতুন নেয়া হয়েছে। আসার পর থেকেই শয়তানি…এই কালো ছেলেটা আমার গায়ে রঙ ফেলে দিয়েছে।'

কড়া চোখে মুসার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, 'ফেলেছ?'

'ইচ্ছে করে ফেলিনি, স্যার। টিনটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'ও ওরকমই বলছে, স্যার,' বমার বলল। 'ফেলেছে তো ফেলেছে, আমি বলায় আবার আমাকে মারতে আসে…'

'তাই?' কঠিন স্বরে বলল ক্যাপ্টেন, 'বেয়াদবিও করে! দুদিন ব্রিগের মধ্যে আটকে থাকলেই মেরামত হয়ে যাবে।'

মুসার হয়ে বলতে গেল কিশোর আর রবিন। ধমক দিয়ে ওদের থামিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। নিচ তলায় ব্রিগে নিয়ে যাওয়া হলো মুসাকে। ওটা এক ধরনের গারদ, খাঁচা বলাই ভাল। মোটা মোটা লোহার শিক। ভেতরে ভরে তালা লাগিয়ে দিলে আর গার্ড রাখার প্রয়োজন হয় না। এই শিক ভেঙে কিংবা বাঁকা করে বেরোনো সম্ভব না।

ব্রিগের ভেতর আটকে থাকাটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না মুসা, কোয়ার্টারের বাংক এর চেয়ে খুব একটা ভাল নয়। বরং কাজ করা থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল দুদিন শুধু রুটি আর পানি খেতে হবে ভেবে।

অনেক রাতে জাহাজের রান্নাঘরে হানা দিল রবিন আর কিশোর। খাবার চুরি করে নিয়ে এল।

ব্রিগের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে ডাকল রবিন, 'মুসা, ঘুমিয়েছ?'

'আরে না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা, 'পেটের মধ্যে দোজখের আগুন! ঘুম কি আর আসে?'

হেসে ফেলল রবিন, 'আগুন নেভানোর জিনিস এনেছি। নাও, ধরো।'

খাবার দেখে চোখ চকচক করে উঠল মুসার। শিকের ফাঁক দিয়ে নিতে নিতে বলল, 'বাঁচালে, রবিন। আল্লাহ তোমাকে বেহেশত নসিব করুন।'

'সে তো মৃত্যুর পর…'

'সেই জায়গাই তো আসল। অনন্তকাল ধরে থাকতে হবে।'

'জলদি জলদি খেয়ে নাও,' তাগাদা দিল কিশোর। 'কেউ দেখে ফেললে আমাদেরও ভরবে। তোমাকে এখানে ফেলে যেতে খারাপ লাগবে। কিন্তু কি

করব। বের করে নিয়ে গেলে ক্যাপ্টেন আমাদের আস্ত রাখবে না।'

'থাক থাক, নেয়া লাগবে না,' বার্গারে কামড় বসিয়ে বলল মুসা, 'এখানেই ভাল আছি। কাজকাম থেকে বেঁচে গেলাম। রোজ এ রকম করে খাবার দিয়ে যেয়ো, তাহলেই হবে।'

'রোজ আর কোথায়, দুই রাত। আজকের রাত তো চলেই গেল, আর একরাত। থাকো তুমি। দেখি, ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ কতদূর এগিয়ে নিতে পারি আমরা।'

'তোমার প্ল্যানটা কি?'

'মালখানার কাণ্ডগুলো পরীক্ষা করব। আমার ধারণা, ওগুলো সাধারণ কাণ্ড নয়, কোন ঘাপলা আছে।'

'হুমকি দিয়ে যে নোটটা লিখল, সে-ব্যাপারে কি ভাবছ? কে লিখেছে কিছু বুঝতে পারছ?'

'না। তবে জাহাজের কেউ যদি আমাদের চিনে ফেলে এই নোট দিয়ে থাকে, সে শত্রু নয়; তাহলে এতক্ষণে ক্যাপ্টেনের কাছে ধরিয়ে দিত আমাদের।'

'তাহলে সামনে আসছে না কেন সেই লোক? অদৃশ্য হয়ে থাকা রহস্যময় কেউ বন্ধু হলেও আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়।'

'আমাকেও,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, আমরা এখন যাই। কাল দেখা হবে।'

মুসার কাছ থেকে সরে এসে কার্গো হোল্ডের দিকে চলল কিশোর আর রবিন। গলি ধরে এগিয়ে মোড় ঘুরতেই বমারের মুখোমুখি পড়ে গেল।

থমকে দাঁড়াল বমার। 'এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'ঘরের মধ্যে হাঁসফাঁস লাগছে, তাই একটু...'

'যাও, কোয়ার্টারে যাও!' কঠোর স্বরে বলল বমার।

আপাতত ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরও রাত হলে আবার বেরোবে, মনে মনে ঠিক করে রবিনকে নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এল কিশোর।

কিন্তু সারারাতে আর কোন সুযোগই পেল না। কয়েকবার করে বমারের গলা শুনতে পেল প্যাসেজওয়েতে। বেরোতে গেলে তার চোখে পড়ে যেতে পারে। আবার ওদের বাইরে দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে লোকটার। ঝুঁকি নিতে চাইল না কিশোর। এ ভাবে বেরোনো ঠিক হবে না বুঝে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে।

রবিনের মনে হলো, সে কেবল চোখ মুদেছে, অমনি কানের কাছে ধমক শুনল, 'অ্যাই, ওঠো, আর কত ঘুমাবে!'

চোখ মেলে দেখল, লুক ডাকছে। ডাক শুনে কিশোরও উঠে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে লুকের পিছু পিছু মই বেয়ে ডেকে উঠে এল দুজনে। ভোর হয়ে গেছে। তাজা কোমল বাতাসকে যেন চাবুক মারছে বমারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। আদেশের পর আদেশ দিয়ে চলেছে সে।

'যে যার ডিউটিতে লেগে যাও,' বমার বলল। 'কিশোর পাশা এসো এদিকে।'

ফার্স্ট মেটের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর।

'ডেক পাহারায় থাকবে তুমি। চার ঘণ্টা ডিউটি, চার ঘণ্টা অফ, এ ভাবে ডিউটি দেবে। যাও, ব্রিজে গিয়ে রিপোর্ট করো।'

আগের কাজগুলোও আরামের ছিল না, কিন্তু নতুন কাজটা আরও বিরক্তিকর মনে হলো কিশোরের কাছে। বেশি খারাপ লাগছে এই ভেবে যে একই জায়গায় আটকে থাকতে হচ্ছে তাকে। জাহাজের কোথাও ঘুরতে পারছে না, তদন্ত করা তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাঝরাতের পর তাকে ডিউটি থেকে রেহাই দেয়া হলো। ক্লান্ত হয়ে কোয়ার্টারে ফিরে দেখে তার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে রবিন। তাকেও সারাটা দিন নানা ভাবে খাটিয়ে আধমরা করে ফেলা হয়েছে। ওই অবস্থায়ই দুজনে বেরোল মুসাকে খাবার এনে দিতে।

'এলে,' দেখেই বলে উঠল মুসা, 'আমি তো ভেবেছিলাম আমার কথা ভুলেই গেছ।'

'নিজেদের কথাই ভুলে যেতে বসেছি।' আগের রাতে বমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কি অবস্থা করা হয়েছে ওদের, মুসাকে জানাল কিশোর।

'ওই লোকটা মনে হয় একই সঙ্গে সব জায়গায় থাকে!' মুসা বলল। 'আমাকেও এসে দেখে গেছে।'

'আমরা যাই। এখানে তোমার কাছে দেখে ফেললে সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

ফিরে এসে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আসল কাজের কি করবে?'

'এখনই বেরোব। পশ্চিম দিকে মেঘ করেছে দেখে এলাম। ব্রিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বমার। বার বার মেঘের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হয় ঝড় আসবে। এলে ওদিকেই নজর থাকবে তার, কার্গো হোল্ডে দেখতে আসার আর সময় পাবে না।'

'আর কেউ যদি আসে?'

'সেই ভয়ে তো আর বসে থাকতে পারি না।'

ধীরে ধীরে গড়াতে আরম্ভ করেছে জাহাজ, এ পাশ কাত হচ্ছে, ওপাশ কাত হচ্ছে। না দেখেও বলে দেয়া যায় অশান্ত হয়ে উঠেছে সাগর। ঢেউ বড় হচ্ছে।

কার্গো হোল্ডের দিকে রওনা হলো দুই গোয়েন্দা। প্যাসেজওয়ে ধরে চলতে গিয়ে সামনে পায়ের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল কিশোর। তার পেছনে রবিন। কারা যেন আসছে। আশপাশে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল কিশোর। একপাশে একটা দরজা দেখে চট করে ঢুকে গেল ভেতরে। ঘর না বলে বড় আলমারি বলাই ভাল। ঝাড়ু, দড়ি আর নানা বাজে জিনিসে বোঝাই। তার মধ্যেই ঠেসেঠুসে জায়গা করে নিল নিজেদের। কথা শুনতে পেল।

'এসো এসো, জলদি এসো!' চিৎকার করে বলল এক নাবিক। 'বমার ডাকছে। আকাশের যা অবস্থা, আজ-রাতে কপালে দুঃখ আছে সবার।'

পায়ের শব্দে আন্দাজ করল কিশোর, কম করেও ছয়জন লোক প্যাসেজওয়ে দিয়ে ছুটে গেল।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর মিনিটখানেক অপেক্ষা করে দরজা খুলল কিশোর। আবার এগোল কার্গো হোল্ডের দিকে। হঠাৎ করে বেড়ে গেছে জাহাজের দোলানি। দ্রুত বড় হচ্ছে ঢেউ। ঝড়টা বুঝি এসেই পড়ল।

কার্গো হোল্ডের মুখে রবিনকে পাহারায় রেখে ভেতরে ঢুকল কিশোর। টর্চ জ্বেলে এসে দাঁড়াল গুঁড়িগুলোর সামনে। ঠিক এই সময় বিশাল একটা ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে গেল জাহাজ। সাংঘাতিক একটা দুলুনিতে কাত হয়ে গেল একপাশে। জায়গামত রইল না আর গুঁড়িগুলো। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

চোদ্দ

বিকট শব্দে জাহাজের ধাতব খোলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গুঁড়িগুলো। এর নিচে চাপা পড়লে হাড্ডি আর আস্ত থাকবে না একটাও।

পাগলের মত বাঁচার উপায় খুঁজল কিশোর। মাথার ওপরের কড়িকাঠকে ধরে রেখেছে একটা লোহার মোটা পাইপ দিয়ে তৈরি থাম। আর কিছু না দেখে পাইপটা বেয়েই উঠে গেল সে। নিচে গড়াগড়ি খেতে লাগল গুঁড়িগুলো।

ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ হচ্ছে। পাইপেও এসে কোন কোন গুঁড়ি বাড়ি খেয়ে জাহাজের দোলার সঙ্গে তাল রেখে ফিরে যাচ্ছে। থরথর করে কেঁপে উঠছে পাইপ। কিশোরের ভয় হচ্ছে, এই ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে পিছলেই পড়ে যাবে সে। হাত-পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আছে।

বাইরে বাড়ছে ঝড়ের বেগ।

বেশিক্ষণ আর এ ভাবে থাকতে পারবে না, বুঝতে পারছে সে। নিচে পড়লে যে কি হবে ভাবতে চাইল না।

বাইরে কি করছে রবিন? সে কি এই শব্দ শুনতে পাচ্ছে না?

আলো জ্বলে উঠল কার্গো হোল্ডের ভেতর। কয়েকজন নাবিক এসে ঢুকল। চোখ বড় বড় করে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওরা গড়াগড়ি খেতে থাকা গুঁড়িগুলোর দিকে। তারপর ছুটে এল তুলে নিয়ে গিয়ে জায়গামত বেঁধে রাখার জন্যে। তাদের মধ্যে রবিনকে দেখল না কিশোর।

গুঁড়িগুলো সরাতে বেগ পেতে হলো লোকগুলোর। পাইপে এসে বাড়ি খাচ্ছিল যেগুলো, সেগুলো সরিয়ে ফেলতেই হাত ছেড়ে দিয়ে ধপ করে নেমে পড়ল কিশোর।

'এখানে কি করছিলে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন।

এই সময় ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেন। ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আওয়াজ হচ্ছিল?'

জানাল একজন নাবিক।

গুঁড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন, 'সব ঠিক করা হয়েছে?'

'হয়েছে, স্যার। কিন্তু এই ছেলেটা এখানে কি করছে বুঝতে পারছি না। আমরা ঢুকে দেখি ওই পাইপটার মাথায় লটকে আছে।'

চোখ পাকিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'এখানে কি করছিলে?'

'ঘুম আসছিল না, স্যার, তাই ভাবলাম বাইরে গিয়ে বসে থাকি…'

'এই ঝড়ের মধ্যে?'

'আসলে, স্যার, ঝড় দেখারও ইচ্ছে ছিল। সমুদ্রে ঝড় দেখিনি তো কখনও। এদিক দিয়ে যেতে যেতে শুনি কার্গো হোল্ডের মধ্যে বিকট শব্দ হচ্ছে। কাল এখানে কাজ করে গেছি। ভাবলাম, কোন জিনিস ভাঙছে না তো? দেখার জন্যে ঢুকেই পড়লাম বিপদে। আরেকটু হলেই পায়ের ওপর এসে পড়ত একটা গাছ। বাঁচার জন্যে পাইপ বেয়ে উঠে গেলাম।'

'ঘরে ঢুকলে কেন? গুঁড়িগুলো পড়ে গেছে দেখে ডাকলেই পারতে।'

'বোকার মত ঢুকে পড়েছিলাম, স্যার। টর্চ জ্বালতেই দেখি গড়িয়ে আসছে গুঁড়িটা। টর্চ ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাইপে উঠে আগে পা বাঁচালাম। তারপর থেকে একটার পর একটা আসতেই আছে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন। চোখে সন্দেহ। তারপর বোধহয় মনে হলো, কিশোর সত্যি কথাই বলছে। কোয়ার্টারে ফিরে যেতে বলল ওকে।

ফিরে এসে দেখে, বাংকে শুয়ে আছে রবিন। কিশোরকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস বলল, 'ছেড়ে দিল! আমি তো ভেবেছি তোমাকেও মুসার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভরবে!'

কি বলে ছাড়া পেয়েছে, বলল কিশোর।

রবিন জানাল, শব্দ হতেই দরজা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল সে। গুঁড়িগুলো গড়াতে দেখে ঘাবড়ে যায়। কি করবে, ঠিক করতে পারছিল না। এই সময় শুনল, কয়েকজন লোক ছুটে আসছে। ধরা পড়লে জবাব নেই, তাই দৌড়ে পালিয়ে আসে।

'ভালই করেছ,' কিশোর বলল। 'দুজনকে একসঙ্গে দেখলে ঝড় দেখার গল্প বলে পার পেতাম না।'

পরদিন সকালে কমে এল ঝড়। ইয়েলো প্যারটের চারপাশ ঘিরে নাচছে ফেনা। ভোর বেলাতেই কিশোর আর রবিনকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। চার ঘণ্টার ডিউটি সেরে বিশ্রাম নেবার জন্যে ব্রিজ থেকে কোয়ার্টারে ফিরছে কিশোর, এই সময় প্যাসেজওয়েতে মুসার সঙ্গে দেখা। টলতে টলতে আসছে।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'কখন ছাড়া পেলে?'

'এই তো, কয়েক ঘণ্টা আগে,' ক্লান্তস্বরে জবাব দিল মুসা। 'লোকের দরকার ওদের। তাই আমাকে খুলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। ইঞ্জিনরুমের গরম! বাপরে বাপ, মেরে ফেলেছে! ইচ্ছে করেই টলে পড়ে গেলাম,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'ওরা ভাবল, না খেয়ে থেকে থেকে কাহিল হয়ে গেছি আমি। কয়েক ঘণ্টার জন্যে মুক্তি দিল।'

'আমাকেও। রবিনের কি অবস্থা কে জানে! ওকেও শেষ করবে!...চলো, সময় যখন পেয়েছি, ঘুমিয়ে শরীরটা চাঙা করে নিই।'

একটানা ঘণ্টা তিনেক ঘুমাল ওরা।

কিশোরের ডিউটির সময় হয়ে গেছে। কাপড় পরে বেরোল সে। সঙ্গে মুসা। ব্রিজে যাওয়ার আগে রান্নাঘরে ঢুকে খেয়ে নিল। ওই সময় মুসাকে জানাল কিশোর গুঁড়িগুলোর কথা। বলল, সুযোগ করে ওগুলো পরীক্ষা করে দেখবে।

'একবার তো ধরা পড়েছ। আবার পড়লে কি কৈফিয়ত দেবে?'

'দেখা যাক। ধরা আর না-ও পড়তে পারি।'

'এক কাজ করা যাক—চলো, এখুনি যাই। সবাই ব্যস্ত। আমাদের দিকে নজর দেবে না কেউ।'

প্রস্তাব মন্দ নয়। রাজি হয়ে গেল কিশোর। দুজনে মিলে চলে এল কার্গো হোল্ডে। আসার পথে কাউকে দেখল না। দিনের আলো আছে এখনও, কিন্তু তা-ও ভীষণ অন্ধকার। জাহাজের এই খোলের মধ্যে দিন-রাত্রির কোন প্রভেদ নেই, আলো ঢোকে না।

'আলো জ্বালা যাবে না,' কিশোর বলল। 'টর্চ জ্বালো। গুঁড়িগুলোর ওপর ধরে রাখো।'

আলো ধরল মুসা।

'অবাক কাণ্ড!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি?'

'ঝড়ের জন্যে ভুল শুনলাম না তো!'

'কি, বলো না?'

'গড়াগড়ির শব্দ। নিরেট কাণ্ড হলে যেমন হত তেমন নয়, কেমন ফাঁপা।'

'খাইছে! তুমি ভাবছ...' থেমে গেল মুসা। মৃদু একটা শব্দ কানে এসেছে। কিশোরও শুনেছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'আলো নেভাও!'

পনেরো

অন্ধকারে কান পেতে আছে দুজনে। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের শব্দকেও অনেক বেশি লাগছে ওদের কাছে। মনে হচ্ছে, আরও আস্তে শব্দ করে না

কেন? শুনে ফেলবে তো!

আবার শুনতে পেল শব্দটা। ওদের পেছন থেকে আসছে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল দুজনে।

ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র উজ্জ্বল নীলচে আলো।

'আমি তোমাদের ভাল চাই,' বলল একটা কণ্ঠ। 'তদন্ত বাদ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো জাহাজ থেকে নেমে যাও। পালাও।'

ওরা কোন প্রশ্ন করার আগেই কার্গো হোল্ডের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। চলে গেছে লোকটা।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বেরিয়ে যাব। ওই লোকটা কে, কি করবে, কিছুই জানি না। সে যখন এসেছে অন্য কেউও আসতে পারে। এই অবস্থায় ধরা পড়লে মহাবিপদে পড়ব।'

এবারও গুঁড়িগুলো পরীক্ষা করা হলো না। বেরিয়ে এল দুজনে।

কোয়ার্টারে এসে দেখে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রবিন। কাজ করিয়ে করিয়ে কাহিল বানিয়ে দিয়েছে ওকেও। ওদের দেখে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

খুলে বলল সব কিশোর।

ওদের মতই রবিনও চিন্তায় পড়ে গেল। 'এই লোকই নোট লিখে বাংকে ফেলে গেছিল।'

'কোন সন্দেহ নেই,' কিশোরও এ ব্যাপারে একমত। 'কিন্তু এখানে কি খেলা খেলছে ও, বুঝতে পারছি না। যদি জানেই আমরা কে, এই রহস্যময় আচরণ কেন করছে? কেন সামনে আসছে না?'

'ব্ল্যাকমেল করতে চায় না তো আমাদের?' মুসা বলল, 'হয়তো ভাবছে, আমরা কে এটা বলে দেয়ার ভয় দেখালেই তাকে টাকা দিয়ে দেব আমরা।'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সে-রকম কিছু হলে এতক্ষণে চলে আসত আমাদের কাছে।'

'আমরা এখন কি করব?' রবিনের প্রশ্ন।

'চলো, ডেকে উঠি। তারপর জাহাজের এখানে ওখানে ঘোরার চেষ্টা করব। কিছু সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

'তোমরা যাও,' রবিন বলল। 'আমি শুয়ে থাকি। ওঠার শক্তি নেই।'

'থাকো। আমরা ঘুমিয়ে নিয়েছি, অসুবিধে হবে না।'

রবিনকে কোয়ার্টারে রেখে মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। ডেকে উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমন ভঙ্গি দেখাল, কাজ নেই, তাই সময় কাটাতে এসেছে দুজনে।

রেডিও রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুসার হাত চেপে ধরল কিশোর। উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা। ভেতরে কথা বলছে দুজন মানুষ। একটা গলা

ওদের চেনা। কার্গো হোল্ডে এই লোকই ওদের সাবধান করেছিল, কোন সন্দেহ নেই কিশোরের।

'খাইছে!' মুসাও চিনে ফেলেছে। 'এ তো সেই লোক!'

'আস্তে!'

একটু পর কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল দুজন লোক। একজনকে সাধারণ নাবিক মনে হচ্ছে। আরেকজনের চেহারা অত সাধারণ নয়। বয়েসে তরুণ, মাথায় লাল চুল। জাহাজের রেডিও অপারেটর। কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল এই লোকই সাবধান করেছিল কিশোরদের।

'ঠিক আছে,' নাবিক বলল, 'অ্যান্টেনাটা চেক করছি এখুনি।'

'আচ্ছা।'

ঘুরে আবার রেডিও রুমে ঢুকে গেল লাল-চুল লোকটা। দরজা লাগিয়ে দেয়ার আগেই পা বাড়িয়ে আটকে ফেলল কিশোর। ঠেলে দরজা খুলে সে আর মুসাও ঢুকে গেল।

'কিছু মনে করবেন না,' কিশোর বলল, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

একটা মুহূর্ত থমকে রইল লোকটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'তোমরা…কি কথা? কোন্ ব্যাপারে?'

'আপনার নাম কি?'

'টপ। টপ জেনসার।'

সরাসরি আসল কথায় চলে এল কিশোর, 'হুমকি দিয়ে নোট লিখে রেখে আসা, কার্গো হোল্ডে গিয়ে সাবধান করা, এ সবের মানে কি, বলুন তো?'

'কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না!'

তাকের ওপর রাখা একটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান চোখে পড়ল কিশোরের। 'ওটা আপনার?'

'না না,' অস্বস্তি ভরা গলায় বলল রেডিওম্যান, 'কোন নাবিক ফেলে গেছে হয়তো!'

টপ বাধা দেয়ার আগেই এগিয়ে গিয়ে তাক থেকে জিনিসটা নামিয়ে হাতে নিল কিশোর। ওটার ধাতব শরীরে খোদাই করা আছে দুটো ইংরেজি অক্ষর T. J. মুখ তুলে তাকাল সে। 'আপনার নামের আদ্যক্ষর বলেই তো মনে হচ্ছে। নাকি কাকতালীয় ব্যাপার বলতে চান? যে নাবিকের কথা বলছেন, তার নাম আর আপনার নামের আদ্যক্ষর কি এক?'

টপের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'বেশ, ওটা আমারই! তাতে কি?'

'খানিক আগে মালখানায় আমাদের ছবি তুলেছেন আপনি। কেন?'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রেডিওম্যান। 'নাহ্, মিথ্যে বলে পার পাওয়া যাবে না তোমাদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম, তবে ছবি তুলিনি। ফ্ল্যাশার জ্বেলে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, যাতে আমাকে দেখতে না পাও। শোনো, আমি জানি তোমরা তিন গোয়েন্দা।'

'কি করে জানলেন?'

'গোয়েন্দা গল্প আমার ভাল লাগে। রহস্য গল্পের বই পড়ি, সিনেমা দেখি। তোমাদের কাহিনী নিয়ে ডেভিস ক্রিস্টোফারের বানানো একটা ছবি দেখেছি। তা ছাড়া পত্রিকাতেও তোমাদের ছবি দেখেছি। তাই জাহাজে উঠতে দেখেই চিনে ফেলেছি।'

'আমাদের সাবধান করেছেন কেন?'

'আমি জানি, ইয়েলো প্যারটে তদন্ত করতে উঠেছ তোমরা। কিন্তু বিশ্বাস করো, সিংহের খাঁচায় পা দিয়েছ। ভয়ঙ্কর লোক ওরা। তোমাদের কোন ক্ষতি হয়ে যাক এ আমি চাই না।'

'আমাদের নিয়ে যে ভাবছেন, এ জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ,' খানিকটা বাঁকা করেই বলল মুসা, লোকটার কথা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, 'কিন্তু আসলে কি চান আপনি? আমাদের পরিচয় এখনও ক্যাপ্টেনকে জানাননি কেন?'

'সেটা বলা যাবে না তোমাদের,' টপ বলল।

'আমাদের পরিচয় জাহাজে আর কেউ জানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানি না। আমি অন্তত বলিনি। বলবও না।'

'থ্যাংকস। ইয়েলো প্যারট কিংবা আপনার সম্পর্কেও কি আমাদের কিছু বলতে পারেন না?'

ভয় দেখা দিল টপের চেহারায়। 'আমার কিছু বলার নেই। তবে তোমাদের কথা বলতে পারি, কি বিপদের মধ্যে রয়েছ কল্পনাও করতে পারছ না তোমরা। আমার বুদ্ধি শোনো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাও এই জাহাজ থেকে। আমি তোমাদের সাহায্য করব।'

'আমাদের তাড়ানোর জন্যে মনে হয় অস্থির হয়ে আছেন আপনি?' আবারও বাঁকা করেই বলল মুসা।

এই সময় একজন নাবিক ঢুকল সেখানে। ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ দিল টপকে। 'এটা এখুনি পাঠাতে বলেছেন ক্যাপ্টেন।'

কাগজটা দিয়ে চলে গেল নাবিক।

মেসেজটা পড়ল টপ। রেডিওর কাছে গিয়ে একটা সুইচ অন করল। গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল না। 'মেসেজটা জরুরী।'

কেমন সন্দেহ হলো কিশোরের। কেন যেন মনে হলো, এই মেসেজের সঙ্গে ওদের তদন্তের সম্পর্ক আছে। অনুরোধের সুরে বলল, 'কি লিখেছে? দেখতে পারি?'

ফিরে তাকাল রেডিওম্যান। একটা মুহূর্ত দেখল ওকে। তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিল, 'এটা তোমাদের পড়তে দেয়া ঠিক হচ্ছে না। তবু দিলাম, দেখো।'

কাগজটা হাতে নিল কিশোর। দেখার জন্যে তার কাঁধের ওপর দিয়ে গলা বাড়াল মুসা।

পড়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর।

অবাক হলো টপ। 'কি হলো?'

কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'মেসেজ!'

'চমকালে কেন?'

'ব্ল্যাক প্যারটের ক্যাপ্টেনকে টামবিও আইল্যান্ডের কাছে দেখা করতে বলছে ইয়েলো প্যারটের ক্যাপ্টেন!'

'তাতে কি?'

'তাতেই সব কিছু!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

ষোলো

টপকে বিশ্বাস করা যায় কিনা ভাবল কিশোর। এ যাবৎ লোকটা যা যা করেছে ওদের জন্যে, সেগুলো বিবেচনা করে মনে হলো, যায়। ব্ল্যাক প্যারটকে নিয়ে ওদের তদন্তের কথা জানাল সে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রেডিওম্যানের। 'তারমানে সামনে আরও ভয়ানক বিপদ তোমাদের! ব্ল্যাক প্যারটের লোক উঠবে এ জাহাজে। ওদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে, যে তোমাদের চিনে ফেলবে।'

'খাইছে!' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কি করব?'

'ওই সময় আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে, যাতে ওদের চোখে না পড়ি।'

'ওতে কাজ না-ও হতে পারে। তোমাদের যদি লুকিয়ে থাকতে না দেয় বমার? ডেকের ওপর কাজ দিয়ে দেয়? দ্বীপে ভিড়লে জাহাজ থেকে নেমে গিয়েও রেহাই পাবে না। বার বার নাবিকদের খোঁজ করে ক্যাপ্টেন, চেক করে দেখে জাহাজে আছে কিনা। তোমরা যে নেই সঙ্গে সঙ্গে জানাজানি হয়ে যাবে।'

'হুঁ!' ছোট্ট ঘরটায় পায়চারি শুরু করল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। 'একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে। কোন না কোন উপায় নিশ্চয় আছে।'

'অনেকক্ষণ থেকেছ, এবার তোমাদের কোয়ার্টারে ফিরে যাও,' টপ বলল, 'ওখানে গিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো। ইতিমধ্যে আমি মেসেজটা পাঠাই। এক ঘণ্টা পর মেইন ডেকে দেখা কোরো। পেছন দিকে থাকব আমি।'

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

'টপকে কেমন মনে হলো?' প্রশ্নটা মুসাকে নয়, যেন নিজেকেই করল কিশোর।

'প্রথম দিকে তো বিশ্বাস করতে চাইনি,' মুসা বলল। 'কিন্তু পরে কথাবার্তা শুনে মনে হলো বিশ্বাস করা যায়। না করেই বা উপায় কি?'

'তা তো বটেই। কিন্তু আমাদের পক্ষেই যদি হয়, নিজের কথা বলতে চাইল না কেন?'

'কোন কারণে ভয়-টয় পেয়েছে হয়তো। জোর করেও এই জাহাজে তাকে তোলা হয়ে থাকতে পারে।'

ফিরে এসে রবিনকে সব জানাল দুজনে। রবিনও চিন্তিত হলো।

এক ঘণ্টা পর তিনজনেই ডেকে উঠে পেছন দিকে চলে এল।

কথামত ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রেডিওম্যান।

'অবস্থা যা ভেবেছি তার চেয়ে খারাপ,' অন্য কেউ শুনে ফেলার ভয়ে নিচু স্বরে বলল সে। 'দুই জাহাজে নাবিক বদলা-বদলি করার কথা ভাবছে ব্ল্যাক প্যারটের ক্যাপ্টেন।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রবিন। 'চিনে ফেলবে আমাদের!'

'তোমাদের সামনে পথ এখন একটাই, পালানো। টামবিও আইল্যান্ডে নেমে যাওয়া।'

'এবং তারপর না খেয়ে মরি!' ভোঁতা গলায় বলল মুসা। 'রবিনসন ক্রুসোর মত বন্দি হই অজানা দ্বীপে!'

'মরবে না,' আশ্বস্ত করতে চাইল টপ। 'শুনেছি, দ্বীপের একধারে এক সন্ন্যাসী বাস করেন ওখানে। তাঁর কাছে থাকতে পারবে যে কটা দিন অন্য কোন জাহাজে চড়ে দেশে ফেরার সুযোগ না পাও।'

'ওই একই কথা, নির্বাসিতই হব।'

'আর এই জাহাজে থাকলে জীবন থেকেই নির্বাসিত হবে, পরপারে চলে যাওয়া লাগবে—কোনটা ভাল?'

চুপ করে শুনছিল আর ভাবছিল কিশোর, জিজ্ঞেস করল, 'কখন দেখা হচ্ছে জাহাজ দুটোর?'

'আগামী কাল রাতে।'

'তীরে ভিড়বে নাকি?'

'মনে হয় না।'

'তারমানে সাঁতরে তীরে উঠতে হবে আমাদের?' মুসার প্রশ্ন।

'এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না,' জবাব দিল কিশোর।

'বেশ, তাহলে এইই করো,' টপ বলল। 'কাল রাতে দেখা করব, সাহায্য করব তোমাদের। রাত দশটায় দেখা হবে জাহাজ দুটোর, তোমরাও ওই সময় পালানোর জন্যে তৈরি থেকো। চলি। গুড বাই।'

পরদিন সারাটা দিন ওদেরকে খাটিয়ে মারল বমার। অন্ধকার হওয়ার অনেক পরে ওদেরকে রেহাই দিল। প্রায় নয়টা বাজে তখন।

কোয়ার্টারে এসে দশটা বাজার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

'আর এক ঘণ্টা মাত্র বাকি,' কিশোর বলল। 'পারো তো খানিকটা জিরিয়ে নাও।'

দশটা বাজার খানিক আগে বেরোল তিনজনে। বেরিয়েই চোখে পড়ে গেল বমারের। গর্জে উঠল ফার্স্ট মেট, 'এই, এদিকে এসো!'

'কি চায় আবার?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

এগিয়ে গেল ওরা।

'আজকের রাতটা ব্রিগে কাটাতে হবে তোমাদের তিনজনের,' শীতল কণ্ঠে বলল বমার।

'কেন?' রেগে গেল মুসা। 'কি করেছি আমরা?'

'চুউপ!' গর্জে উঠল বমার। 'মুখে মুখে কথা! সিনিয়রদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানো না! এই একটা অপরাধেই ব্রিগে আটকে রাখা যায় তোমাদের।'

'এ তো জাহাজ না, মগের মুল্লুক...'

মুসাকে কথা শেষ করতে দিল না বমার। কয়েকজন নাবিককে ডেকে ওদের নিয়ে যেতে বলল।

জোর করে ধরে এনে ওদেরকে ব্রিগে ভরে তালা দিয়ে চলে গেল নাবিকেরা।

'এইবার মরেছি!' রবিন বলল। 'বমার ব্যাটা আমাদের পালানোর কথা জেনে ফেলেনি তো?'

'মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'সাবধান হতে চেয়েছে। আমাদের বিশ্বাস করে না মোটেও। গোপন কিছু যদি জেনে ফেলি, এই ভয়ে এখানে আটকে রেখেছে।'

কয়েক মিনিট পর খসখস শব্দ শোনা গেল। হালকা পায়ে এসে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি। ফিসফিস করে বলল, 'আমি, টপ। তোমাদের বের করতে এসেছি।'

একটা শাবল নিয়ে এসেছে সে। সেটা দিয়ে চাড় মেরে দরজার কব্জা ছুটিয়ে দিয়ে ডাকল, 'বেরিয়ে এসো। দ্বীপের সিকি মাইল দূরে রয়েছে জাহাজ। এটুকু পথ সাঁতরে যেতে পারবে আশা করি।'

মুসা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'পারব।'

রবিন জানে, সে-ও পারবে। কিশোর দমে গেল। সাঁতার সে-ও পারে, তবে পানি তার ভাল লাগে না। তা ছাড়া রাতের সাগরকে তার ভয় লাগে। কিন্তু উপায় নেই। সাঁতরাতেই হবে। বলল, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল ইয়েলো প্যারটের ইঞ্জিন। ব্রিজ থেকে ফার্স্ট মেটের চিৎকার শোনা গেল, 'নোঙর ফেলো!'

রেলিঙের কাছে ওদেরকে নিয়ে এল টপ। একটা দড়ি বেঁধে রেখেছে। সেটা বেয়ে নেমে যেতে বলল। 'খুব সাবধানে নামবে, শব্দ যাতে না হয়। কেউ দেখে ফেললে আর রক্ষা নেই। যাও।'

সবার আগে নেমে যেতে শুরু করল মুসা।

টপকে বলল কিশোর, 'এ জাহাজের লোক নন আপনি, বোঝা যাচ্ছে। অন্তত ওই নাবিকগুলোর মত নন। থাকছেন কেন? চলে আসুন না আমাদের সঙ্গে?'

'না...আমি যেতে পারব না,' ভাঙা গলায় জবাব দিল টপ।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল কিশোর। টপকে দিয়ে বলল,

'এতে একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি লিখে দিয়েছি। রেখে দিন।'

কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে প্রশ্ন করল টপ, 'কি কাজ হবে এটা দিয়ে?'

'এটা ডিটেকটিভ ভিকটর সাইমনের রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি। কোন বিপদে পড়লে মেসেজ পাঠিয়ে শুধু বলবেন, বিপদে পড়েছি, সাহায্যের জন্যে তিন গোয়েন্দাকে দরকার। জাহাজের অবস্থান জানাবেন। আপনাকে সাহায্য করার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা।'

মুসা আর রবিন নেমে গেছে। টপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিশোরও এগিয়ে গেল।

সতেরো

ঢেউ নেই। পানি শান্ত। কোন রকম শব্দ না করে তীরের দিকে সাঁতরে চলল তিনজনে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল বালিতে ঢাকা একটা সৈকতে।

হাত-পা ছড়িয়ে বালিতেই শুয়ে পড়ল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'যাক, নিরাপদেই আসতে পারলাম।'

মুসার অত পরিশ্রম হয়নি। সিকি মাইল সাঁতরানো তার জন্যে কোন ব্যাপারই না। সৈকতের ওপাশে কি আছে দেখতে লাগল। গাছপালা, ঝোপঝাড় আছে। ওগুলোতে লুকিয়ে থাকতে পারবে। উঠে গিয়ে তিনটে ডাল ভেঙে নিয়ে এল। একেকটা ডাল একেকজনের হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো দিয়ে যার যার পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে যাব। তাহলে কেউ পিছু নিতে পারবে না।'

ঝোপের মধ্যে একটুখানি খোলা জায়গা পেয়ে সেখানে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল ওরা।

সকালে সূর্য ওঠার পর ঘুম ভাঙল। ভীষণ গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। এই সকাল বেলাতেই রোদ এত কড়া, বেলা বাড়লে কি হবে! গাছে গাছে পাখি ডাকছে। বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে নারকেল গাছের ডগা।

কানে এল মানুষের গলা।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে শব্দ যেদিকে হচ্ছে সে-দিকে তাকাল ওরা।

একটা ডিঙি এসে ভিড়েছে সৈকতে। কয়েকজন লোক নেমেছে।

'কই, কোন চিহ্নই তো দেখছি না,' বলল একজন। 'এখানে আসেনি। জাহাজেই কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো।'

'আমারও তাই মনে হয়,' জবাব দিল আরেকজন। 'বমার বড় বেশি ভয় পাচ্ছে। ব্রিগের দরজা ভেঙে বেরিয়ে পালিয়েছে ওরা; যাক না, কি ক্ষতি করবে? আর যদি এই দ্বীপেও উঠে থাকে, তাতেই বা কি?'

'ধুর, আমার খিদে পেয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল তৃতীয় আরেকজন। 'নাস্তা করেও আসতে পারলাম না। বমারের সঙ্গে নেচে নেচে এ সব পাগলামির কোন মানে নেই। চলো, চলে যাই। এখানে আসেনি ওরা।'

আবার ডিঙিতে গিয়ে উঠল ওরা। জাহাজে ফিরে চলল।

তীর থেকে দূরে ব্ল্যাক প্যারট আর ইয়েলো প্যারট, দুটো জাহাজই নোঙর করে আছে, দেখতে পেল গোয়েন্দারা।

'ভোরে উঠে আমাদের না দেখেই খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে,' মুসা বলল।

'ভাগ্যিস নাক ডাকাওনি তুমি,' রসিকতা করল কিশোর।

সন্ন্যাসীর খোঁজে তখুনি বেরিয়ে পড়ল ওরা। টপ বলেছে দ্বীপের একধারে থাকেন। কোন ধারে?

'বেশিক্ষণ লাগবে না খুঁজতে,' চারদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'বেশি বড় না দ্বীপটা।'

কিন্তু ঘন ঝোপ আর গাছপালা অসুবিধের সৃষ্টি করছে, গতি ধীর করে দিচ্ছে ওদের। একধার থেকে আরেক ধারে আসতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। পাঁচশো গজ দূরে সৈকতের কিনারে একটা অদ্ভুত কুঁড়েঘর। এতই ছোট, ওতে মানুষ বাস করা অসম্ভব—দৈর্ঘ্যে চার ফুট মাত্র, প্রস্থেও চার। খুব মজবুত করে বানানো। সেগুন কাঠের শক্ত দরজা। আধুনিক নব লাগানো।

'কি বুঝছ?' আরেকটু কাছে এগিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। 'এত ছোট ঘরে মানুষ বাস করে!'

'দেখতে হবে! সন্ন্যাসী মানুষ, হয়তো সারাক্ষণই বসে থাকেন, শোয়ার প্রয়োজন হয় না।'

'ডাকব নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'না, ডাকব না। চমকে দিলে রেগে যেতে পারেন। বলা যায় না, সন্ন্যাসী পাগলও হতে পারেন। এ রকম জায়গায় স্বাভাবিক কোন মানুষের পক্ষে বাস করা কঠিন।'

সাবধানে ঘরটার চারপাশ ঘুরে দেখল ওরা। অবাক লাগল একটাও জানালা নেই দেখে।

'কোন মানুষের চিহ্ন তো দেখছি না,' কিশোর বলল।

'নেই হয়তো,' মুসা বলল। 'কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক আগেই কেটে পড়েছেন আমাদের সন্ন্যাসী সাহেব। না খেয়ে মরতে হবে এবার আমাদের।'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। নিচের দিকে চোখ। 'দেখো দেখো, পায়ের ছাপ।'

মুসা আর রবিনও তাকাল। বালিমাটি হলেও ঘাস জন্মেছে।

মাথা নুইয়ে উবু হয়ে ভাল করে দেখে রবিন বলল, 'গেছে তো সৈকতের দিকে। মাছ ধরতে যায়নি তো?'

'না, এগুলো পুরানো ছাপ। এত কথা না বলে কুঁড়ের ভেতরে কি আছে দেখলেই তো চুকে যায়,' বলে দরজার দিকে এগোল কিশোর। নব ধরে

মোচড় দিয়ে ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লা।

ভেতরের আবছা অন্ধকারে চোখে সওয়াতে কয়েক সেকেন্ড লাগল ওদের। কিছুই নেই, কেবল একধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির তলায়।

এত ছোট ঘরের মানে এতক্ষণে বুঝতে পারল ওরা, এটা সিঁড়িঘর। আসল ঘর রয়েছে মাটির নিচে।

'আশ্চর্য! মাটির নিচে ঘর বানিয়েছে?' ভীষণ অবাক হয়েছে রবিন।

'এতে অবাক হওয়ার কি হলো? কত রকমের পাগল আছে দুনিয়ায়।'

আগে আগে চলল কিশোর। পেছনে অন্য দুজন। দশটা ধাপ নামার পর সামনে আরেকটা দরজা পড়ল।

টোকা দিল কিশোর।

সাড়া মিলল না।

'চলো, ঢুকে দেখি,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

ভয়ে ভয়ে মুসা বলল, 'আমার কেমন জানি লাগছে! ভাল্লাগছে না! সত্যি ঢুকবে?'

ততক্ষণে দরজায় ঠেলা দিয়ে ফেলেছে কিশোর।

খুলে গেল বড় একটা ঘরের পাল্লা। ভেতরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

আঠারো

ঘরের একপ্রান্তে বিশাল এক চেয়ারে বসা একজন মানুষ। কোন নড়াচড়া নেই। এমনকি চোখের পাতাও পড়ছে না।

'এই যে,' ডাকল কিশোর, 'শুনছেন?'

জবাব নেই।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, ফিসফিস করে বলল, 'আসল তো?'

মানুষটার কাঠে খোদাই করা মুখে যেন বরফের মত জমাট হাসি, নিঃশ্বাসও নেই যেন। গায়ে লাল-সাদা চেকের স্পোর্টস শার্ট, পরনে হাঁটুর কাছ থেকে কেটে ফেলে দেয়া জিনসের প্যান্ট, আর পায়ে সাদা টেনিস শু।

'খাইছে!' মুসার ভয় বাড়ছে, 'মাদাম তুসোর মোমের যাদুঘর থেকে তুলে আনা মোমের পুতুল নয় তো!'

এগিয়ে গিয়ে মুখে আঙুল ছুঁইয়েই চিৎকার করে উঠল রবিন, 'কিশোর, জ্যান্ত মানুষ!'

'কেন, মরা ভেবেছিলে নাকি?' কথা বলে উঠল মোমের পুতুল। হাসল। কিন্তু হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল হাসি, সন্দেহ ফুটল চোখের তারায়। 'কে তোমরা? এখানে এলে কি করে?'

শান্ত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'বললে কি বিশ্বাস করবেন?'

'না করার কি কোন কারণ আছে?'

'নেই। তবে আমাদের কাহিনীটা উদ্ভট লাগতে পারে আপনার কাছে…'

'প্রচুর উদ্ভট ঘটনা ঘটে এই পৃথিবীতে। বলো তোমাদের কাহিনী।'

'তার আগে নিজেদের পরিচয় দিয়ে নিই।'

এক এক করে তিনজনের নাম বলল কিশোর।

সন্ন্যাসীও নিজের নাম বললেন, প্রিক মেরিসন।

ওরা কারা, কি করে এই দ্বীপে এসেছে, সব বিস্তারিত বলল কিশোর। কথা শেষ করে সন্ন্যাসীর দিকে তাকাল, 'বিশ্বাস করলেন তো?'

তাকে অবাক করে দিয়ে নীরবে মাথা দোলালেন সন্ন্যাসী, তারপর হাসলেন, 'করেছি। এটা মোটেও উদ্ভট ঘটনা নয়। মানুষ অপরাধ করে, আবার মানুষই সেই অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়। যাকগে, তোমাদের নিশ্চয় খিদে পেয়েছে…'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা, 'খিদে মানে! পেটের বোধশক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে!'

পাশের আরেকটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন সন্ন্যাসী।

অবাক হয়ে দেখল গোয়েন্দারা, এ ঘরে রেফ্রিজারেটর থেকে শুরু করে, ইলেকট্রিক স্টোভ, ভেনটিলেশন সিসটেম—মোট কথা আধুনিক জীবন যাপনের প্রায় সমস্ত সুযোগ সুবিধেই এখানে আছে। জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন আসছে। ঘরের পাশেই কোথাও আছে যন্ত্রটা। বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

ফ্রিজ থেকে কাগজে মোড়া টাটকা বার্গার বের করে দিলেন সন্ন্যাসী। কিছু ফল আর দুধের বোতলও বের করলেন।

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে খাবারগুলো নিল তিন গোয়েন্দা। অনেকক্ষণ থেকে পেটে কিছু পড়েনি।

পেট কিছুটা শান্ত হয়ে এলে কিশোর বলল, 'কিছু মনে না করলে এবার আপনার কথা বলুন। আপনি এ দ্বীপে কি করছেন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ, ধ্যান করছি। অবশ্যই ঈশ্বরের ধ্যান।'

নিজের কথা বললেন সন্ন্যাসী। মিয়ামিতে তাঁর অনেক বড় ব্যবসা আছে। স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর জগৎ-সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই নির্জন দ্বীপে চলে এসেছেন নিরালায় ঈশ্বরের ধ্যান করে কাটানোর জন্যে। টাকার অভাব নেই, তাই মাটির নিচে এই কটেজ বানাতেও কোন অসুবিধে হয়নি। মাসে দুবার প্লেনে করে খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে যায় তাঁর কোম্পানির লোক। বললেন, ভালই আছেন তিনি এখানে।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে গোয়েন্দাদের।

মেরিসন বললেন, 'দু-একদিনের বেশি এখানে আটকে থাকতে হবে না তোমাদের। প্লেন আসার সময় হয়েছে।'

হেসে বলল মুসা, 'থাকলে বরং খুশিই হব। এমন রাজকীয় খাওয়া-থাকার

ব্যবস্থা থাকলে সারাজীবনই কাটিয়ে দিতে পারব আমি এখানে। দারুণ একটা পিকনিক।'

দ্বীপে চমৎকার কাটতে লাগল তিন গোয়েন্দার দিন।

তিনদিন পর সন্ন্যাসীর রসদ নিয়ে প্লেন এল। ফেরার পথে ওদেরকে তুলে নিল বিমানটা। পাইলটের নাম টেরি নোলান। লম্বা, সুদর্শন, হাসিখুশি এক তরুণ। কয়েক মিনিটেই খাতির হয়ে গেল গোয়েন্দাদের সঙ্গে।

পরদিন গভীর রাতে বাড়ি ফিরল তিন গোয়েন্দা।

তার পরদিন সকালে দেখা করতে গেল ভিকটর সাইমনের সঙ্গে। তাঁকে খুলে বলল সব।

আফসোস করে রবিন বলল, 'কিন্তু এত কিছু করেও লাভ হলো না। ইয়েলো প্যারটের সঙ্গে মিউজিয়ামে ডাকাতির সম্পর্ক আছে কিনা জানতে পারলাম না।'

'তাতে কি?' হাসলেন সাইমন। 'একেবারেই লাভ হয়নি বলতে পারো না। নিরালা দ্বীপে ওরকম একটা পিকনিক করে এলে, এটা কি কম কথা! শুনে আমারই তো লোভ হচ্ছে। যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আরও একটা ব্যাপার,' কিশোর বলল, 'ইয়েলো প্যারটের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থাও করে আসতে পেরেছি। যখন ইচ্ছে টপের সঙ্গে রেডিওতে কথা বলতে পারব। জানা যাবে জাহাজটার পজিশন।'

তা বটে। এদিকটা ভেবে দেখেনি রবিন। চুপ হয়ে গেল। দুঃখ রইল না আর।

উনিশ

পরদিন নতুন ঘটনা ঘটল। রাত দশটায় ইয়ার্ডে ফোন করে সাইমন জানালেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে গোল্ডেন এজ মিউজিয়ামে ডাকাতি হয়েছে। কিশোর যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন।

যাবে তো বটেই, বলল কিশোর। রবিন আর মুসাকে নিয়ে তখুনি তাঁর বাড়িতে আসছে, এ কথাও বলে দিল।

তবে মুসা বা রবিন কাউকে সঙ্গে নিতে পারল না সে। রবিন বাড়ি নেই, বাবার সঙ্গে জরুরী কাজে বেরিয়েছে। কখন ফিরবে, বলতে পারলেন না মিসেস মিলফোর্ড।

আর মুসাকে আটকে দিয়েছে তার আম্মা। বাড়িতে কেউ নেই। তিনিও এক পার্টিতে গেছেন। কত রাতে ফিরবেন, ঠিক নেই। একলা বাড়ি, পাহারা দিতে হবে মুসাকে।

অগত্যা একাই সাইমনের বাড়ি গেল কিশোর। তাকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস রওনা হলেন ডিটেকটিভ।

গোল্ডেন এজ বেশ বড় মিউজিয়াম। ওখানে পৌঁছে দেখল ওরা, পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে কিশোরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন সাইমন। সাদা পোশাকে আসা পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের একজন পরিচিত গোয়েন্দাকে দেখতে পেলেন সেখানে। গোয়েন্দার নাম রড কার্পেন্টার।

সাইমনকে দেখেই এগিয়ে এল রড। হেসে হাত বাড়িয়ে দিল, 'এসে গেছেন।' ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল সে।

পরিচয় করিয়ে দিলেন সাইমন।

'ও কিশোর পাশা,' তার সঙ্গেও হাত মেলাল রড, 'তিন গোয়েন্দা। তোমাদেরও অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। তা তোমার আর দুই দোস্ত কোথায়?'

'বাড়িতে। কাজে ব্যস্ত,' জবাব দিল কিশোর।

কাজের কথায় এলেন সাইমন, 'কোন সূত্র পেলেন?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল রড। 'ভীষণ চালাক চোর। কোন সূত্রই ফেলে যায়নি।'

'গার্ডরা কি বলে?'

'কি আর বলবে। সব্বাইকে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছিল। অন্য মিউজিয়ামগুলোতে গ্যাসের সাহায্যে গার্ডদের বেহুঁশ করে ডাকাতি হয়েছে, এ খবর ওরা শুনেছে। তাই গ্যাস মাস্ক পরে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। প্রতিটি মাস্কেই ফুটো করা। রহস্যময় ব্যাপার।'

'ডাকাতি হতে কেউ দেখেছে?'

'না।'

'পুলিশকে খবর দিল কে?'

'একজন পথিক। মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে একটা ট্রেলার-লরি আলো নিভিয়ে স্পীড দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ে থেকে। সন্দেহ হয় তার। থানায় ফোন করে জানায়। নম্বর প্লেট দেখার কথা মনে ছিল না তার। গাড়ির নম্বর বলতে পারেনি।'

'তারমানে,' কিশোর বলল, 'ওই গাড়িতে করেই মাল সরিয়েছে ডাকাতেরা।'

মাথা ঝাঁকাল রড, 'মনে হয়। লোক লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত ট্রেলার-লরির ওপর নজর রাখছে পুলিশ। শহর থেকে বেরোতে গেলে চেক না করে বেরোতে দিচ্ছে না।'

'গার্ডদের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। চলুন, বলি।'

একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে গার্ডদের সবাইকে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্দেহ মুক্ত না হয়ে ছাড়া হবে না একজনকেও।

সাইমনের প্রশ্নের জবাবে একজন গার্ড বলল, 'হঠাৎ দেখতে পেলাম হালকা ধোঁয়ার মত কিছু উড়ে আসছে, তারপর আর মনে নেই...'

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ভ্যালেন্ট কেমন আছেন? ভাল

আছেন তো?'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল রবড, 'পল ভ্যালেন্ট? কিউরেটর?'

'হ্যাঁ।'

'ডাকাতির কথা শোনার পর থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি আমরা। পাচ্ছি না। বাড়িতেও নেই। তাঁর বন্ধু আর পড়শীরাও জানে না তিনি এখন কোথায় আছেন।'

অবাক হলো গার্ড। 'বলেন কি? শেষবার তাঁকে অফিসে দেখেছি আমি। ডাকাতি হওয়ার খানিক আগে। মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর আবার আসেন তিনি। বললেন, অফিসে কাজ আছে। কতগুলো ফাইল দেখতে হবে।'

'তাই নাকি!' ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে কয়েকজন পুলিশকে ডাকল রবড। বলল, 'জলদি খোঁজা শুরু করো! নিশ্চয় হাত-পা বেঁধে কোথাও বেহুঁশ করে ফেলে গেছে মিস্টার ভ্যালেন্টকে।'

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভ্যালেন্টকে ওবাড়িতে পাওয়া গেল না।

কিশোর বলল, 'তাকে ধরে নিয়ে গেছে হয়তো ডাকাতেরা।'

'তাহলে কপালের দুঃখ আরও বাড়াল আরকি। চুরি-ডাকাতির সঙ্গে কিডন্যাপিঙের অপরাধও যোগ হবে।'

আরও প্রায় ঘন্টাখানেক পর কিউরেটরের অফিসের টেলিফোন বাজল। তুলে নিল একজন পুলিশ। কানে ঠেকিয়ে কথা শুনেই চিৎকার করে উঠল, 'মিস্টার কারপেন্টার, কিউরেটর সাহেব লাইনে আছেন!'

ছুটে এসে রিসিভার ধরল রবড।

ওপাশ থেকে বলল একটা কণ্ঠ, 'আমি পল ভ্যালেন্ট। টিভিতে খবর শুনলাম মিউজিয়ামে ডাকাতি হয়েছে। ঘটনাটা কি?'

'আপনি কোত্থেকে বলছেন?' জানতে চাইল রবড। 'গত কয়েক ঘন্টা ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছি আপনাকে।'

'লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে অনেক দূরে,' জবাব দিলেন কিউরেটর। 'ডকল্যাণ্ডের এক সামার হোমে বেড়াতে এসেছি। দুদিন থাকব।'

'কখন গেছেন?'

'সন্ধ্যা সাতটার পর। একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। দুই ঘন্টা লেগেছে আসতে।'

'কিন্তু একজন গার্ড যে বলল ডাকাতির একঘন্টা আগেই নাকি আপনাকে আপনার অফিসে দেখেছে?'

'অসম্ভব! মিউজিয়াম বন্ধ হতেই বাড়ি চলে গেছিলাম আমি। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। মিউজিয়ামের ধারেকাছেও যাইনি আর।'

কিউরেটরের ঠিকানা জেনে নিয়ে লাইন কেটে দিল রবড। কি কি কথা হয়েছে সাইমনকে জানাল।

কিশোর বলল, 'তিনি সত্যি কথা বলে থাকলে একটাই ব্যাখ্যা দেয়া

যায়—কিউরেটরের অফিসে যাকে দেখেছে গার্ড, সে নকল লোক। ভ্যালেন্টের ছদ্মবেশে এসেছিল।'

'ঠিক,' সাইমনও একমত হলেন। 'খুব চালাকি করেছে ডাকাতেরা। ভ্যালেন্টের ছদ্মবেশে একজন ডাকাতকে ঢুকিয়ে দিয়ে কাজ সহজ করে নিয়েছে। গার্ডরা ঢুকতে বাধা দেয়নি ওকে। সে আগে ঢুকে তার সহকারীদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে...'

ছুটে এসে ঘরে ঢুকল একজন পুলিশম্যান। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'লরিটা পাওয়া গেছে, স্যার। বারো মাইল দূরে একটা রাস্তার ধারে ফেলে গেছে। কিছুই পাওয়া যায়নি ওটার ভেতর।'

খবরটা শুনে ব্রডের দিকে তাকাল কিশোর, 'মিস্টার কার্পেন্টার, একটা নির্দেশ দিতে পারবেন? ডিউটিতে যারা আছে তাদের বলে দিন, গাছের গুঁড়ি বহনকারী যে কোন লরিকে আটকাতে।'

অবাক মনে হলো ব্রডকে। 'তা বলা যাবে। কিন্তু কারণটা কি? কিছু জানো নাকি?'

'এখন কিছু বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে আটকানো দরকার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ব্রড। তারপর মুচকি হাসল। 'খাঁটি গোয়েন্দা। সময় না হলে কিছুতেই তথ্য ফাঁস করতে রাজি নও। বেশ, আমি নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।'

আপাতত আর কিছু করার নেই। কিউরেটরের অফিসে ব্রড আর সাইমনের সঙ্গে বসে রইল কিশোর। লরির খোঁজ পাওয়ার অপেক্ষায়।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কিশোর, একজন পুলিশের কথায় তন্দ্রা টুটে গেল। বলছে, 'একটা লরির খোঁজ পাওয়া গেছে। বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। গাছের গুঁড়ি বহন করছে। লাইসেন্স প্লেটটা নকল।'

পুরো সজাগ হয়ে গেল কিশোর।

ব্রড জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় এখন ওটা?'

'বন্দর থানায়। ড্রাইভার আর তার সঙ্গের লোকটাকে আটক করা হয়েছে।'

উঠে দাঁড়াল ব্রড। কিশোর আর সাইমনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল, 'চলুন।'

বিশ

মোট বারোটা গাছের গুঁড়ি আছে লরিতে।

একটা পাথর তুলে নিয়ে লরির পেছনে উঠে গেল কিশোর।

কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে ব্রড। 'কি করবে?'

'এখনই দেখতে পাবেন।'

প্রতিটি গুঁড়ির গায়ে পাথর দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল কিশোর। বাড়ি মারে আর কান পেতে আওয়াজ শোনে। মাথা নাড়ে আনমনে। তারপর একটাতে বাড়ি মেরেই থমকে গেল। আবার মারল। আবার। উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এটা ফাঁপা!'

তাকে সাহায্য করতে উঠে গেল ব্রড আর দুজন পুলিশম্যান। মিস্টার সাইমন নিচে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছেন।

ধরাধরি করে গুঁড়িটা নিচে নামানো হলো।

গুঁড়ির দুই প্রান্ত পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। অবশেষে হাসি ফুটল তার মুখে। গুঁড়ির একপ্রান্তে বোতলের মুখের ছিপির মত করে ছিপি লাগানো। লাগানোর পর রঙ দিয়ে এমন করা হয়েছে, ওটা যে আলগা বোঝাই যায় না। ভেতরটা ফাঁপা।

কিশোরের কাজ দেখে অবাক হয়ে গেছে ব্রড।

মিটিমিটি হাসছেন সাইমন।

ভেতর থেকে কয়েকটা মুকুট, রাজদণ্ড আর দণ্ডের মাথার বল বের করে আনল কিশোর। গায়ে লাগানো লেবেলই বলে দিল ওগুলো মিরহ্যাম জনসনের জিনিস, জনসন কালেকশন।

'এখন বুঝলেন তো,' ব্রডের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'মিউজিয়াম থেকে চোরেরা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে কি করে জিনিসগুলো পাচার করেছে?'

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ব্রড বলল, 'গুঁড়ি বহনকারী লরি আটকাতে বলে একটা কাজের কাজ করেছ। জানলে কি করে?'

কিশোরের হয়ে সাইমন দিলেন জবাবটা, 'এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই তদন্ত করছে ওরা।'

আরও কয়েকটা গুঁড়ি ফাঁপা বেরোল। লরি এবং তাতে পাওয়া জিনিসগুলো কড়া প্রহরায় রেখে কিশোর আর সাইমনকে নিয়ে অফিস ঘরে ঢুকল ব্রড। লরির ড্রাইভার ও তার সঙ্গীকে দেখতে চাইল।

হাজতে ভরে রাখা হয়েছে দুজনকে।

ড্রাইভার তার নাম বলল হগ ব্লিংকার। গাট্টাগোট্টা, কর্কশ চেহারার লোক। তার সঙ্গীব নাম লয়েড। লম্বা, হালকা-পাতলা বেতের মত ছিপছিপে শরীর, গালে আর চোখের নিচে গভীর ভাঁজ। ওদের জিজ্ঞেস করা হলো, উকিল ডাকবে কিনা। দুজনেই মাথা নাড়ল।

হগ জানতে চাইল। 'আমাদেরকে হাজতে ভরে রাখা হয়েছে কেন? নকল লাইসেন্সের কথা কিছুই জানি না আমরা। লরি চালানোর জন্যে ভাড়া করা হয়েছে আমাদের।'

'তাই তো,' যোগ করল লয়েড। 'আমাদের কি দোষ? বলুন, কত জরিমানা দিতে হবে। দিয়েটিয়ে চলে যাই। আটকে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'দেখো, এত সহজ না তোমাদের ব্যাপারটা,' সাইমন বললেন, 'মোটর-

আইন লঙ্ঘনের চেয়েও বড় অপরাধের অভিযোগ ঝুলছে তোমাদের ঘাড়ে।'

'মানে? কি বলতে চান?' কড়া প্রতিবাদ জানাল হগ, 'আমরা আর কিছু করিনি!'

লয়েড বলল, 'আমার মাথায়ও তো কিছু ঢুকছে না! কি বলছেন? আমরা চোর নই। অন্য কিছুও নই। আমাদের কাজ গাছের গুঁড়ি বহন করা।'

'চোরাই জিনিস ভরা গুঁড়ি?' বাঁকা প্রশ্ন করল কিশোর।

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই আসামী।

'কি, বলেছিলাম না তোকে,' লয়েড বলল, 'গুঁড়িগুলোর মধ্যে ঘাপলা আছে? হলো তো এখন।'

'চুপ!' ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চাইল হগ।

কিন্তু লয়েড চুপ করল না। স্বর আরও চড়িয়ে দিয়ে বলল, 'না, চুপ করব না! বুঝতে পারছি, বিপদে পড়েছি। বিপদ আরও বাড়ার আগেই সব বলে দেব আমি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল হগ, 'যা ইচ্ছে করো। ভাল হবে কি খারাপ হবে জানি না।'

সাইমন বললেন, 'বলো, ভালই হবে। আমাদের যদি সাহায্য করো, সেটা তোমাদের পক্ষে যাবে।'

'বেশ,' বলতে আরম্ভ করল লয়েড, 'বছরখানেক আগে আমি আর হগ মিলে মাল পরিবহনের ব্যবসা শুরু করি। টাকা ছিল না আমাদের, কোনমতে একটা ট্রেলার-লরি কিনে নিই।'

লয়েড জানাল, ইদানীং টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছে। লরির লাইসেন্স ফি আর বীমার টাকাও জোগাড় করতে পারছে না, এতই খারাপ অবস্থা।

'গতকাল বিকেলে অচেনা এক লোকের কাছ থেকে ফোন পেলাম,' লয়েড বলছে, 'জিজ্ঞেস করল, কিছু গাছের গুঁড়ি বন্দরে দিয়ে আসতে পারব কিনা। এত বেশি টাকা দেবে বলল যে তাজ্জব হয়ে গেলাম।'

'সন্দেহ হয়নি আপনাদের?' জানতে চাইল কিশোর।

'টাকার কথা শুনে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, ভাবারই সময় পাইনি। অর্ধেক টাকা আমাদের আগাম দেবে বলল লোকটা। তখন মনে পড়ল আমার, বৈধ ভাবে লরিটা চালাতে পারব না। লাইসেন্স রিনিউ করানো হয়নি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম দু-এক দিন দেরি করতে পারবে কিনা, এর মধ্যে কাজটা সেরে নেব আমরা। সে বলল, সময় দিতে পারবে না। বলল, এত ভাবার কিছু নেই, লাইসেন্স প্লেট বদলে দেবে সে। তাতে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে না।'

'শুরু থেকেই ব্যাপারটা আমার পছন্দ ছিল না,' লয়েড থামতেই হগ বলল। 'কিন্তু লোকটা এমন চাপাচাপি শুরু করল···বলল, রাতেই কাজটা সারতে হবে, নইলে মালগুলো নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে দেবে।'

'কোনখানে নিয়ে যাওয়ার কথা ওগুলো, জানো?' জিজ্ঞেস করল

কিশোর।

'না,' মাথা নাড়ল লয়েড। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওরা বলল মাল নিয়ে রওনা হলেই একটা ভ্যান এসে দেখা করবে আমাদের সঙ্গে। লাইসেন্স প্লেট বদলে দেবে। কি ভাবে যেতে হবে, নির্দেশ দেবে।

'কথামত কাজ করলাম। ভ্যানের একটা লোক বলল, কাজ সারতে এক ঘণ্টা দেরি হবে ওদের। আমাদের কোনখান থেকে ঘুরে আসতে বলল। আমার সন্দেহ হলো। কিছুদূর গিয়ে চুপি চুপি ফিরে এসে দেখতে লাগলাম ওরা কি করে। দেখলাম, গুঁড়িগুলোর মধ্যে কি যেন ভরছে। ওখানেই ওদেরকে মানা করে দিতে ইচ্ছে করছিল যে ওদের কাজ আমরা করব না।'

'করলে না কেন?' প্রশ্ন করলেন সাইমন। 'বেআইনী কাজ করছে ওরা বুঝলেই যখন, পুলিশকে ফোন করলেও পারতে।'

'ও তাই করতে চেয়েছিল,' হগ বলল, 'আমিই মানা করেছি। মোটেও ভাল মনে হচ্ছিল না লোকগুলোকে। গুণ্ডা-পাণ্ডা গোছের। আমরা করব না বললেও ওরা শুনবে না বুঝে গিয়েছিলাম, বরং মারধোর করবে। মেরেও ফেলতে পারে, কে জানে!'

'ব্যস, এর বেশি আর কিছু জানি না আমরা,' লয়েড বলল।

'লোকগুলোর চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

'না। অন্ধকার ছিল। ভালমত দেখিনি।'

একুশ

আসামীদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো।

সাইমনের দিকে তাকাল কিশোর। 'কি বুঝলেন, স্যার? বন্দরে নিয়ে যেতে চাইছিল। জলপথে কোথাও নিয়ে যেত। স্টর্মওয়েলেও হতে পারে। তারমানে লস অ্যাঞ্জেলস বন্দরে নিশ্চয় প্যারট গ্রুপের কোন একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে এখন।'

'কিংবা আসবে খুব শীঘ্রি,' সাইমন বললেন। 'আমাদের এখন প্রথম কাজ হবে লরি আটকের খবরটা গোপন রাখা। চোরগুলোকে সাবধান হতে দেয়া যাবে না...'

বাধা দিয়ে রবড বলল, 'তা বোধহয় আর পারলেন না।'

'মানে?'

'পত্রিকার একজন রিপোর্টার খোঁজ পেয়ে গেছে। রোজই থানায় এসে বসে থাকে খবরের জন্যে। আজও এসেছে। দুজন লোককে আসামী করে আনা হয়েছে শুনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। লরিটা দেখেছে, গুঁড়িগুলোও দেখেছে। নাছোড়বান্দা লোক। বাঁচতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

চিন্তায় পড়ে গেলেন সাইমন।

তখনই রকি বীচে ফিরে যেতে চাইল কিশোর। রবিন আর মুসার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। চোরগুলোকে ধরার একটা পরিকল্পনা করবে।

হগ আর লয়েডকে আটকে রাখার আর কোন মানে হয় না, সাইমন বললেন। ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। তবে এক শর্তে, মুখ বন্ধ রাখবে ওরা। গুঁড়িগুলোর কথা কাউকে কিছু বলতে পারবে না।

ওদের লরি ওদেরকে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। তবে গুঁড়িগুলো রেখে দেয়া হলো ফাঁড়িতে। ওগুলোতে মিউজিয়ামের চোরাই মাল আছে।

রকি বীচে ফিরে এল বটে, কিন্তু সেদিন আর কিছু করা সম্ভব হলো না। সময়মত মুসা বা রবিন কাউকেই পেল না কিশোর।

পরদিন সকালে নিউজ স্ট্যান্ডে গিয়ে লজ অ্যাঞ্জেলেস থেকে বেরোনো একটা পত্রিকায় গুঁড়ি উদ্ধারের খবরটা দেখতে পেল।

ছেপেই দিল তাহলে রিপোর্টার! দিল সর্বনাশ করে!—গজগজ করতে করতে পকেট থেকে পয়সা বের করে পত্রিকার দাম মিটিয়ে দিল কিশোর। পত্রিকাটা নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে।

ওঅর্কশপে রবিন এসে বসে আছে।

পত্রিকাটা তার সামনে টেবিলে আছড়ে ফেলল কিশোর। একটা টুলে বসল। আগের দিন যা যা ঘটেছে, সব বলল।

শুনে, পত্রিকার খবর পড়ে রবিন বলল, 'হুঁ, বুঝলাম। ব্ল্যাক প্যারট লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দরে থেকে থাকলে এই খবর দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালাবে।'

দুপুরের পর মিস্টার সাইমন ফোন করে জানালেন, বন্দরে খোঁজ নিয়েছেন তিনি। সকালে বন্দরে ভেড়ার কথা ছিল ব্ল্যাক প্যারটের, কিন্তু ভেড়েনি। আসেইনি।

ফোন রেখে দিয়ে রবিনকে বলল কিশোর, 'নিশ্চয় কেউ রেডিওতে জাহাজটাকে খবর দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, মাল ধরে ফেলেছে পুলিশ, এলে বিপদ হবে। মাঝসাগর থেকেই আরেক দিকে চলে গেছে জাহাজ।'

'তাহলে কি করা?' রবিনের প্রশ্ন।

'একটাই উপায় আছে এখন আমাদের।'

'কি?'

'টপের সঙ্গে যোগাযোগ করা।'

'যদি ইয়েলো প্যারটে এতদিন সে না থাকে?'

'তা বটে। কত কিছুই হতে পারে। জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, আমাদের যে পালাতে সাহায্য করেছে এ কথা জেনে ক্যাপ্টেন তাকে শাস্তি দিতে পারে...কিন্তু রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে দোষ কি? যদি পেয়ে যাই?'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, মুসা এসে হাজির হলো। কিশোর আর রবিনকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

সব বলা হলো তাকে।

'খাইছে,' বলে উঠল মুসা, 'তাহলে বসে আছি কেন? চলো এখুনি মিস্টার সাইমনের বাড়িতে চলে যাই।'

দেরি করার আসলেও কোন মানে হয় না। তখুনি রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

সাইমন বাড়িতেই আছেন। কি করতে চায় বলল তাঁকে কিশোর।

ওদেরকে স্টাডিতে নিয়ে গেলেন সাইমন। ওখানে আছে রেডিওটা।

ইয়েলো প্যারটের ফ্রিকোয়েন্সি জানা আছে কিশোরের। মেসেজ পাঠাতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর যখন হাল ছেড়ে দিতে চলেছে কিশোর, ঠিক এই সময় খুব দুর্বল ভাবে সিগন্যাল আসতে শুরু করল।

উত্তেজিত হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা।

চেয়ার থেকে উঠে সাইমনও এগিয়ে এলেন।

কথা বেশির ভাগই বোঝা গেল না। তবে যা গেল, তা-ই যথেষ্ট।

বিপদে পড়েছে টপ, সে-কথা বলল। তার অবস্থান জানাল।

থেমে গেল কথা।

আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করল কিশোর।

সাড়া নেই আর। কড়কড় খরখর করছে কেবল স্পীকার।

কিশোর বলল, 'অনেক দূরে আছে সে। ক্যামব্রিয়ানের কাছাকাছি।'

'আমাদের যন্ত্রের ক্ষমতা কম,' রবিন বলল। 'এ সব ক্ষেত্রে অনেক বেশি শক্তিশালী রেডিও দরকার।'

সাইমন বললেন, 'কোনমতে কাজ চালানো আরকি এটা দিয়ে। তবে ডাঙায় হলে আর কাছাকাছি থাকলে ভালই কাজ দেয়।'

'কি করব আমরা এখন?' মুসার প্রশ্ন। 'টপকে উদ্ধার করতে যাব?'

'যেতে তো হবেই,' কিশোর বলল। 'আমাদেরকে বাঁচিয়েছে সে। তার বিপদে আমাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। তা ছাড়া তাকে কথা দিয়ে এসেছি আমরা, বিপদে পড়লে যেন জানায়।'

'যাবে কি করে? প্লেনে?'

'এ ছাড়া আর উপায় কি?'

কিশোরের দিকে তাকালেন সাইমন, 'প্লেন কি আমাদেরটা নেব?'

'আরেকটা কথা ভাবছি আমি,' কিশোর বলল। 'টেরি নোলানের বিমানটা ব্যবহার করতে পারলে ভাল হত। ওটা উভচর। জলে-ডাঙায় সমানে নামতে পারে। দ্বীপের কাছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, ওই বিমানটাই দরকার। রানওয়ে না থাকলে পানিতেই নেমে পড়বে।'

'ওটা না পাওয়া গেলে?'

'আরও কোম্পানি আছে, তাদের কাছ থেকে ভাড়া করব। জলদি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।'

বাইশ

যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করেও পরদিন সকালের আগে রওনা হতে পারল না ওরা। প্লেনে করে আগে ক্যামব্রিয়ানে যাবে, সেখানে টেরি নোলানকে পেলে ভাল, না পেলে অন্য প্লেন ভাড়া করতে হবে।

'এত তাড়াতাড়ি আবার ক্যামব্রিয়ানে যেতে হবে আমাদের, ভাবিনি,' রবিন বলল।

'আমি কিন্তু ভেবেছি,' কিশোর বলল।

ফোন করে আগেই হোটেল ঠিক করে রেখেছেন সাইমন। ক্যামব্রিয়ানে এসে সেখানে উঠল ওরা। হাতমুখ ধুয়ে ঘরেই খাওয়া সারল। তারপর তিন গোয়েন্দা বেরোল টেরিকে খুঁজতে। মিস্টার সাইমন রয়ে গেলেন ঘরে।

এয়ারপোর্টের টারমিনাল বিল্ডিং থেকে উত্তরে এগোল ওরা। টামবিও থেকে আসার পর ওদিকেই তার উভচরটা পার্ক করেছিল, মনে আছে কিশোরের।

'ওই তো,' হাত তুলে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'সে আছে!'

তিন গোয়েন্দাকে দেখে অবাক হলো টেরি।

'এখানে কি করছ তোমরা?' চওড়া হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল টেরি। 'আমি তো ভাবলাম রকি বীচে চোর-ডাকাত ধরছ এখন।'

'তাই করছি,' হেসে বলল মুসা, 'তবে রকি বীচে নয়, ক্যামব্রিয়ানে।'

কিশোর বলল, 'আমরা আপনার বিমানটা ভাড়া করতে চাই। ঠিকঠাক আছে?'

'আছে। ক্র্যাংকে সামান্য গোলমাল হয়েছিল, বদলে নিয়েছি। কিন্তু ভাড়া করতে চাও কেন? কোথায় যাবে?'

টপের মেসেজের কথা তাকে বলল কিশোর।

একটা বুদ্ধি দিল টেরি, 'একটা কাজ কিন্তু করা যায়। প্লেনে করে আকাশে উঠলে সিগন্যাল ধরা সহজ হয়। তোমাদের বন্ধু বিপদে পড়ে থাকলে খানিক পর পরই সিগন্যাল পাঠাবে, যদি অবশ্য তাকে বন্দি করে ফেলা না হয়ে থাকে। উঠে দেখবে নাকি এখন?'

প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হলো কিশোরের। রাজি হয়ে গেল। রবিনকে পাঠাল হোটেলে মিস্টার সাইমনকে একটা ফোন করে আসতে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার বিমানে চাপল তিন গোয়েন্দা।

রানওয়ে ধরে ছুটল টেরির উভচর।

পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে বিমানের নাক মাটির সঙ্গে সমতল করল টেরি। রেডিও কম্পাস রিসিভার চালু করে দিয়ে ইয়েলো প্যারটের সিগন্যাল ধরার চেষ্টা শুরু করল।

'জাহাজটা বেশি দূরে হলে,' রবিন বলল, 'সিগন্যাল দুর্বল হবে।'

'সে তো জানা কথাই,' বলে আবার বিমানের নাক উঁচু করল টেরি। 'আরও ওপরে উঠে যাব, যাতে সিগন্যাল ধরা সহজ হয়।'

উঠেই চলল বিমান। সাত...আট...নয়...দশ হাজার ফুট ওঠার পর প্রাণের সাড়া দেখাল রেডিওর কাঁটা। কাঁপতে শুরু করল। মৃদু গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল স্পীকারে।

'মনে হয় কাজ হচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'ইয়েলো প্যারটের সিগন্যালই হবে!' কিশোর বলল।

যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে টেরি। 'কাঁটা নড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ দূরে আছে জাহাজটা। তবে কোনদিকে আছে এটা বের করা যাবে।'

'ঠিক কতটা দূরে আছে বলতে পারবেন?' জানতে চাইল রবিন।

'না। হিসেব-নিকেশ করে মোটামুটি একটা দূরত্ব বলতে পারব।'

একটা কাগজে পেন্সিল দিয়ে হিসেব শুরু করল টেরি।

নিচে তাকিয়ে সাগর দেখছে মুসা। সে কিছু শুনতেও পাচ্ছে না, আলোচনায় অংশও নিতে পারছে না।

'আমার হিসেব মতে,' অবশেষে বলল টেরি, 'জাহাজটা এখন সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মাইল দূরে।'

শিস দিয়ে উঠল কিশোর, 'এতদূর যাওয়ার মত তেল নিশ্চয় নেই আপনার বিমানে?'

'না, নেই। তবে সাগরে সাগরে ঘুরতে হয় বলে একটা লং-রেঞ্জ ট্যাংক বসিয়ে নিয়েছি কেবিনে। ওটা ভরে নিলে বহুদূর যাওয়া যায়। একটা অসুবিধে হয়ে যায় তাতে, ওজন বেশি হয় বলে যাত্রী বেশি নিতে পারি না। তোমরা যে তিনজন উঠেছ, তেল এখন কম আছে বলে পেরেছ। ট্যাংক পুরোপুরি ভরলে বড়জোর দুজন উঠতে পারবে।'

'কিন্তু আমরা তো ভাবছিলাম আরও একজন তুলব,' সাইমনের কথা ভেবে বলল কিশোর।

'সম্ভব না।'

জাহাজটার দূরত্ব এবং দিক জানা হয়েছে। আপাতত আর কিছু করার নেই। টেরিকে এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে বলল কিশোর।

ফিরে এসে প্লেন পার্ক করে কিশোররা নেমে যাওয়ার আগে টেরি জিজ্ঞেস করল, 'কখন রওনা হতে চাও?'

'সম্ভব হলে কাল। তবে আশা করি বিপদটা বুঝতে পারছেন। ইয়েলো প্যারটের নাবিকেরা লোক খুব খারাপ। ধরা পড়লে...'

হাত নেড়ে টেরি বলল, 'আমাকে নিয়ে ভেবো না।'

হোটেলে ফিরে কি করে এসেছে সাইমনকে বলল কিশোর। আগামী দিন কে কে যাবে, সেটা নিয়ে হলো সমস্যা।

হেসে বললেন সাইমন, 'মাত্র দুজন, না? আমাকে যে ফেলে যাবে সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে বাদ পড়বে? মুসা?'

'কেন, আমি কেন?'

'কারণ তোমার ওজন বেশি,' বলে দিল রবিন।

'তোমার ওজনও একেবারে কম না, আগের চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে,' রাগ করে বলল মুসা। বাদ পড়তে রাজি না সে মোটেও। 'আমার চেয়ে বড়জোর কয়েক পাউন্ড কম হবে...'

সমাধান করে দিলেন সাইমন, 'ঝগড়া-ঝাঁটি করে লাভ নেই। এক কাজ করো, টস করো। কিশোরকে যেতেই হবে। টসটা তোমার আর রবিনের মধ্যে হোক।'

টসে হেরে মুখ গোমড়া করে ফেলল মুসা। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। চুপ হয়ে গেল সে।

তেইশ

পরদিন সকালে রওনা হলো কিশোর আর রবিন।

সাবধান করে দিলেন সাইমন, 'জাহাজটা দেখতে পেলে, টপের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো। তারপর ব্যবস্থা নেব আমরা।'

এয়ারপোর্টে এসে দেখল ট্যাংকে তেল ভরে তৈরি হয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে টেরি। দুই গোয়েন্দা উঠে বসতেই প্লেন ছেড়ে দিল।

সাগরের ওপর চলে আসতে বেশিক্ষণ লাগল না। দক্ষিণে উড়ে চলল বিমান।

রেডিও কম্পাস রিসিভার অন করে রেখেছে টেরি। কোনদিকে ঠিক কত ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করতে হবে, জানা আছে আজ। কিছুক্ষণ পরই সিগন্যাল আসতে আরম্ভ করল। তবে খুব দুর্বল। খরখর করতে লাগল স্পীকার। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে নাচানাচি করে শব্দের উৎস খুঁজে বের করল কম্পাসের কাঁটা।

টেরি বলল, 'যতই জাহাজের কাছাকাছি হব, আরও নিখুঁত ভাবে ধরতে পারবে সিগন্যাল।'

তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেল। জোরাল হয়েছে সিগন্যাল। কাঁটার দিকে তাকিয়ে আছে টেরি। হিসেব করে বলল, 'আর আশি মাইল যেতে হবে আমাদের।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল দুই গোয়েন্দা।

আধ ঘণ্টা পর সামনের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'ওই যে মেঘের মত দেখা যাচ্ছে, ওগুলো নিশ্চয় দ্বীপ?'

'হ্যাঁ,' টেরি বলল। 'রেডিও কম্পাসের কাঁটা ওদিকেই যেতে বলছে।'

এগিয়ে চলেছে বিমান। পাথরের অতি খুদে খুদে দ্বীপ যেন পিছলে সরে

যেতে আরম্ভ করল নিচ দিয়ে। সামনে একঝাঁক বড় দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।
'সিগন্যাল অনেক জোরাল হয়েছে,' টেরি বলল। 'জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছি।'
'যেতে থাকুন, থামবেন না,' কিশোর বলল। 'জাহাজ থেকে আমাদের দেখলে যাতে ভেবে না বসে ওটাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি আমরা।'
আচমকা ঘুরে গেল কম্পাসের কাঁটা। প্লেনের পেছন দিকে নির্দেশ করছে এখন।
'জাহাজটা এই মাত্র পেরিয়ে এলাম আমরা!' চেঁচিয়ে উঠল টেরি।
নিচে দ্বীপগুলোর ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। কোন জাহাজ চোখে পড়ল না। একটা অদ্ভুত আকৃতির দ্বীপ রয়েছে ঘন গাছপালায় ঢাকা। একটা খাল ঢুকে গেছে দ্বীপটাতে।
'ওখানেই ঢুকে বসে আছে ইয়েলো প্যারট,' রবিন বলল, 'আমি শিওর।'
'আমিও,' একমত হলো কিশোর। 'ওর ভেতরে দেখা দরকার।'
যেদিকে যাচ্ছিল, কয়েক মিনিট একটানা সেদিকে এগোল টেরি। তারপর সাগরের কয়েক ফুট ওপরে নামিয়ে আনল বিমান। নাক ঘুরিয়ে ফিরে চলল দ্বীপটার দিকে।
নিচে নামার ব্যাখ্যা দিল সে, 'বেশি নিচে থাকলে আমাদের দেখতে পাবে না। দ্বীপের মাইলখানেক দূরে পানিতে নেমে ট্যাক্সিইং করে এগিয়ে যাব।'
'ঠিক আছে,' বুদ্ধিটা পছন্দ হলো কিশোরের। ওরা যে দ্বীপটাতে যেতে চায় সেটা রয়েছে দ্বীপপুঞ্জগুলোর মাঝখানে। 'অন্ধকার হলে আপনার রবারের ভেলাটা নামিয়ে নিয়ে আমি আর রবিন দাঁড় বেয়ে ঢুকে যাব খাল দিয়ে।'
'ইস্, মুসা থাকলে এখন সুবিধে হত,' আফসোস করে বলল রবিন। 'এ সব কাজ ও ভাল পারে।'
'তা তো হতই। কি করব? বিমানটা তো টানতে পারল না।'
নিখুঁত ভাবে বিমান নামাল টেরি। সূর্য ডোবার অপেক্ষায় রইল ওরা।
সীটের পেছনের একটা ফোকর থেকে একটা পোঁটলা বের করল সে। 'কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।'
'খুব ভাল করেছেন,' হেসে বলল রবিন, 'আমিও মুসার মত রাক্ষস হয়ে গেছি। সাগরের নোনা হাওয়ায় খুব খিদে পায়।'
খেতে খেতে কথা বলল ওরা। অন্ধকার হয়ে গেল। রবারের ভেলাটা বের করে বাতাস ভরে ফোলাল টেরি। নামিয়ে দিল পানিতে।
তাতে নেমে গেল রবিন আর কিশোর।
পরের একটা ঘণ্টা দাঁড় বেয়ে চলল দুজনে। অচেনা পথ, দুই পাশে খানিক পর পরই দ্বীপ, কখনও এ পাশে কখনও ওপাশে, কখনও বা দুই পাশেই। নিচে কোন্খানে চোখা পাথর ভেলাটাকে চিরে দেয়ার জন্যে ঘাপটি মেরে আছে, অন্ধকারে বোঝা মুশকিল। তাই খুব সাবধানে আস্তে আস্তে

চালাতে হচ্ছে ওদের।

অবশেষে খালটা চোখে পড়ল। গাছপালার অন্ধকার পটভূমিকায় আবছা লম্বা একটা আলোর মত। কিছুটা ভেতরে ঢুকতে চোখে পড়ল জাহাজটাও।

'ইয়েলো প্যারট!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন।

'আস্তে! আরও কাছে যাব আমরা। তীরের কাছাকাছি থাকতে হবে, যাতে সহজে চোখে না পড়ি।'

জাহাজের একশো গজের মধ্যে চলে এল ওরা। দাঁড়ের গায়ে আঙুলগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসল কিশোরের। ডেকে আবছা কালো মূর্তিগুলোর নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে।

'কোন শব্দ করা চলবে না,' রবিনকে সাবধান করল সে, সেই সঙ্গে নিজেকেও।

'রেলিঙের কাছে ওরা কারা? পাহারা নাকি?'

'হবে হয়তো।'

ঘুপ করে একটা ধাক্কা লাগল ভেলার নিচে। পরক্ষণে পানিতে হিসহিস শব্দ। কিশোরের দাঁড়টা কামড়ে ধরল কিসে যেন, অল্পের জন্যে মারাত্মক দাঁতগুলো লাগল না তার আঙুলে। নিজের অজান্তেই চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'হাঙর! হাঙর!'

কথা শেষ হলো না তার। কয়েক ফুট এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এল হাঙরটা। পিঠের বিশাল পাখনাটা ভেলার তলায় ঠেকিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল উল্টে দেয়ার জন্যে।

কাত হয়ে গেল ভেলা। বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করল দুজনে। পারল না। গড়িয়ে পড়ে গেল কালো পানিতে।

নীরব থাকা আর কোনমতেই সম্ভব নয়। কিশোর জানে, বাঁচতে হলে এখন চিৎকার করতে হবে, লাথি মেরে, দাপাদাপি করে ভয় দেখিয়ে হাঙরটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

পানিতে পড়েই তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল রবিন।

তার পাশ দিয়ে চলে গেল হাঙরটা। যাওয়ার সময় লেজের ঝাপটা মারল। চাপড়টা রবিনের গায়ে লাগল। তার মনে হলো ওই এক আঘাতেই মরে যাবে। দম বন্ধ হয়ে এল।

এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে দুজনে, প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় অস্থির, জাহাজের ডেকে কি ঘটছে দেখার কথাও মনে রইল না।

ওদের চিৎকার নাবিকদের কানেও পৌঁছেছে। সতর্ক হয়ে গেল ওরা। সার্চ লাইটের উজ্জ্বল আলো চিরে দিল অন্ধকারের চাদর, পানিতে ভাসমান ভেলাটার ওপর এসে পড়ল।

চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কে জানি আসছে! হাঙরে ধরেছে ওকে!'

'রাইফেল আনো!' চিৎকার করে আদেশ দিল আরেকজন। এত বিপদের মধ্যেও কণ্ঠটা চিনতে পারল কিশোর, টপের গলা।

পানিতে দাপাদাপি করছে দুই গোয়েন্দা।

এগিয়ে আসছে হাঙর। পিঠের পাখনা পানি কাটছে হিসহিস শব্দে।

গর্জে উঠল রাইফেল। কিশোরের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বুলেট। খ্যাঁক করে গিয়ে বিঁধল হাঙরের পিঠে।

ফিরে তাকাল রবিন। দেখে, ঠিক কিশোরের পেছনেই রয়েছে হাঙরটা। তবে কামড়াতে আসছে না আর। নিজেই কাবু হয়ে গেছে। পেট উল্টে দিয়েছে। রক্তে লাল হচ্ছে পানি।

আরও তাড়াতাড়ি তীরে পৌঁছার তাগিদ অনুভব করল ওরা। কারণ রক্তের গন্ধে আরও হাঙর এসে হাজির হবে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে।

তীরের কাছ দিয়ে চলছিল বলে রক্ষা।

কোনমতে ক্লান্ত শরীর দুটো সৈকতের বালিতে টেনে তুলল ওরা। পরিশ্রমে যতটা না কাবু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে আতঙ্কে। মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজল।

কতগুলো পাথর দেখিয়ে কিশোর বলল, 'দৌড় দাও ওদিকে! লুকাতে হবে!'

কিন্তু দৌড় দেয়া আর হলো না। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো তামাটে চামড়ার একদল মানুষ। ঘিরে ফেলল দুজনকে।

পালানোর পথ নেই!

চব্বিশ

ওদেরকে হাঁটতে বাধ্য করল লোকগুলো। পোশাক-আশাক আর চেহারায় মনে হচ্ছে দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসী। সৈকত ধরে এগোল কিছুদূর, তারপর মোড় নিয়ে দ্বীপের ভেতরে নিয়ে চলল।

'কোথায় নিচ্ছেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

জবাব দিল না কেউ। বরং সর্দার গোছের লোকটা আঙুল নেড়ে ওদের এগোনোর ইশারা করল।

মাইলখানেক আসার পর ছোট পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রাম চোখে পড়ল। পাথরের ছোট ছোট বাক্স আকৃতির বাড়িগুলো নারকেল গাছে ঘেরা। বাড়িগুলোর মাঝখানের বিশাল বাড়িটা আশপাশেরগুলোর তুলনায় রাজকীয় চেহারার। সেদিকে গোয়েন্দাদের নিয়ে চলল লোকগুলো।

'দেখো কাণ্ড!' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রবিন।

কাঠের ভারী দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে দুজন গার্ড। মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের মত মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম, বুকে আঁকা বিকৃত দাঁড়া।

কিশোর আর রবিনকে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এল ওরা।

ভেতরটা চমৎকার। দেয়ালগুলো খাড়া উঠে ওপরের দিকটায় বাঁকা হয়ে গেছে, একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে গোল গম্বুজের মত তৈরি করেছে। ছাত ধরে রেখেছে পাথরের মোটা মোটা থাম। ঝকঝকে পালিশ করা পাথরের মেঝে। গোয়েন্দাদের মনে হলো আধুনিক যুগ থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়েছে মধ্যযুগের কোন রাজদরবারে।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল রবিন।

'দেবতার উদ্দেশে বলি না দিলেই বাঁচি এখন!' কিশোর বলল।

একের পর এক আরও কয়েকটা দরজা ওদেরকে পার করিয়ে আনল শিরস্ত্রাণ পরা প্রহরীরা। একটা দেয়ালের ওপরের বাঁকা অংশে দেখা গেল সংক্ষেপে লেখা রয়েছে ETC.

'এম্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্রু!' কিশোর বলল। মনে পড়ল লস অ্যাঞ্জেলেসের বুকশপে দেখা দামী বইটার কথা। 'সংক্ষেপে ইটিসি লিখেছে।'

বিশাল এক ঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের, যেটাকে দেখতে রোমান রাজদরবারের মত লাগে। একধারে সিংহাসনে বসে আছে উঁচু কলারওয়ালা লাল আলখেল্লা পরা এক লোক। তার ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাকটা ঠেলে বেরিয়ে আছে কালো একজোড়া হিমশীতল চোখের মাঝখান থেকে। ডান পাশে দাঁড়ানো ইয়েলো প্যারটের ফার্স্ট মেট বমার।

এমন করে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছে বমার, যেন ভূত দেখছে। বলল, 'আমি ওদের চিনি, ক্যারটল! ওরা তিন গোয়েন্দার সদস্য!'

'তিন গোয়েন্দা?' চোখ পাকিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাল সিংহাসনে বসা লোকটা।

'হ্যাঁ। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি রকি বীচে খুব খ্যাতি ওদের। হলিউড আর লস অ্যাঞ্জেলেসের অনেকে চেনে। পুলিশ এদের খাতির করে। এমন কতগুলো জটিল কেসের সমাধান করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও যেগুলোর কিনারা করতে পারেনি। আমাদের জাহাজে কাজ করতে উঠেছিল। ওই সময় আমি জানতাম না ওদের পরিচয়। তারপর ব্ল্যাক প্যারটের ফার্স্ট মেটের কাছে জানলাম সব। গোল্ডেন এজ মিউজিয়াম থেকে বের করে নেয়া মাল সরানো যায়নি, এরা ধরে ফেলেছে।'

বসে পড়ল আবার লাল আলখেল্লাধারী। বরফ-শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ব্ল্যাক প্যারটের মেট কি করে জানল এরাই তোমার জাহাজে উঠেছিল?'

'ছেলেগুলো দেখতে কেমন, জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল। মেলাতে আর অসুবিধে হলো না আমার। টামবিওর কাছে জাহাজ থেকে নেমে পালিয়েছিল ওরা।'

'আজকাল খবর খুব তাড়াতাড়ি ছোটে!' রবিন বলল। 'গোল্ডেন এজের খবরও পেয়ে গেছেন!'

আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল বমার।

সেই একই রকম হিমশীতল গলায় আলখেল্লাধারী বলল, 'আমার নাম

ক্যারটল, এই দ্বীপের রাজা। আমি জানতে চাই, কেন তোমরা আমার রাজ্যে ঢুকলে?'

'সত্যি যে বলব তার নিশ্চয়তা কি?' কিশোর বলল। 'কি করে বুঝবেন?'

রবিন বলল, 'দ্বীপগুলো দেখতে খুব সুন্দর। দেখতে এসেছি। বেড়ানোর নেশা আছে আমাদের।'

জ্বলে উঠল বমার, 'আমার হাতে ছেড়ে দিন, কটকটে কথা বের করব আমি ওদের!'

'শান্ত হও,' ভারিক্কি চালে ক্যারটল বলল, 'ওদের ব্যবস্থা আমিই করব।' হাততালি দিল সে।

দুজন গার্ড ঢুকল।

বন্দিদের দেখিয়ে আদেশ দিল রাজা, 'পুবের টাওয়ারের ঘরে নিয়ে যাও।'

'ওরা কি ভাবে এসেছে, জানা দরকার,' বমার বলল। 'বলা যায় না, সঙ্গে আরও লোক এসে থাকতে পারে।'

'কি করে আর আসবে, জাহাজ কিংবা বিমানে। আর তো কোন পথ নেই। সকাল হলে তোমার লোকদের বোলো দ্বীপের চারপাশ ভাল করে খুঁজে দেখুক।'

দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল গার্ডেরা।

কিশোর ভাবছে, কোনমতে যদি টেরিকে সাবধান করে দেয়া যেত!

টাওয়ারে নিয়ে আসা হলো ওদের। ঘোরানো সিঁড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে। ঘরটা রয়েছে সিঁড়ির মাথায়। দরজার তালা খুলে বন্দিদের ঘরে ঢোকার আদেশ দিল একজন গার্ড। আরেকজন গিয়ে রুটি আর জগে করে পানি নিয়ে এল। তারপর আবার তালা দিয়ে চলে গেল।

ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এলে ওরা দেখল এককোণে একটা কাঠের টেবিলের সামনে বসে আছেন এক বৃদ্ধ।

'তোমরাও কি ক্যারটলের বন্দি?' বৃদ্ধ বললেন, 'আগে কখনও দেখিনি।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন, 'বন্দি। আপনি কে?'

'স্টিভ জেনসার।'

চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। স্টিভ জেনসার!

'টপ জেনসার কে হয় আপনার?'

'আমার ছেলে। তোমরা চেনো নাকি?'

'চিনি। এই তো কয়েক দিন আগেই দেখা হলো। আপনাকে বন্দি করা হয়েছে কেন?'

'ক্যারটলকে সাহায্য করতে রাজি হইনি বলে। আমাকে আটকানোর আরও একটা কারণ, আমার ক্ষতি হওয়ার ভয়ে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না আমার ছেলে।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে রবিন বলল, 'এই জন্যেই আমাদের কিছু বলতে চায়নি টপ।'

'এখানে কি হচ্ছে বলবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ক্যারটলই বা কে?'

স্টিভ বললেন, 'ক্যারটল হলো আঠারো শতকের এক কুখ্যাত জলদস্যুর বংশধর। এই দ্বীপে এক রাজ্য গড়ে তুলেছিল ডাকাতটা।'

'তার কথা আমরা জানি,' রবিন বলল, 'এম্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্রু নামে একটা বইয়ে পড়েছি।'

'ও, তবে তো অনেক কথাই জানো। বইতে যা আছে, সেটা বাদ দিয়েই তাহলে বলি।'

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন তাঁর কাহিনী, জাহাজ নিয়ে ক্যারিবিয়ানে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন বছরখানেক আগে। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন এই দ্বীপে। সঙ্গে ছিল টপ। বিখ্যাত একটা শিপিং কোম্পানিতে রেডিও-ম্যানের চাকরি করত। ছুটি নিয়েছিল তখন। বাপের জাহাজেও রেডিও-ম্যান হয়েছিল। দ্বীপের অদ্ভুত বাড়িঘর অবাক করেছিল ওদের। স্থানীয় অধিবাসীরাও খুব ভাল আর মিশুক।

জেনসাররা থাকতে থাকতেই দ্বীপে এসে হাজির হলো ক্যারটল। পূর্বপুরুষের রাজ্য দখল করে নিয়ে নিজেকে দ্বীপের রাজা ঘোষণা করল। আদিবাসীদের তার প্রজা হতে বাধ্য করল। নতুন করে উদ্বোধন করল এম্পায়ার অভ দা টুইস্টেড ক্রু-র।

'লোকটা পাগল,' স্টিভ বললেন, 'ওকে ঠেকানো দরকার!'

'প্যারট গ্রুপের জাহাজগুলোর কথা কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

রাগত কণ্ঠে স্টিভ বললেন, 'ওগুলোর মালিক ক্যারটল। চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করে। সন্ত্রাসীদের কাছে বোমা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, এ সব পাচার করে সে। আমার জাহাজটা দেখে খুব পছন্দ হয়ে যায় তার, অকাজ করার জন্যে ওটাও চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি বলেই আমার এই দুরবস্থা। জাহাজটাও আটকেছে, আমাকেও। বেআইনী পথে টাকা রোজগার করে তার এই তথাকথিত রাজ্যের খরচ চালায়।'

'মিরহ্যাম জনসনের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। জনসন কালেকশনগুলো তার কেন দরকার, বলতে পারেন?'

'ওটা তার আরেক পাগলামি। ওগুলোর মালিক ছিল প্রথম ক্যারটল। অবশ্যই লুটপাট করে জোগাড় করেছিল। পুরানো আমলের একটা গ্যালিয়ন জাহাজে করে ওগুলো দ্বীপে আনার সময় ঝড়ে পড়ে দ্বীপের কিনারে এসে জাহাজটা ডুবে যায়। পরে তুলে নেয়া হয়।'

'যেহেতু তার পূর্বপুরুষের জিনিস ছিল, বর্তমান ক্যারটল দাবি করছে ওগুলো তার সম্পত্তি?' রবিনের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। তবে তার দাবি অযৌক্তিক। আইনত সে ওগুলো পায় না। কিন্তু কে বোঝায় তার মত পাগলকে।'

কথা বলছে, একই সঙ্গে এখান থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যায় সে-ভাবনাও চলছে কিশোরের মাথায়। স্টিভকে বলল সেটা।

'সম্ভব না,' তাকে নিরাশ করতে চাইলেন স্টিভ, 'অনেক বেশি লোক পাহারা দেয় এই প্রাসাদ।'

ঘরের একমাত্র জানালাটার দিকে তাকাল রবিন। ছোট জানালাটায় মোটা শিক লাগানো। 'ওদিক দিয়ে বেরোনো যায় না?'

হাসলেন স্টিভ। 'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। পেন্সিলের সমান একটা লোহার চোখা টুকরো দিয়ে শিকের গোড়ার পাথর খুঁচিয়ে খুঁড়ে ফেলেছিলাম। তারপর শিক দুটো সরিয়ে যখন মাথা বের করলাম, দেখলাম পালানো অসম্ভব। এমন কিছু নেই যা বেয়ে চল্লিশ ফুট নিচে নামতে পারব।'

শিকের গোড়া দুটো দেখল কিশোর আর রবিন। বেরোতে না পেরে আবার ধুলো আর পাথরের গুঁড়ো দিয়ে গর্ত দুটো বুজিয়ে দিয়েছেন স্টিভ, যাতে প্রহরীদের চোখে না পড়ে।

নিচের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'অনেক নিচে মাটি। পড়লে আস্ত থাকব না।'

'এক কাজ করতে পারি,' কিশোর বলল, 'আমাদের জ্যাকেট, শার্ট আর বেল্ট খুলে নিয়ে গিঁট দিয়ে দিয়ে লম্বা করতে পারি। মাটি পর্যন্ত পৌঁছাবে না, তবে অনেকখানি নেমে যেতে পারব। তারপর হয়তো লাফিয়ে পড়া সম্ভব।'

'একটা কম্বল আছে আমার,' স্টিভ বললেন, 'সেটাও নিতে পারো।'

'বাহ্, তাহলে তো হয়েই গেল।'

দ্রুত কাজে লেগে গেল ছেলেরা। একটার কোণায় আরেকটা বাঁধার পর প্রায় পঁচিশ ফুট লম্বা একটা বিচিত্র দড়ি তৈরি হলো।

'পনেরো ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে আমাদের,' রবিন বলল।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ভোর হতে আর দুই ঘণ্টা বাকি। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

দুটো শিকের ফাঁক দিয়ে বেরোতে পারবে না। চোখা জিনিসটা দিয়ে আরও একটা শিকের গোড়া খোঁচাতে লাগল ওরা। সাংঘাতিক শক্ত পাথর। একটার গোড়া খুঁড়ে বের করতেই অনেক সময় লেগে গেল। তিনজনে মিলে শিক তিনটেকে টেনেটুনে বাঁকা করে ওপরে তুলে দিল। জায়গা হয়ে গেল বেরোনোর।

স্টিভ বললেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই!' গলা কাঁপছে তাঁর। 'পারব কিনা জানি না!'

'পারতে হবে। আপনাকে ফেলে রেখে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না,' কিশোর বলল। 'পারবেন। আমি আর রবিন আগে নামব। তারপর আপনি। লাফ দিয়ে পড়বেন, নিচে থেকে আপনাকে ধরার চেষ্টা করব আমরা। তাতে ঝাঁকুনি কম লাগবে আপনার, ব্যথা কম পাবেন।'

দড়ি বেয়ে নেমে আসতে বিশেষ অসুবিধে হলো না কিশোর আর রবিনের। নিরাপদেই মাটিতে লাফিয়ে নামল। ওপর দিকে তাকিয়ে রইল

স্টিভের নামার অপেক্ষায়।

জানালা গলে বেরোলেন বৃদ্ধ। দড়ি ধরলেন। নামতে শুরু করলেন ধীরে ধীরে। কিন্তু অর্ধেক নেমেই থেমে গেলেন। ভয় পেয়েছেন।

'থামবেন না!' নিচ থেকে বলল কিশোর। 'এখন থামলে মরবেন!'

আবার নামতে শুরু করলেন স্টিভ।

রবিনের মনে হতে লাগল, যুগ যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর নামা আর ফুরায় না।

তবে অবশেষে হাড়গোড় না ভেঙে নিরাপদেই নামলেন স্টিভ।

'এবার কি?' জানতে চাইল রবিন।

'ইয়েলো প্যারটে যাব,' কিশোর বলল। 'কোনমতে একটা ভেলা বা নৌকা জোগাড় করতে হবে। টপকেও হুঁশিয়ার করব।'

আদিবাসীদের চোখে পড়ার ভয়ে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, ছুটে চলল সৈকতের দিকে। ভোর হতে আরম্ভ করেছে।

জাহাজের কাছে পৌঁছে যা দেখল কিশোর, তাতে দমে গেল একেবারে। দুরুদুরু করতে লাগল বুক।

ইয়েলো প্যারটের নোঙরের সঙ্গে বাঁধা টেরির উভচর বিমান। পালানোর শেষ আশাটুকুও শেষ।

পঁচিশ

মানুষের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে।

'দেখুন,' বমারের গলা, 'এই কাজটা করা উচিত হবে না একেবারেই। সারতে পারবেন না ওভাবে। অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।'

'পারব!' বলল আরেকটা কণ্ঠ। 'পারতে হবে!'

'ক্যারটল!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'দেখুন, জনসন কালেকশনের বেশির ভাগই এখন আপনার দখলে,' বমার বলল, 'আর লোভ না-ই বা করলেন। বাকিগুলোর আশা ছাড়ুন। আপনার দলের অনেকেই অ্যারেস্ট হয়েছে। বাকি যারা আছে, তারাও বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। অহেতুক আর ঝুঁকি নিতে যাবেন না। আপনি তো মরবেনই, সবাইকে মারবেন।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, সী-শোর মিউজিয়ামের জিনিসগুলোর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে আমার। ওখানকার বর্মটা ক্যারটল নিজে পরতেন। ওটা আমার লাগবেই।'

'তারমানে ওখানকার জিনিস আপনি চুরি না করে ছাড়বেন না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল বমার।

'না। শুধু তাই নয়, তুমি আর তোমার কয়েকজন নাবিক সাহায্যও করবে আমাকে। পুরানোদের দিয়ে এ কাজটা করানো উচিত হবে না, ওদের ওপর পুলিশের নজর থাকা অসম্ভব নয়, কিছু করতে গেলেই ধরা পড়বে এখন। কপাল ভাল বলতে হবে আমাদের, না চাইতে একটা প্লেনও পাওয়া গেল। ওটা নিয়ে চলে যাব আমরা।'

গোয়েন্দাদের পাশ কাটিয়ে গেল লোকগুলো। সৈকতের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ওখান থেকেও ওদের কথা শোনা যাচ্ছে।

'কিন্তু এ ধরনের কাজ আর করিনি আমি,' বমার বলল।

'করনি, এখন করবে,' ক্যারটল বলল। 'সবাই তাই করে। প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। ভেব না, লোকগুলো অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ায় সুবিধে হয়েছে আরও। মিউজিয়ামের সতর্কতা কমে যাবে। ঝামেলা কম হবে আমাদের।'

ইয়েলো প্যারটের ডেকে দাঁড়ানো একজন নাবিককে ডেকে ডিঙি নামাতে বলল বমার।

নৌকা নামিয়ে দাঁড় বেয়ে নিয়ে আসতে লাগল মাল্লারা।

তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছে গোয়েন্দারা। হঠাৎ ডেকে এসে হাজির হলো টেরি। সঙ্গে দুজন নাবিক। পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে আরেকটা নৌকায় নামতে বলা হলো, বোঝা যাচ্ছে। বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল কিশোর আর রবিনের।

নৌকায় করে টেরিকে নিয়ে যাওয়া হলো তার বিমানে।

'নিশ্চয় অতিরিক্ত ট্যাংকটা খুলে ফেলা হবে,' রবিন বলল, 'নইলে জায়গা হবে না ক্যারটলের দলের। মূল ট্যাংকটা শুধু ভরে নিয়ে এখান থেকে ক্যামব্রিয়ানে চলে যাবে, সেখানে আবার ট্যাংকে তেল ভরে নিতে পারবে। যেখানে যাবার যাবে। তারপর থেকে প্রয়োজন হলেই রাস্তায় তেল ভরে নিতে পারবে।'

'কিংবা ক্যামব্রিয়ান থেকেই টেরিকে ছেড়ে দিয়ে পালাবে ক্যারটল,' রবিন বলল।

'আমার মনে হয় না,' এতক্ষণে কথা বললেন স্টিভ। 'ক্যারটলকে চেনো না। সে অনেক কিছুই করতে পারে। শেয়ালের মত চতুর। টেরিকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে বাধ্য করলেও অবাক হব না।'

টেরিকে জাহাজ থেকে নামিয়েছে যে দুজন লোক, তারা, বমার এবং ক্যারটল বিমানে ওঠার দু-ঘণ্টা পর চলতে আরম্ভ করল বিমান। বাড়তি ট্যাংক খুলে ফেলতে এত সময় লেগেছে। ট্যাক্সিইং করে বেশি পানির দিকে এগিয়ে চলল। গতি বাড়তে শুরু করল। আকাশে উড়ল। হারিয়ে গেল উত্তর দিকে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। টেরি আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। আর যদি আসেও সঙ্গে থাকবে ক্যারটল; যোগাযোগ করব কি করে?'

'না পারলে আর কি করা,' তিক্ত কণ্ঠে রসিকতা করল রবিন, 'সন্ন্যাসী

হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব এ দ্বীপে।'

'তা-ও পারবে না, ক্যারটলের গোলাম হয়ে বাস করতে হবে।'

ওদের দিকে ফিরে তাকালেন স্টিভ, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। এতে কাজ হলেও হতে পারে।'

'কি বুদ্ধি?' জানতে চাইল কিশোর।

'অনেক আদিবাসী আমাকে পছন্দ করে, গাঁয়ের মোড়ল সহ। ক্যারটলের ভয়ে কেবল কিছু করতে পারে না ওরা। ওদের সাহস জোগাতে পারলে, ক্যারটলের ভয় ভেঙে দিতে পারলে বিদ্রোহ করে বসবে ওরা। সে এখন নেই। ওদের বোঝানোর এটাই সুযোগ।'

'পারবেন!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন।

'গিয়ে না আবার আটকা পড়ি,' কিশোর বলল।

'কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের,' স্টিভ বললেন। 'চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। আমি গাঁয়ে যাচ্ছি।'

'আমিও যাব।'

'না, আমার একা যাওয়াই ভাল। তোমরা জাহাজের ওপর নজর রাখো। আমার ছেলেকে দেখা যায় কিনা দেখো।'

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেলেন স্টিভ। হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেলেন নারকেল গাছের আড়ালে।

বসে রইল রবিন আর কিশোর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল, বাপ-ছেলে কারোরই দেখা নেই। অস্থির হয়ে উঠতে লাগল ওরা। জাহাজে সব শান্ত। গোলমালের কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক আগে গ্রামের দিক থেকে হই-চই শোনা গেল।

কান পেতে রইল দুজনে। কিন্তু বর্ম পরা দুই প্রহরীকে যখন ছুটে আসতে দেখল, আর বসে থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বোঝাই যায় তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে প্রহরীরা।

ওদের হাঁটু সই করে ডাইভ দিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন। পা বেধে ডিগবাজি খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল দুই প্রহরী। পাথরে মাথা ঠুকে বেহুঁশ হয়ে গেল।

ওদের পর পরই আরও দুজন প্রহরী বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। তাদের পেছনে তেড়ে আসছে কয়েকজন আদিবাসী।

পরের দুজন প্রহরীরও পথ আটকে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। জুজুৎসু আর কারাত, সমানে চালাল দুজনের ওপর। এসে গেল আদিবাসীরা। প্রহরীদের ধরে ফেলল।

'কাজ হয়েছে!' চিৎকার করে বললেন স্টিভ। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনিও। প্রহরীদের দেখিয়ে বললেন, 'এইবার বাগে পেয়েছি ব্যাটাদের!'

'অ্যাই কিশোর, দেখো!' জাহাজের দিকে হাত তুলে বলল রবিন।

চলতে আরম্ভ করেছে ইয়েলো প্যারট।

'আমার ছেলে যে রয়ে গেল ওতে!' ককিয়ে উঠলেন স্টিভ।

গোয়েন্দাদের অবাক করে দিয়ে মিনিটখানেক পরেই একটা উভচর বিমান দেখা গেল আকাশে। টেরিরটা নয়, তার চেয়ে বড়। গর্জন করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। নামল গিয়ে পানিতে। ফিরে এল ট্যাক্সিইং করে।

সৈকতের কাছাকাছি আসতে খুলে গেল দরজা। মাথা বের করে দিল মুসা, 'এই যে দোস্তরা, আছ কেমন?' দাঁত বের করে হাসল সে।

'তুমি!' অবাক হয়ে রবিন বলল।

'কেন, টেরিরটা বাদে আর প্লেন নেই নাকি দুনিয়ায়।'

রবারের ভেলা নামানো হলো। তাতে চড়ে তীরে এল মুসা আর সাইমন।

'তোমাদের দেখে কি যে খুশি লাগছে বোঝাতে পারব না!' মুসার হাত চেপে ধরে বলল রবিন। 'কিন্তু জানলে কি করে আমরা বিপদে পড়েছি?'

জবাবটা দিলেন সাইমন, 'তোমরা যাওয়ার পর অস্থির হয়ে পড়েছিল ও। হোটেলে থাকতে ভাল লাগছিল না। তোমরা ফেরো কিনা দেখার জন্যে চলে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। টেরির প্লেনটা নামতেই ছুটে গেল। কিন্তু টেরিও নামল না, তোমরাও না। প্লেনের মধ্যে বমারকে দেখল বলে মনে হলো তার। প্লেনটা আবার ওড়ার জন্যে তৈরি হতে দেখেই বুঝে ফেলল, গোলমাল একটা হয়েছে। বিপদে পড়েছ তোমরা। হোটেলে ছুটে এসে খবর দিল আমাকে। এয়ার-সী রেসকিউর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের একটা প্লেন দিতে অনুরোধ করলাম তোমাদের খুঁজে বের করার জন্যে।'

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে মুসাকে বলল রবিন, 'টসে তুমি হেরে যাওয়ায় ভালই হয়েছে। বাঁচলাম আমরা।'

আদিবাসীরা ঘিরে রেখেছে বন্দি প্রহরীদের। সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে বেশ একটা গোলযোগ বাধিয়ে বসেছ এখানে। কারা ওরা? কি পরেছে দেখো! পোশাকের কি ছিরি!'

আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বলল কিশোর আর রবিন। স্টিভ জেনসারের পরিচয় করিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললেন সাইমন, 'শেষ রক্ষা তাহলে আপনিই করলেন।'

সাইমনের হাতটা ধরে স্টিভ বললেন, 'কিন্তু আমার ছেলে যে এখনও জাহাজে রয়ে গেল! তাকে বাঁচাই কি ভাবে?'

'ভাববেন না। কোস্ট গার্ডকে জানিয়ে দিচ্ছি। যে বন্দরেই ভিড়ুক না কেন জাহাজটা, আটক করা হবে। আপনার ছেলেকে উদ্ধার করবে পুলিশ।'

দ্রুত ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ক্যারটলের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও বাকি। কয়েক ঘণ্টা আগে গেছে সে। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

ক্যামব্রিয়ানে ফেরার পথে স্টিভকেও বিমানে তুলে নেয়া হলো। মিস্টার সাইমনের নির্দেশে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিওর সাহায্যে মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে

যোগাযোগ করল পাইলট। মেসেজ দিল যাতে সী-শোর মিউজিয়ামের ডাকাতিটা রোধ করা যায়। ডাকাতদের চেহারার বর্ণনাও দেয়া হলো।

ছাব্বিশ

এয়ারপোর্টে নেমে স্টিভকে গুড-বাই জানিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এল গোয়েন্দারা। মালপত্র গুছিয়ে দৌড় দিল আবার দূরপাল্লার বিমান ধরার জন্যে। লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে যেতে হবে। ভাগ্যক্রমে যাত্রীবাহী শেষ বিমানটা পেয়ে গেল।

'এত অল্প সময়ে এত ওড়াওড়ি,' মুসা বলল, 'বাপরে বাপ!'

আধুনিক বিমানের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি ওদেরকে লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছে দিল যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি। এয়ারপোর্টে নেমেই পুলিশের একটা পেট্রল কার পেয়ে গেল ওরা, ওদেরকে নেয়ার জন্যেই এসে দাঁড়িয়ে আছে।

'গোল্ডেন এজে হানা দিয়েছিল ওরা,' পুলিশ অফিসার জানাল। 'একজনকে বাদে বাকি সব কটাকেই ধরেছি।'

'পালিয়েছে কোনটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না। মিস্টার কার্পেন্টার বলতে পারবেন। এ কেসের দায়িত্ব তাঁকেই দেয়া হয়েছে। যে ডাকাতগুলোকে ধরেছি, সব কাঁচা হাত। মনে হয় এ ধরনের কাজ আর করেনি। দরজা ভেঙে মিউজিয়ামে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।'

'টেরি নোলান নামে একজন পাইলটকে জোর করে ধরে এনেছিল ওরা,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'তার খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'গেছে। একটা লেকের মধ্যে তাকে প্লেন নামাতে বাধ্য করে ডাকাতেরা। লেকের মধ্যে ভেসে থাকা প্লেনটা চোখে পড়ে একটা পেট্রল কারের। ডিউটি অফিসারের সন্দেহ হয়। প্লেনে ঢুকে দেখে হাত-পা বেঁধে ফেলে যাওয়া হয়েছে পাইলটকে।'

মিউজিয়ামে এসে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। একটা ভ্যানের ভেতর দেখা গেল হাতকড়া লাগানো বমার আর তার তিন নাবিককে। ক্যারটল নেই।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বস্ কোথায়?'

'জানি না,' দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠল বমার। 'আমাকে কোন প্রশ্ন করে লাভ হবে না। জবাব দেব না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। আনমনে বলল, 'কিন্তু বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না ক্যারটল।' বড় কার্পেন্টারকে জিজ্ঞেস করল, 'ভেতরে যাওয়া যাবে?'

'যাও। কিছু পাবে বলে মনে হয় না।'

এগিয়ে গেল কিশোর। সঙ্গী হলো মুসা আর রবিন। জনসন কালেকশনগুলো যেখানে সাজানো রয়েছে, সেখানে চলে এল।

ঘরটা অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালল কিশোর। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল তিনজনে। ঘরের প্রতিটি জিনিস ঠিক আছে। একধারে পাথরের বেদির ওপর দাঁড় করানো আছে একটা আপাদমস্তক বর্ম পরা মূর্তি বুকে শয়তানের থাবা খোদাই করা।

ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বেড়ে গেল নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা। অন্য দিকে ঘুরছে মুসা আর রবিন। হাত তুলে ওদেরকে ইশারায় কাছে আসতে ডাকল সে।

কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

নীরবে বর্মটা দেখাল কিশোর। ইঙ্গিতে বোঝাল, গণ্ডগোল আছে ওটাতে।

বুঝে ফেলল মুসা। রবিনও বুঝল। তিনজনে একসঙ্গে গিয়ে জাপটে ধরল মূর্তিটাকে। সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠল মূর্তি। ঝাড়া মেরে সরিয়ে দিতে চাইল ওদেরকে।

চেঁচামেচি শুনে ঘরে ঢুকল ব্রড, সঙ্গে আরেকজন পুলিশ অফিসার।

কিশোর বলল, 'মিস্টার কার্পেন্টার, নিন, ক্যারটলকে অ্যারেস্ট করুন।'

মিস্টার সাইমন আর আরও কয়েকজন পুলিশ ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইতিমধ্যে।

রাগে আহত চিতাবাঘের মত ফুঁসতে লাগল ক্যারটল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'ইস্, কেন যে সেদিন নিকারসন মিউজিয়ামেই তোমাকে শেষ করে দিল না ফেরেট! তাহলে আজ আর এই অবস্থা হত না আমাদের!'

'চেষ্টা কম করেনি,' হেসে বলল কিশোর। 'পাথরের মূর্তি ফেলে ভর্তা করতে চেয়েছে আমাকে। পিছু নিয়ে খুন করতে চেয়েছে। মিস্টার সাইমনকে ঠেকাতেও কম চেষ্টা করেনি তার বহাল করা গুপ্তচরেরা। মিস্টার সাইমনের বাড়ির ওপর পর্যন্ত নজর রাখার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু লাভ কিছু করতে পারেনি।'

ব্রড বলল, 'তাহলে স্বীকার করছ, ক্যারটল, তোমার দলের লোকই সেদিন কিশোরের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল? বেশ, আরেকটা অভিযোগ যুক্ত হলো তোমার অন্যান্য কুকর্মের সঙ্গে।'

বন্দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অফিসার।

একজন পুলিশম্যান এগিয়ে গেল ব্রডের দিকে। বাক্সের মত একটা যন্ত্র দেখিয়ে বলল, 'স্যার, এক চোরের পকেটে পেয়েছি এটা। সবার পকেটেই এ জিনিস আছে একটা করে।'

দেখতে লাগল ব্রড। জিনিসটা কি বুঝতে পারল না।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। হাত বাড়াল, 'দেখতে পারি?'

তার হাতে দিল ব্রড।

কয়েক সেকেন্ড দেখেই চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল কিশোরের। নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ, বুঝলাম, মিউজিয়ামের ফটো ইলেকট্রিক সেলকে কি করে ফাঁকি দিয়েছে চোরেরা!'

মুসা আর রবিনও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবে?'

'নিশ্চয় জানো একটা ফটো ইলেকট্রিক সেলের দিকে একটা করে আলোক রশ্মি পাঠিয়ে অপারেট করা হয় অ্যালার্ম সিসটেম,' কলেজে প্রফেসরের লেকচার দেয়ার ঢঙে বলতে লাগল কিশোর, 'সেলের উৎস ঘরের যে দিক থাকে, আলোর উৎস থাকে তার উল্টো দিকে। এর মাঝখান দিয়ে কেউ গেলেই বাধা পায় আলোক রশ্মি, সেলের কাছে আর পৌঁছতে পারে না, সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করে সেল, বেজে ওঠে অ্যালার্ম।'

বুঝে ফেলল রবিন। মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝেছি। এই যন্ত্রটাও আলোক রশ্মি উৎপন্ন করে। লেন্সের মত জিনিসটা সেলের দিকে করে সুইচ টিপলে আলোক রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে সেলের ওপর পড়তে থাকে। আগের রশ্মিটা যে বাধা পেয়েছে বুঝতে পারে না সেল, সিগন্যাল পাঠায় না, অ্যালার্মও বাজে না। যন্ত্রটা সেলের দিকে তুলে তারপর ঢুকত চোর, তাই অ্যালার্ম বাজত না।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'দুর্দান্ত জিনিস!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'নিশ্চয় ক্যারটলের দলে ইলেকট্রনিকের ওস্তাদ আছে কেউ। সে-ই এই আবিষ্কারটা করেছে। লোকটা ধরা পড়লেই সব জানা যাবে। মিউজিয়ামের ডাকাতি করার আসল সমস্যা ছিল অ্যালার্ম আটকানো। সেটার সমাধান হয়ে যেতেই বিভিন্ন মিউজিয়ামে ছোটখাট চাকরি নিল চোরেরা। ভেতর থেকে নানা রকম স্যাবটাজ করতে থাকল চুরি করার সুবিধের জন্যে। গ্যাস মাস্ক ফুটো করল, যাতে প্রহরীরা পরে থাকলেও বিষাক্ত গ্যাসের কবল থেকে রেহাই না পায়।'

'যেমন ফেরেট,' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'নিকারসন মিউজিয়ামে মালীর চাকরি নিয়েছিল যে।'

'হ্যাঁ। আরও নানা রকম চালাকি ওরা করেছে, যাতে কখনও গার্ডরা ইচ্ছে করে ওদের ঢুকতে দিয়েছে, কখনও বা বাধ্য হয়েছে দিতে।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো,' মুসা বলল, 'ইয়েলো প্যারটের গায়ে ওই গর্ত কি করে হলো? এর সঙ্গে কি মিউজিয়ামে ডাকাতির কোন সম্পর্ক আছে?'

হেসে বললেন সাইমন, 'এ প্রশ্নের জবাব কিশোর দিতে পারবে না, আমি পারব। একরাতে চোরাচালানীর মাল নিয়ে পালানোর সময় সেন্ট্রাল আমেরিকান পেট্রল বোটের নজরে পড়ে যায় জাহাজটা। থামার নির্দেশ দেয় বোট থেকে। থামেনি। কামান দাগতে বাধ্য হয় বোটটা।'

অস্ফুট শব্দ করে উঠল মুসা। চমকে দিল সবাইকে।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন সাইমন, 'হঠাৎ কি হলো তোমার? শরীর খারাপ

লাগছে?'

'না, পেট খারাপ,' দু-হাতে পেট চেপে ধরল মুসা। 'সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতেই শয়তানি আরম্ভ করেছে এটা। কাল থেকে যে কিছু গিলতে পারেনি মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

হেসে ফেললেন সাইমন, 'তাই তো, মহাঅন্যায়! চলো চলো, বেরোই। কিন্তু কি গেলানো যায় এটাকে, বলো তো?'

দুই হাতের দশ আঙুল দেখাল মুসা, 'অন্তত বাইশ রকমের খাবার।'

ফোড়ন কাটল রবিন, 'দেখালে তো দশ আঙুল?'

'তোমার চোখ খারাপ। আসলে বাইশ আঙুলই দেখিয়েছি আমি।'

****
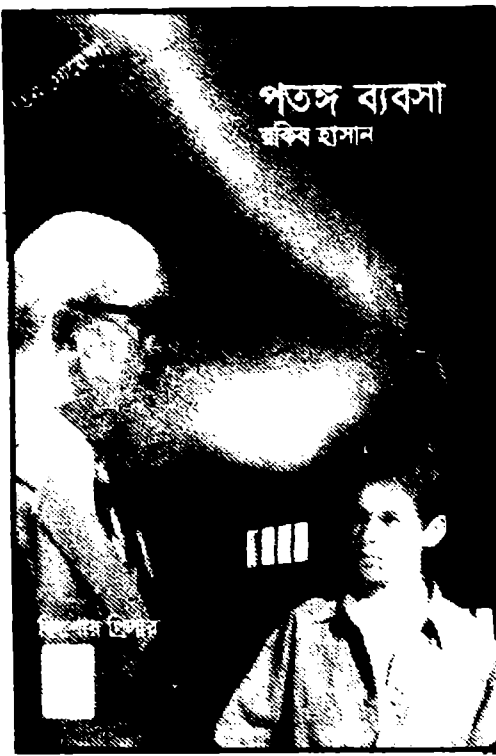
পতঙ্গ ব্যবসা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

'আংকেল যে এতটা নাম করে ফেলবেন, কল্পনাই করতে পারিনি!' পেছনে টিনের বেড়ার গায়ে হেলান দিল মুসা।

'আমি জানতাম,' কিশোর বলল, 'করবে।'

'আমিও,' তার কথার প্রতিধ্বনি করল রবিন। 'না করার কোন কারণ নেই। যে লোক সেই কিশোর বয়েসে বাড়ি থকে পালিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, পেটের ধান্দা আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সার্কাসের দড়াবাজিকর থেকে শুরু করে জাহাজের খালাসী আর খনির শ্রমিক হয়েছেন, শেষমেষ আমেরিকায় বসে পুরানো মালের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সামান্য গোয়েন্দাগিরিতে নাম-করা তো পানির মত সহজ।'

'গোয়েন্দাগিরিকে সামান্য মনে করার কোন কারণ নেই, যথেষ্ট কঠিন এবং জটিল কাজ,' প্রতিবাদ করল কিশোর। 'তবে চাচা যে এ কাজেও উন্নতি করবে এ আমি জানতাম। তা ছাড়া কাজটা একেবারে নতুন তো নয় তার কাছে। এক জাহাজে বেশ কিছুদিন গোয়েন্দাগিরির কাজ করেছিল। তারপর যখন ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ে গেল, চাকরি পার্মানেন্ট হওয়াটা নিশ্চিত হলো, তখন সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে জাহাজ থেকে পালাল...'

বাধা দিল মুসা, 'জানি এ গল্প, হাজারবার শুনেছি...'

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল রবিন, 'তাহলে এমন একজন অসাধারণ মানুষকে নিয়ে তোমার সন্দেহ কেন?'

'আরে না, সন্দেহ না...ইয়ে...আমি বলতে চেয়েছি... মানে...'

'মানে, একটা কিছু বলা দরকার, বলে ফেলেছ বোকার মত,' হাসল রবিন। উপদেশ দেয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়ে ছাড়ল না, 'কথা হলো তীর, একবার ধনুক থেকে ছুটে গেলে আর ফেরানো যায় না...'

কথা হচ্ছে কিশোরের চাচা রাশেদ পাশাকে নিয়ে। নতুন এক ব্যবসা খুলেছেন তিনি। এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়, কারণ নতুন নতুন ব্যবসা শুরু করা তাঁর একটা নেশা, তাও এমন কিছু যাতে লাভ বেশি কিন্তু সাধারণত করতে চায় না লোকে—এই যেমন, কয়েক বছর আগে বুনো জানোয়ার ধরে এনে বিক্রি করার ব্যবসা ফেঁদেছিলেন; সেটা এখনও আছে, তবে ওদিকে বিশেষ নজর দেন না বলে ততটা চাকচিক্য নেই। এবার খুলেছেন একটা গোয়েন্দা সংস্থা। নাম দিয়েছেন পাশা ডিটেকটিভ এজেন্সি। এই সংস্থার প্রধান তিনি নিজে। পুরানো মালের ব্যবসা একঘেয়ে লাগছিল বলে এই নতুন কাজে

হাত দিয়েছেন। ইয়ার্ডের কাজের জন্যে এখন আর তাঁর সহযোগিতার তেমন প্রয়োজন নেই, মেরিচাচী একাই যথেষ্ট, দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের সহায়তায় খুব ভালমত সামলে নিতে পারছেন তিনি।

ব্যবসাটা শুরু করার আগে কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন রাশেদ পাশা। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বলেছেন, 'ভাবিসনে তোদের গোয়েন্দাগিরিতে বাগড়া দিতে আসব। তোদের কাজ তোরা করবি, আমার কাজ আমার…'

'সব গোয়েন্দাগিরির ধরনই এক,' নীরস স্বরে কিশোর বলেছে, 'তোদের আর আমাদের বলে আলাদা কিছু নেই।'

'আছে,' কিশোরের কথার জোরাল প্রতিবাদ করার জন্যে দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ খুলে টেবিলে রেখেছেন তিনি, 'অবশ্যই আছে! তোরা কি খুনের তদন্ত করিস?'

'পেলে করব না কে বলল তোমাকে?'

'করতে হয়তো যাবি, কিন্তু নাক গলাতে দেয়া হবে না তোদের। বয়েস কম বলে ওসব কেসের তদন্ত করার লাইসেন্সই দেয়া হবে না। সোজা ভাগিয়ে দেবে পুলিশ। এ রকম আরও অনেক কেস আছে যেগুলো কেবল বড়দেরই করা সাজে…'

যুক্তি আছে চাচার কথায়। চুপ করে থেকেছে কিশোর।

'আমি করলে তোদের প্রতিদ্বন্দ্বী হব না, ভয় পাসনে,' চাচা বলেছেন, 'বরং অনেক সাহায্য হবে তোদের। যেহেতু অফিস খুলে বসেছি, কেস পাওয়ার জন্যে আর অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না তোদের; আমার কাছেই অনেক আসবে, আমিও দিতে পারব। যেগুলো তোদের জন্যে উপযুক্ত মনে করব, তোদেরকে দিয়ে দেব। কি বলিস, ভাল না?'

মনে মনে মানতেই হয়েছে কিশোরকে, ভাল, কিন্তু মুখে প্রকাশ করেনি সেকথা।

যাই হোক, এজেন্সি খুলেছেন রাশেদ পাশা, এবং শুরুতেই গোটা তিনেক কেসের তদন্ত করে চমকে দিয়েছেন পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থাকেও। সবার নজর পড়েছে তাঁর ওপর। পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। রাতারাতি নাম হয়ে গেছে তাঁর। তারপর থেকে শুরু হয়েছে মক্কেলের ভিড়। দুহাতে ঠেলেও সরাতে পারেন না। তাদের যন্ত্রণায় বাড়ি থেকে পালানোর কথা ভেবেছেন কদিন। মুচকি হেসেছেন মেরিচাচী। হোক আক্কেল। সুখে থাকতে যখন ভূতে কিলায়, কিল কিছু খেয়ে নিক।

সাহায্য করার জন্যে নতুন লোক নেয়ার কথা ভাবছেন এখন রাশেদ পাশা। জানাশোনা কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন কিশোরকে।

প্রথমেই যে নামটা মনে এসেছে, বলে দিয়েছে কিশোর—ওমর শরীফ; তিন গোয়েন্দার অতি প্রিয় ওমর ভাই, সেই দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী বেদুইন, পাইলট হিসেবে যার জুড়ি মেলা ভার। রাশেদ পাশা চেনেন তাকে, নিজের এজেন্সিতে নিয়োগের ব্যাপারে আপত্তি নেই, তবে ওমর রাজি হবে কিনা সেব্যাপারে

সন্দেহ আছে।

কিশোরের ধারণা, ওরা তিনজনে মিলে চেপে ধরলে রাজি না হয়ে পারবে না ওমরভাই, অন্তত পার্ট টাইম কাজ করতে রাজি হবেই।

এ সব নিয়েই ওঅর্কশপে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় ইয়ার্ডে গাড়ি ঢোকার শব্দ হলো।

দরজায় উঁকি দিল মুসা। গাড়ি থেকে নামতে দেখল একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে। তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার পাশা আছেন?'

ইয়ার্ডের ভেতরে এককোণে নতুন একটা বিল্ডিঙে এজেন্সির অফিস করেছেন রাশেদ পাশা। জবাব দিতে যাবে মুসা, ভেতর থেকে কিশোর জানতে চাইল, 'কে?'

ফিরে তাকিয়ে নিচু গলায় মুসা বলল, 'চিনি না। হবে হয়তো কোন মক্কেল। কেসের কাজে এসেছে।'

নেহায়েত কৌতূহলের বশেই দরজা দিয়ে তাকাল রবিন, তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

সেটা লক্ষ করল কিশোর। 'কি হলো?'

'আরি, এই লোক এখানে কেন!'

'চেনো নাকি?'

'চিনি। ছবি বেরিয়েছিল পত্রিকায়। বিজ্ঞানী মিস্টার আলমন্ড ডালডা!'

নামটা উদ্ভট মনে হলো মুসার কাছে, ফিক করে হেসে ফেলল।

তার হাসার কারণ বুঝলেন না মিস্টার ডালডা, আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁকে পাওয়া যাবে?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোর, আংকেল আছেন অফিসে?'

'বেরোনোর সময় তো দেখে এলাম ড্রয়িং রুমে জরুরী টেলিফোন করছে,' টুল থেকে উঠে দরজায় বেরোল সে। ছোটখাট এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন একটা সাদা গাড়ির পাশে। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। সুন্দর করে ছাঁটা সাদা গোঁফ। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে হাতটা সামান্য তুলে সালাম দিল সে। 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'কোত্থেকে এসেছি বললে তো চিনবে না, তবে নামটা বলতে পারি, আলমন্ড ডালডা। তুমি কে?'

'আমি কিশোর পাশা। রাশেদ পাশার ভাতিজা। আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

দ্বিধা করলেন ভদ্রলোক। 'তা নেই। তবে আমার কাজটা খুব জরুরী। তিনি যদি আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতেন...'

অন্য কেউ হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে বলত কিশোর। কিন্তু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে ওভাবে 'না' বলতে পারল না।

'আসুন আমার সঙ্গে,' হাত নেড়ে ডালডাকে আসতে বলে বাড়ির দিকে

রওনা দিল সে।

তার পেছনে এগোলেন ডালডা।

সবার পেছন পেছন আসতে লাগল মুসা আর রবিন।

ড্রয়িং রুমে নেই রাশেদ পাশা। ইন্টারকমে অফিসে খোঁজ নিল কিশোর। সেক্রেটারি জানাল, সেখানেও নেই তিনি। গেলেন কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে লাইব্রেরিতে পাওয়া গেল তাঁকে। একটা ব্রীফকেস গোছাচ্ছেন।

'চাচা, একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বললেন, জরুরী কাজ। বলছেন কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'কি নাম?'

'আলমন্ড ডালডা। বিজ্ঞানী।'

ঘড়ি দেখলেন রাশেদ পাশা। 'কিন্তু আমাকে তো এখন বেরোতে হবে। ঠিক আছে, চল দেখি, কি বলেন!'

দুই

কেসের কাজেই এসেছেন মিস্টার ডালডা। কাজটা রাশেদ পাশার কাছে. হয়তো গোপন কোন কথা বলবেন, বসে থাকাটা শোভন নয়, তাই মুসা আর রবিনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কিন্তু বেশিদূর যেতে দিল না তাকে কৌতূহল। একজন বিজ্ঞানী কি কাজ নিয়ে এসেছেন একজন গোয়েন্দার কাছে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল সে। একটা কান ঘরের দিকে। কিন্তু ভালমত শোনা যায় না এখান থেকে।

'কোন্ সাবজেক্টের বিজ্ঞানী?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এনটোমোলজিস্ট।'

শব্দটা মুসার অজানা। 'কি লজিস্ট?'

'এনটোমো।'

'খাইছে! এটা আবার কি লজিরে বাবা!'

'পতঙ্গ। উনি একজন পতঙ্গ-বিজ্ঞানী। পোকামাকড় নিয়ে গবেষণা করেন।'

'কত রকম পাগল যে আছে দুনিয়ায়!' চোখমুখ বিকৃত করে বলল মুসা, 'ওই কিলবিলে শুঁয়াপোকা ঘাঁটতে কি মজাটা লাগে ওদের?'

'হয়তো লাগে। নইলে করে কেন?'

ভেতর থেকে মিস্টার ডালডার জোরাল কণ্ঠ ভেসে এল, '...অনেক আশা করে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, মিস্টার পাশা...'

ভাল করে শোনার জন্যে দরজার কাছে সরে গেল কিশোর। ওর চাচা বলছেন, 'আশা করে এসেছেন বলেই তো ফিরিয়ে দিতে পারছি না, মিস্টার ডালডা।'

'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি আমি,' অনুরোধ করলেন ডালডা, 'তবু আমার কেসটা আপনি নিলে খুব ভাল হত। বিপদে না পড়লে আপনার কাছে আসতাম না।'

'ঠিক আছে, আমার কথা মানুন, ওদেরকে একটা চান্স দিয়েই দেখুন। কিছুই যদি করতে না পারে ওরা, আমি যাব, যান, কথা দিলাম। ততদিনে আমার হাতের কাজটাও সম্ভবত শেষ হয়ে যাবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন মিস্টার ডালডা।

কিশোরকে ডাক দিলেন রাশেদ পাশা।

ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

রাশেদ পাশা বললেন, 'কিশোর, ইনি বিখ্যাত পতঙ্গ-বিজ্ঞানী। নামটা তো আগেই জেনেছিস। একটা সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমার হাতে তো এখন একটা জরুরী কাজ, তাই আমি ওঁকে অনুরোধ করলাম তোদেরকে একটা চান্স দিয়ে দেখতে। পারবি?'

'কাজটা কি?'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করলেন মিস্টার ডালডা। তিনটে কিশোরকে তাঁর কাজের ভার দিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

লোকের এ ধরনের আচরণ নতুন নয় তিন গোয়েন্দার কাছে। ওদেরকে ছেলেমানুষ ভেবে প্রথমে অনেকেই এমন ভঙ্গিতে তাকায় ওদের দিকে। তারপর যখন কাজটা করে তাক লাগিয়ে দেয় তখন ভুল ভাঙে।

'আমি বলছি না ওদের ক্ষমতা নেই,' সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না মিস্টার ডালডা, 'কিন্তু আমার কাজটা খুব জরুরী...'

'সেজন্যেই তো আর কারও কথা না বলে ওদের কথা বলছি,' রাশেদ পাশা বললেন, 'অসংখ্য জটিল রহস্যের সমাধান ওরা করেছে, যেগুলোর কিনারা পুলিশও করতে পারেনি। ওদেরকে অতটা ছেলেমানুষ ভাবার কোন কারণ নেই। ওদের নিন। যদি কিছু করতে না পারে, আমি ফিরে এলে তখন যাব, বললামই তো।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার ডালডা, আমাকে যেতে হচ্ছে।'

বেরিয়ে গেলেন রাশেদ পাশা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ডালডা। ছেলেদের দিকে ফিরলেন। মনস্থির করে ফেলেছেন, দেবেন ওদেরকে একটা সুযোগ, এ ছাড়া আর যখন কিছু করার নেই। ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে বললেন, 'আমার নাম আগে তোমরা শুনেছ কিনা জানি না, তবে বৈজ্ঞানিক মহলে আমি পরিচিত। আমি একজন এনটোমোলজিস্ট। সারা জীবন কেটেছে প্রজাপতি আর মথ নিয়ে। কয়েক বছর আগে এশিয়ার কয়েকটা দেশ ঘোরার সময় রেশমপোকার দিকে নজর পড়ে আমার। ওগুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতে এখন বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি।'

'ওই পোকা এনেছেন নাকি এ দেশে?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন ডালডা, 'এনেছি। মথ, গুটিপোকা, ওগুলো যে গাছে বাস

করে সেই তুঁত গাছ, সব আমদানী করেছি আমি। এখানে জন্মানোর চেষ্টা করে সফল হয়েছি।' আবার কাশলেন তিনি। 'বরং বলা ভাল, অতিমাত্রায় হয়েছি। আসল পোকার চেয়ে বড় আর উন্নত মানের পোকা জন্মাতে পেরেছি, যেগুলো অনেক বেশি শক্ত আর বেশি পরিমাণে রেশম উৎপাদন করতে পারে।'

কিশোর বলে উঠল, 'কাজের কাজই করেছেন একটা, মিস্টার ডালডা!'

'কেন?' বোকার মত বলল মুসা, 'রেশম খুব কাজের জিনিস নাকি? খুব দামী?'

'দাম ততটা না থাকলেও কাজ হয় অনেক,' ওর দিকে তাকালেন ডালডা, 'এই আবিষ্কার অনেক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল। অতি উন্নত মানের প্যারাস্যুট, বেলুন এ সব তৈরি করা যাবে,' চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে রুমাল বের করে সাবধানে মুছতে শুরু করলেন তিনি। 'আরও একটা জিনিস নিয়ে গবেষণা করছি আমি। তবে সেটার সঙ্গে তোমাদের কেসের কোন সম্পর্ক নেই, তাই আপাতত না জানলেও চলবে।' চশমাটা আবার নাকে বসিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আসল সমস্যার কথা বলি। কিছুদিন থেকে আমার গুটিপোকা, মথ চুরি হয়ে যাচ্ছে।'

অবাক হলো কিশোর, 'চুরি?'

ভ্রূকুটি করলেন বিজ্ঞানী, 'সমস্যাটা এখানেই। চুরি হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে শিওর হতে পারছি না আমি। গ্রীনহাউসে সব সময় তালা দিয়ে রাখি।'

'তালা খুলে চুরি করা যায়।'

'সে-জন্যেই বার্গলার অ্যালার্মের ব্যবস্থা করেছি।'

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'পোকার মত জিনিস চুরি করার মানুষও তাহলে আছে!'

ভ্রূকুটি করলেন ডালডা। 'থাকবে না কেন? দামী জিনিস হলেই চোরে চুরি করে। তবে সমস্যাটা হলো ওগুলো আদৌ চুরি হচ্ছে কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না। খুব সতর্ক থাকি আমি। গবেষণায় পুরোপুরি সফল হতে পারলে দেশ তো বটেই, সারা পৃথিবীর লোক উপকৃত হবে। তাই গবেষণার জিনিসপত্র নিরাপদ রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করি। আমার গ্রীনহাউস সব সময় তালা দিয়ে রাখি। তালা খোলার কোন আলামত দেখিনি। একটিবার বার্গলার অ্যালার্ম বাজেনি। অথচ মথ আর গুটিপোকা ঠিকই উধাও হচ্ছে।'

'আচ্ছা, মরে যাচ্ছে না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা নাড়লেন ডালডা। 'না। গ্রীনহাউসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমি, একটা মরা পোকাও পাইনি। তা ছাড়া প্রতিটি পোকা, প্রতিটি মথ, গুটি আমি এমন করে চিনি, যে কোন একটা হারালেই বলে দিতে পারব। উধাও যে হচ্ছে সেজন্যেই বুঝতে পারছি। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার!'

'যদি বলেন তো আমরা গিয়ে একবার তদন্ত করে দেখতে পারি,' কিশোর বলল।

চুপ করে রইলেন ডালডা। আবার হয়তো ভাবছেন ওদেরকে দিয়ে কাজ হবে কিনা। অবশেষে মাথা কাত করলেন, 'বেশ, তোমার চাচা যতদিন না ফেরেন, তোমাদের তদন্ত করতে দিতে আপত্তি নেই আমার। দেখো, কোন সূত্র পাও কিনা। তিনি এলে তখন সেটা দেখে হয়তো কিছু বুঝতে পারবেন।'

'আপনার গ্রীনহাউসটা কোথায়?'

'কাছেই, বেশি দূরে না এখান থেকে। ডিয়ারভিল নামে একটা গ্রামে।'

'ও, গেছি তো ওখানে,' মুসা বলল, 'পিকনিক করতে। সুন্দর জায়গা। মিসেস বেনসন নামে এক মহিলার একটা খামারে থেকেছি। মহিলা খুব ভাল। দারুণ রান্নার হাত। যা মজার মজার কেক আর বার্গার বানান না...'

'বাড়িতেই যিনি একটা বোর্ডিং হাউস করেছেন, ট্যুরিস্ট গেলে ওঠে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই। চেনেন নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন ডালডা। 'তাঁর বাড়ি থেকে আমার গ্রীনহাউস বেশি দূরে না। দেখা যায়।'

'তাহলে তো ভালই হলো,' কিশোর বলল, 'মিসেস বেনসনের ওখানেই উঠব আমরা। তদন্ত করতে হলে রাতে থাকতে হবে। চুরিদারিগুলো সাধারণত রাতের বেলাতেই বেশি হয়।'

'কিন্তু সরাসরি তদন্ত করতে চলে গেলে চোরের চোখে পড়ে যেতে পারো,' ডালডা বললেন, 'সে তখন সাবধান হয়ে যাবে। তোমরা যতদিন থাকবে, হয়তো গ্রীনহাউসের ধারেকাছেও আসবে না সে।'

তা বটে। চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর। শেষে একটা সমাধান বের করে মুখ তুলে হাসল, 'এক কাজ করতে পারি, ওই এলাকায় গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারি। অনেক খামার আর ফসলের খেত আছে ওখানে। প্রায়ই কাজের লোক খোঁজে মালিকেরা।'

'কিন্তু ও তো সব শ্রমিকের কাজ। তোমরা পারবে?'

হাসল কিশোর। বলতে ইচ্ছে করল—গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কত পচা কাজ যে করতে হয়েছে আমাদের, সেখবর তো আপনি রাখেন না। বলল, 'পারব না কেন?'

ফোন বাজল। উঠে গিয়ে ধরল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার ডালডা, আপনার ফোন।'

'আমার ফোন!'

রিসিভারের মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে কিশোর বলল, 'তাই তো বলছে। পরিষ্কার আপনার নাম বলল।'

'অবাক কাণ্ড! আমি যে এখানে এসেছি জানল কি করে? কারও তো জানার কথা নয়!'

'কথা বলে দেখুন।'

কিশোরের হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকালেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। 'আলমন্ড ডালডা বলছি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।

ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর চেহারা। ওপাশে কথা বলা শেষ করে লোকটা লাইন কেটে দেয়ার পরও রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর আস্তে করে রাখলেন ক্রেডলে। হাত কাঁপছে।

গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে খসখসে স্বরে বললেন, 'সরি, অনেক সময় নষ্ট করলাম তোমাদের। আমার গ্রীনহাউসে আসার আর কোন প্রয়োজন নেই তোমাদের। রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।'

'মানা করছেন?' ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন ডালডা। ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন।

'আসলে...আসলে...' কিশোরের মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি, 'আমারই ভুল হয়েছে। যাকগে, যা বলার বলেছি, ভুলে যাও, তোমাদেরকে আর দরকার নেই আমার।'

তিন

বুঝতে বাকি রইল না কারও, রহস্যময় ওই টেলিফোনই হঠাৎ করে বিজ্ঞানীর মত পরিবর্তনের জন্যে দায়ী। ওরা নিশ্চিত, রহস্যের সমাধান মোটেও হয়নি। তা যদি হত, তাহলে ভয় না পেয়ে বরং খুশি হতেন তিনি, উজ্জ্বল হত মুখ, এ ভাবে হাত কাঁপত না।

কোমল স্বরে কিশোর বলল, 'আসলে আমাদেরকে এখন আরও বেশি দরকার আপনার, মিস্টার ডালডা।'

'কে বলল?' খেপে উঠলেন তিনি। 'ভুলটা আমার। চুরিদারি কিছুই হচ্ছে না গ্রীনহাউসে। তদন্তের প্রয়োজন নেই।'

'হুমকি দেয়া হয়েছে আপনাকে, তাই না?'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তাঁর দৃষ্টি। 'এ কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'ঠিক বলেছি কিনা বলুন?'

দ্বিধা করতে লাগলেন বিজ্ঞানী। তারপর বুঝলেন মিথ্যে বলে লাভ নেই, বিশ্বাস করাতে পারবেন না ছেলেটাকে। বোকা নয় ও। স্বর নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছ। ওই ফোন...যাই বলো, এখন তোমাদেরকে তদন্ত চালাতে দিতে ভয় পাচ্ছি আমি।'

'হুমকি দিয়ে থাকলে তো সাহায্যের আরও বেশি দরকার আপনার, মিস্টার ডালডা,' রবিন বলল।

মুসাও তার সঙ্গে একমত হলো, বলল, 'ওই ব্যাটাকে ধরা দরকার।'

'কিন্তু আমি আর তোমাদের তদন্ত করতে বলতে পারছি না...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'ঘটনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, মিস্টার ডালডা। বোঝা যাচ্ছে, আপনার অনুমানই ঠিক, চুরি হচ্ছে রেশমপোকা।

আর কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে। আপনি আমাদের কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছেন সেটা কোন ভাবে জেনে ফেলেছে লোকটা, তাই ফোনে আপনাকে হুমকি দিয়েছে যাতে আমাদের সাহায্য না নেন। এখন আপনার উচিত তার কথা না শোনা। শুনলে সাহস বেড়ে যাবে ওর, আরও হুমকি দেবে, ব্ল্যাকমেইল করতেও দ্বিধা করবে না।'

ভাবতে লাগলেন মিস্টার ডালডা। কয়েক মিনিট পর মাথা ঝাঁকালেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু গ্রীনহাউসের কাছে তোমাদের দেখলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আমার, কল্পনাও করতে পারছ না তোমরা…'

'বলেছে ক্ষতি করবে?'

'করবে বলেনি, বলেছে—হবে, ওই একই কথা।'

'লোকটাকে চিনতে পেরেছেন?'

'চিনলে তো এতক্ষণে পুলিশের কাছে যেতাম। যাকগে, তদন্ত যদি করতেই হয়, এমন ভাবে যেতে হবে তোমাদের যাতে চিনতে না পারে। ছদ্মবেশে যেতে পারলে…'

কিশোর বুঝল, নিজের খামারের কাউকে সন্দেহ করছেন ডালডা, তাই চান না সেই লোক জেনে ফেলুক যে তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছেন। বলল, 'বেশ, যদি চাষীর ছদ্মবেশে যাই আমরা? অন্য ফার্মে চাকরি করব, মাঝেসাঝে কোন একটা ছুতোয় আপনার ওখানে ঘুরে আসব, তাতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?'

'না, সেটা অবশ্য করতে পারো,' বললেন ডালডা, 'তবে তাতেও মস্ত ঝুঁকি থেকে যাবে। যাই হোক, একটা কিছু করা দরকার। সবচেয়ে ভাল হত…' কথা শেষ না করে হ্যাটটা তুলে মাথায় দিলেন তিনি। আর একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। রহস্যময় টেলিফোন তাঁকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

জানালা দিয়ে তাকাল কিশোর।

আপনমনে মাথা দোলাতে দোলাতে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন বিজ্ঞানী। বেরিয়ে গেলেন গেট দিয়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে মুসার ভটভটি জেলপি গাড়িটা নিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। শহর থেকে বেরিয়ে সাগরের ধারের পথ ধরে এগোল। ডিয়ারভিলে পৌছতে দেরি হলো না। গাছপালায় ঘেরা একটা খামারবাড়ির গেটের ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল মুসা। সরু পথ ধরে এসে থামল বড়, পুরানো একটা বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা।

শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন হালকা-পাতলা এক মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ। ছেলেদের দেখেই হাসি ফুটল মুখে, 'আরে গোয়েন্দারা যে! এসো এসো। কি খবর, এই অসময়ে বেড়াতে এলে নাকি?'

হাসিমুখে এগিয়ে গেল রবিন, 'চলে এলাম। থাকব কয়েকদিন। আপনি কেমন আছেন, মিসেস বেনসন?'

'আছি, ভালই আছি। সত্যি, বিশ্বাস করতে পারছি না, এই অসময়ে তোমরা আসবে...'

'আপনার কেকের লোভ সামলাতে পারলাম না!' হেসে বলল মুসা। 'মনে পড়তেই চলে এসেছি। তা জায়গা-টায়গা আছে তো? লোকজনের ভিড় ভাল লাগে না।'

'সারা বাড়িই খালি। একজনও নেই। এ সময়ে কি আর কেউ আসে নাকি। ভাল করেছ এসে, প্রাণ ভরে খাওয়াতে পারব। এসো, ভেতরে এসো। খিদে পেয়েছে তো? যাও, তোমরা হাতমুখ ধুয়ে আসতে আসতেই বার্গার হয়ে যাবে। এসো।'

আগের বার এসে যে ঘরটায় থেকেছিল, এবারও সেটাতেই উঠল ওরা। সুটকেস রেখে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে চলে এল সোজা রান্নাঘরে। মাংসভাজার লোভনীয় গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিছু করতে হবে, মিসেস বেনসন, আসব?'

'কোন দরকার নেই। টেবিলে গিয়ে বসো। আমার হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট।'

খাবার এল। ওদের সামনে বসে এটা ওটা এগিয়ে দিতে লাগলেন মিসেস বেনসন। রকি বীচের খোঁজখবর নিলেন। মেরিচাচীর কথাও জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে চেনেন তিনি। রাশেদ পাশা আর কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে মেরিচাচীও এক বসন্তে বেড়িয়ে গেছেন এখানে।

সব খবর নেয়া হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বেনসন, 'তা উদ্দেশ্যটা কি আসার? গোয়েন্দাগিরি, না স্রেফ বেড়ানো।'

এই প্রশ্নটার ভয়ই করছিল কিশোর। মিস্টার ডালডাকে কথা দিয়েছে তদন্তের কথা কাউকে বলবে না। ছদ্মবেশে থাকবে। মিসেস বেনসনকে তাহলে কি বলবে? ভেবেচিন্তে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল সে। মক্কেলের দিকটা দেখতে হবে আগে। বলল, 'সিনেমায় ছোটখাট একটা রোল করার প্রস্তাব পেয়েছি আমরা তিনজনেই। চাষীর খেতে শ্রমিকের কাজ করতে হবে। তাই ভাবছি, ওরকম পোশাক-আশাক পরে সত্যি সত্যি কারও খেতে গিয়ে কাজ করব। আসল কাজটা জানা থাকলে অভিনয়ে অনেক সুবিধে হয়।'

মিসেস বেনসন সহজ-সরল মানুষ। তাঁকে বোঝাতে বেশি কথা বলতে হলো না কিশোরকে। তবে এভাবে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগল ওর। কিন্তু উপায় নেই, তদন্তের স্বার্থে গোয়েন্দাকে কখনও কখনও মিথ্যের আশ্রয় নিতেই হয়। কাজটাই এমন।

খাওয়ার পর চাকরির সন্ধানে বেরোল ওরা। তবে বেরোনোর আগে পোশাক পাল্টে এমন পোশাক পরল যাতে মনে হয় শ্রমিক শ্রেণীর লোক। আসার সময় কাপড়গুলো নিয়ে এসেছে।

গাঁয়ের বাজারে এল ওরা। ওখানে একটা বড় স্টোরের বারান্দায় দেয়ালে ঝোলানো থাকে চাকরির খবরাখবর। তাতে দেখল ওয়াকার ফার্মের জন্যে তিন-চারজন লোক দরকার, শ্রমিক চেয়েছে ওরা।

ফার্মের অফিসটা কোথায় দোকানের মালিকের কাছে জেনে নিয়ে রওনা হলো তিনজনে। একটা শস্যখেতের পাশ দিয়ে ঘুরে এগোতে চোখে পড়ল লাল টালির ছাত দেয়া গোলাঘর আর তার পাশে মেইন বিল্ডিং। একধারে আস্তাবলের সামনে কাজ করছে একজন লোক। তাকে জিজ্ঞেস করতে সুপারিনটেনডেন্টের অফিস দেখিয়ে দিল।

অফিসে ঢুকে দেখা গেল ডেস্কের ওপাশে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে একজন লম্বা লোক। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।

কিশোর বলল, 'আপনাদের নাকি লোক লাগবে?'

'লাগবে। কাজ করতে এসেছ?'

'হ্যা।'

বেশি কথা বলা পছন্দ করে না লোকটা। দু'চার কথায় কাজ শেষ করে ফেলল। যে কোন শর্তে চাকরি করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে তিন গোয়েন্দা। সুতরাং চাকরি হয়ে গেল ওদের। লোকটা বলল, 'আজ তো অনেক দেরি হয়ে গেছে, তোমরা বরং কাল সকাল থেকে এসো।'

'ঠিক আছে, স্যার,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

'না, দরকার নেই। আমি জায়গামত খবর দিয়ে দেব। আন্ডারওয়াটার সেকশনে কাজ দেয়া হলো তোমাদের। সকালে ওখানে চলে যেয়ো, তোমাদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া হবে। মাটি ছাড়াই ফসল ফলানোর চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা ওখানে। কেমিকেল দিয়ে।'

'খাইছে! মাটি ছাড়া ফসল!' অবাক হয়ে বলল মুসা।

'হ্যা, পানিতে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে। ইতিমধ্যেই অনেকখানি সফল হয়েছি আমরা। দেখলে অবাক হবে। যাই হোক, আজকে ঘুরে ঘুরে দেখো সব, কাল থেকে কাজে লাগবে।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করল কিশোর।

'ও হ্যা, আরেকটা কথা, ঘোড়ায় চড়তে পারো?'

'পারি। কেন, স্যার?'

'গুড। ঘোড়ায় চড়তে জানলে অনেক সুবিধে। আস্তাবলে কাজ করছে রোনাক, তাকে গিয়ে বলো তিনটে ঘোড়া দিতে। ওগুলোতে চড়ে ঘোরোগে। যাও।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার।'

খুশি মনে সুপারিনটেনডেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

আস্তাবলের সামনে যে লোকটা কাজ করছে তার নাম রোনাক। বলতেই তিনটে ঘোড়ার পিঠে জিন পরিয়ে রেডি করে দিল সে। বলল, 'অনেক বড় ফার্ম এটা। শুরুতে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্যে জীপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গাড়ির চাকা সবখানে চলে না। অসুবিধে হয় বলে শেষে এই ঘোড়ার ব্যবস্থা।'

ঘোড়ায় চড়ল তিন গোয়েন্দা। রোনাককে ধন্যবাদ দিয়ে সরে এল

আস্তাবলের সামনে থেকে।

চার

কয়েক মিনিট ফার্মের সীমানায় ঘোরাঘুরি করল ওরা।

বোর্ডিং হাউস থেকে যে পথে আসতে হয়, সেই পথের পাশে একটা পুকুর নজর কাড়ল মুসার। ঘন গাছপালায় ঘেরা পুকুরটার পানি এত স্বচ্ছ, দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল তার। মনে মনে নিজেকে বোঝাল সে, 'এখন সময় নেই, পরে কোন এক সময়।'

পুকুরের এককোণে মাছের আশায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে একটা বক।

'সুন্দর জায়গা,' কিশোর বলল। 'চলো, এবার ডালডার গ্রীনহাউসটা দেখে আসি।'

মুসা বা রবিন কেউ অমত করল না।

পনেরো মিনিটেই গ্রীনহাউসের ড্রাইভওয়ের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা বড় বাড়ির পেছনে গ্রীনহাউসের কাঁচের ছাদ রোদে চকচক করছে। ড্রাইভওয়েতে ঢোকার মুখে বড় সাইনবোর্ডে লেখা:

ব্যক্তিগত এলাকা
অনুমতি ছাড়া ঢোকা নিষেধ

'তাই বলে আমাদের ঢোকা নিশ্চয় বারণ নয়,' হেসে বলল কিশোর। 'ওই যে মিস্টার ডালডা আসছেন।'

বাগানের একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। ছেলেদের ওপর চোখ পড়ল, কিন্তু চিনতে পারলেন না।

গলার স্বর বদলে বলল কিশোর, 'গুড আফটারনুন, স্যার। আপনার গ্রীনহাউসে একবার ঢুকতে পারি? আপনার পোষা জীবগুলোকে একবার দেখব।'

মুখ তুলে তাকিয়ে ভাল করে তিনজনকে দেখে হেসে ফেললেন ডালডা। চিনতে পেরেছেন এতক্ষণে। দরজা খোলার শব্দ হলো। চট করে ফিরে তাকিয়ে দেখেন বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একজন লোক। গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে ওদের না চেনার ভান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে? কোত্থেকে এসেছ?'

'আমি হ্যারি,' জবাব দিল কিশোর, 'ও ডিক। আর ও হলো টম। ওয়াকার ফার্মে চাকরি নিয়েছি। ওদের কাছেই শুনলাম আপনাদের রেশমপোকার খবর। এ ধরনের ফার্ম আর দেখিনি, তাই খুব ইচ্ছে করল, চলে এসেছি।'

'সবাইকে তো ঢুকতে দেয়া হয় না,' দ্বিধা করার ভঙ্গিতে বললেন ডালডা। 'ঠিক আছে, এসো।' বিশাল গেটটা খুলে দিলেন তিনি। ঘোড়া

কোথায় বাঁধতে হবে দেখিয়ে দিলেন।

ঘোড়া থেকে নামল তিন গোয়েন্দা।

কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। ছিপছিপে এক তরুণ। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, স্যার?'

'কিছু না, ম্যাট,' জবাব দিলেন ডালডা, 'এই ছেলেগুলো ওয়াকার ফার্মে কাজ করে। রেশমপোকা দেখতে এসেছে।'

'পোকা একটা দেখার জিনিস হলো নাকি,' গোমড়ামুখে বলল লোকটা। 'যাকে তাকে এ ভাবে ঢুকতে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে, স্যার? তাহলে আর তালাচাবি দিয়ে এত সতর্কতার দরকারটা কি?'

'তুমি যা ভাবছ তা নয়,' কর্মচারীর কাছেই কেমন কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন মনিব। ব্যাপারটা ভাল লাগল না কিশোরের। এই লোকটাকেই সন্দেহ করেন নাকি? ভয় পান কোন কারণে? ভয় যে পান সেটা বোঝা গেল, কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বললেন, 'দেখে তো খারাপ ছেলে বলে মনে হচ্ছে না এদের···হ্যাঁ, ছেলেরা, ও আমার ফোরম্যান, ম্যাট ডগলাস।'

'হ্যালো,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর।

কিন্তু হাতটা ধরল না ম্যাট। তাকিয়ে রইল কিশোরের চোখের দিকে।

হাসি মুছল না কিশোরের মুখ থেকে। 'কিছু নষ্ট করব না আমরা। শুনেছি বলেই এলাম। রেশমপোকার খামার দেখিনি তো কখনও। দারুণ নাকি দেখতে···'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক জিনিস,' বিজ্ঞানী বললেন। 'এসো। আমি সঙ্গে থাকব তোমাদের।'

কিশোরের মনে হলো সঙ্গে থাকার কথাটা বলেছেন ওদের, কিন্তু আসলে শুনিয়েছেন ম্যাটকে। বড় একটা গ্রীনহাউসের দিকে ওদের নিয়ে চললেন। কিশোর আশা করল, এই সুযোগে বিজ্ঞানীর সঙ্গে দু'চারটা গোপন কথা বলতে পারবে। কিন্তু তার আশা দুরাশা। সঙ্গে সঙ্গে চলল ম্যাট, একেবারে ওদের ঘাড়ের ওপর চেপে থেকে। কিসের ভয় তার? মালিক যদি তাঁর খামার অন্য কাউকে দেখাতে চান, তার কি? নাকি বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর ওপর ভরসা নেই তার? ভাবছে বাইরের কেউ এসে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পোকা চুরি করে নিয়ে যাবে? কারণ যেটাই হোক, সঙ্গ ছাড়ল না সে।

জায়গাটা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না গোয়েন্দারা। যতটা সম্ভব খরচ করে গ্রীনহাউস সাজিয়েছেন ডালডা। তুঁত গাছ আর পূর্বদেশীয় নানা জাতের গাছের চাষ করেছেন যাতে বিশেষ প্রজাতির মথ বাস করতে পারে। তবে তাঁর গর্ব রেশমপোকাগুলোকে নিয়ে, যেগুলোর উন্নতি করেছেন তিনি। ওই পোকার গুটি দেখালেন ছেলেদের। হাজারে হাজারে মথ উড়ছে গ্রীনহাউসের মধ্যে।

'তোমরা নিশ্চয় জানো,' বিজ্ঞানী বললেন, 'তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বাঁচে রেশমপোকা। সেজন্যে গ্রীনহাউসের ভেতরে তাপমাত্রা ঠিক রাখতে হয় যাতে গাছ মরে না যায়। গাছ মরলে পোকাও মরবে।'

একটা ঘরের মধ্যে দেখা গেল চার ইঞ্চি লম্বা গুটি, মথগুলো বিরাট।

'এত বড় হয় এই মথ, জানতাম না,' রবিন বলল। 'বাপরে বাপ, কত্তবড়! আট ইঞ্চির কম হবে না!'

হাসলেন ডালডা। 'সাধারণত তিন ইঞ্চির বেশি বড় হয় না গুটি, আর মথ হয় বড়জোর ছয় ইঞ্চি। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় এগুলোকে অতবড় করেছি আমি। কি নাম দেয়া যায় এগুলোর, বলো তো?'

এ সব পোকামাকড়ে আগ্রহ নেই মুসার, বরং গা ঘিনঘিন করে। বিজ্ঞানীকে খোঁচা দেয়ার জন্যে বলল, 'ডালডাপোকা···'

খোঁচাটা বুঝলেন না বিজ্ঞানী। ফোরম্যানের দিকে ফিরে বললেন, 'শুনতে খারাপ না নামটা, কি বলো, ম্যাট? আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ডালডাপোকাই রাখব···'

মুখ এখনও গোমড়া করেই রেখেছে ফোরম্যান। 'মিস্টার ডালডা, অচেনা মানুষের সামনে এ ভাবে গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছেন···সব কথা ওদের বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

ম্যাটের চাপাচাপিতে যদি ওদের বের করে দেন ডালডা, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব তথ্য আদায় করে নিতে চাইল রবিন, 'একটা গুটি থেকে কতটা রেশম পাওয়া যায়? দু'তিন গজ?'

'কি বলো,' ছেলেদের অজ্ঞতায় মজা পেলেন ডালডা, 'দু'তিনশো বললেও এক কথা ছিল। কমপক্ষে পনেরোশো ফুট লম্বা হয় একটা রেশম। সাধারণ গুটি থেকে অবশ্য অনেক কম পাওয়া যায়।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। আলমন্ড ডালডার রেশমপোকার মূল্য অনেকটা আন্দাজ করতে আরম্ভ করেছে ওরা। আরও শোনার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ম্যাটের জন্যে পারল না। সে ওদেরকে বের করে দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আর কিছু না বলার জন্যে বাধা দিতে লাগল বিজ্ঞানীকে।

ছোট আরেকটা গ্রীনহাউসের গায়ে লেখা রয়েছে:

SECRET.

সেটা দেখার ইচ্ছে ছিল কিশোরের, কিন্তু সেদিকে ওদেরকে এগোতেই দিল না লোকটা।

হাল ছেড়ে দিলেন ডালডা। ছেলেদের নিয়ে ফিরে এলেন ঘোড়ার কাছে। সঙ্গে এল ম্যাট। এরই ফাঁকে কোনমতে কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে আসল কথাটা বললেন তিনি, 'কাল রাতেও কয়েকটা দামী মথ চুরি গেছে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল কিশোর, তাঁর কথা সে শুনতে পেয়েছে। বলল, 'গ্রীনহাউস দেখানোর জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার ডালডা। আপনার রেশমপোকা দেখার মত জিনিস। সময় করে আবার আসব একদিন, অনেকক্ষণ থেকে দেখে যাব।'

বিজ্ঞানী বললেন, এলে খুশি হবেন। কিন্তু ম্যাটের গোমড়া মুখ আরও গোমড়া হয়ে গেল শুনে। চোখে তিক্ত দৃষ্টি, শুঁয়াপোকাগুলোর দিকে মুসা যে

দৃষ্টিতে তাকিয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক খারাপ।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ঘোড়ায় চেপে পাশাপাশি চলতে চলতে কিশোর বলল, 'তারপর, কি বুঝলে?'

'জায়গাটাতে অনেক বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে, একেবারে দুর্গ বানিয়ে ফেলার চেষ্টা,' রবিন বলল। 'চোরের পক্ষে ঢোকাটা বড় কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু যদি কেউ কোনমতে যে কোন একটা গ্রীনহাউসে ঢুকে পড়তে পারে, তা হলেই হলো, ভেতর দিয়ে দিয়ে সবগুলোতে ঢুকে যেতে পারবে। যে কোন হাউস থেকে যত খুশি মথ নিয়ে যেতে পারবে।'

'রাতের বেলা নজর রাখলে কেমন হয়?' মুসা বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে গিয়ে মিস্টার ডালডাকে জানাতে পারব।'

মন্দ বলেনি সে। একমত হলো অন্য দুজন।

ওয়াকার ফার্মে এসে ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে বাঁধল ওরা। মিসেস বেনসনের বাড়িতে ফিরে খাওয়া সারল। অন্ধকার হতেই বেরিয়ে পড়ল আবার গ্রীনহাউসে যাওয়ার জন্যে।

রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ওরা। গ্রীনহাউসের গেটের সামনে দিয়ে পার হয়ে এল। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল না, বেশি কাছেও গেল না। কোনখান থেকে চোখ রেখেছে ম্যাট, কে জানে। এ সময় এখানে ওদের ঘুরঘুর করতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে।

সরু একটা রাস্তা চলে গেছে গ্রীনহাউসের পাশ দিয়ে। সেটা ধরে এগোলে কোথাও লুকিয়ে বসে চোখ রাখতে পারবে।

রাস্তা ধরে পেছন দিকে চলে এল ওরা। এক পাশে গাছ, অন্য পাশে গ্রীনহাউসের উঁচু বেড়া। বেড়ার ওপাশে মাঠ, তারপরে রয়েছে বাড়িগুলো। আকাশে মেঘের মাঝে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ। চাঁদের আলোয় চকচক করছে বিশাল খাঁচার মত গ্রীনহাউসগুলোর কাঁচের ছাদ আর দেয়াল।

'এদিক দিয়ে তো সহজেই ঢুকে যাওয়া সম্ভব,' রবিন বলল। 'অন্ধকারে এই বেড়া পেরোনো কোন কঠিন কাজ না।'

একটা গাছের গোড়ায় বসে রইল তিনজনে।

হঠাৎ বলে উঠল মুসা, 'অ্যাই, দেখো, ওটা কি!'

ঘুরে তাকাল কিশোর আর রবিন।

রাস্তার অন্যপাশে তৃণভূমির ওপারে আলো ঝিলিক দিচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে নিভে গিয়ে আবার জ্বলল। আবার নিভল। আবার জ্বলল।

পাঁচ

আলোর দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে।

'কিসের আলো?' মুসার প্রশ্ন। 'ওদিকে তো সাগর। মাছ ধরছে না তো কেউ?'

'কি জানি!' বিড়বিড় করে কিশোর বলল, 'যে ভাবে জ্বলছে নিভছে, তাতে তো মনে হয় কেউ কাউকে সঙ্কেত দিচ্ছে।'

খানিক পর নিভে গেল আলোটা, আর জ্বলল না।

আবার গ্রীনহাউসের দিকে মনোযোগ দিল ওরা।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন কিছু ঘটল না, কিশোর বলল, 'ভেতরে ঢুকলে কেমন হয়?'

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারদিক। ঢুকতে হলে এটাই সুযোগ।

'কি দেখবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। ঘড়ি দেখল। এগারোটা বাজে।

'জানি না। গ্রীনহাউসগুলোর ভেতরে একবার উঁকি মারতে ইচ্ছে করছে।'

বেড়া ডিঙিয়ে মাঠ পেরিয়ে চলে এল ওরা মিস্টার ডালডার কটেজের কাছে। অন্ধকার। আলো নেই ঘরে। সাবধানে এগোল গ্রীনহাউসের দিকে। এই সময় মেঘ সরে গেল চাঁদের ওপর থেকে। জ্যোৎস্নায় আবার ঝলমল করে উঠল কাঁচের বিশাল খাঁচাগুলো।

যেদিক দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, সেদিকে গ্রীনহাউসের সামনেও বেড়া। ওটা ডিঙানোও কঠিন হলো না। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল সামনে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা। কিশোরের হাত খামচে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'শুনছ!'

স্থির হয়ে গিয়ে কান পাতল কিশোর আর রবিন। দূর থেকে ভেসে এল মৃদু শব্দ, মনে হলো ছিটকানি খোলার পর দরজা খুলল কেউ, কজার ক্যাচকোঁচ শব্দ। ডালডার কটেজের দিক থেকে টর্চ জ্বলে উঠল। আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। আলো নিভে গেল।

একটা গাছের ছায়ায় সরে এল তিন গোয়েন্দা। আবার মেঘের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে চাঁদ। আবছা আলোয় একটা মূর্তিকে রাস্তা পেরিয়ে হেঁটে আসতে দেখা গেল।

ম্যাট ডগলাস!

নিঃশব্দে হেঁটে আসছে লোকটা। হাতের টর্চ জ্বলে উঠল অকস্মাৎ। আলো ফেলল একটা গ্রীনহাউসের দরজায়। হাঁটতে হাঁটতেই ভেতরটা [illegible]। চলে গেল একটা বাড়ির ওপাশে।

কোথায় যায় দেখার জন্যে ওর পিছু নিল কিশোর। ছায়ার মত সঙ্গে চলল রবিন আর মুসা। বাড়ির কোণ ঘুরে এসে অনেক সামনে দেখতে পেল টর্চের আলো। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল তিনজনে।

লোকটার আচরণে কেমন একটা চোরা চোরা ভাব। প্রথম দেখেই ওর ওপর সন্দেহ হয়েছিল কিশোরের, এখন সেটা আরও বাড়ল।

টর্চ নিভে গেল। গ্রীনহাউসের ভেতরে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখল বলে মনে হলো কিশোরের। পরমুহূর্তে হারিয়ে গেল ওটা। সত্যি দেখল, নাকি চোখের ভুল?

কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হলো। নীরব রাতে বেশি হয়ে কানে বাজল শব্দটা। গোয়েন্দাদের মনে হলো গ্রীনহাউসের অর্ধেকটাই বুঝি ধসে পড়েছে।

ধুপ করে একটা শব্দ। কেউ যেন লাফিয়ে পড়ল ওপর থেকে। ছুটে আসতে লাগল এদিকে।

চট করে দেয়ালের ছায়ায় সরে গেল ওরা। মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল অন্ধকারে।

ওদের ঠিক সামনে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গেল ম্যাট। এত কাছে দিয়ে গেল, ওর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দও কানে এল ওদের। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারত। অথচ ওদের দেখতে পেল না সে। গ্রীনহাউসের সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল কটেজের দিকে।

'চোর দেখে পুলিশকে ফোন করতে গেল নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কিংবা হয়তো চোরের সঙ্গেই সম্পর্ক ওর!' মুসা বলল। 'মিস্টার ডালডা জেগে ওঠার আগেই সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলতে চায়?'

কটেজের দরজা খুলল ম্যাট। ভেতরে ঢুকে তাড়াহুড়া করে লাগিয়ে দিল।

সেও বেরোল না আর। অন্য কেউও বেরোল না। মিস্টার ডালডা কোথায়? এত জোরে শব্দ হলো, তিনি শুনতে পেলেন না?

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে কোথায় কাঁচ ভেঙেছে দেখতে চলল তিন গোয়েন্দা। গ্রীনহাউসের এক জায়গায় কাঁচ ভেঙে একটা ফোকর হয়ে আছে। টুকরোগুলো পড়েছে ভেতর দিকে। ফোকরের ঠিক নিচে লোহার কাঠামোর সঙ্গে ঠেকানো একটা মই দেখা গেল হেলান দিয়ে রাখা। এটা এখানে এল কি করে তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না আপাতত কিশোর। যে কেউ এনে রাখতে পারে। তবে এটায় উঠে ভেতরে তাকানো সহজ, ভালমত দেখা যায়। পাহারা দেয়ার সময় ভেতরে উঁকি দেয়ার জন্যে ম্যাটও এনে রাখতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কাঁচ ধসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'চোর চোর' বলে চিৎকার না করে সে ওরকম ছুটে পালাল কেন?

কোমর থেকে টর্চ খুলে নিয়ে গ্রীনহাউসের আশপাশে আলো ফেলে দেখল কিশোর। কাউকে দেখা গেল না। মইয়ের মাথার দিকটায় আলো ফেলল। টর্চটা আবার কোমরে ঝুলিয়ে মই বেয়ে উঠে এল ওপরে।

ভাঙা জায়গাটা দিয়ে সহজেই ভেতরে ঢুকে যাওয়া যায়। তাই করল সে। লোহার ফ্রেম ধরে ঝুলে পড়ল ভেতরে। ছেড়ে দিতেই ঝুপ করে নামল

নরম মাটিতে।

একে একে ওর পাশে এসে নামল রবিন আর মুসা।

গ্রীনহাউসের ভেতরে অন্ধকার। আবার মেঘের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালতে যাবে কিশোর, হঠাৎ আলতো করে গাল ছুঁয়ে গেল কিসে যেন, মনে হলো যেন কারও দস্তানা পরা হাত।

চমকে গেল। লাফ দিয়ে পাশে সরতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। পায়ের নিচে মাটি পেল না। কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার। হাত থেকে ছুটে গেল টর্চটা। কিছু একটা ধরে পতন ঠেকানোর জন্যে মরিয়া হয়ে থাবা মারল। কিছুই ঠেকল না হাতে, শুধু বাতাস।

নিচে পড়ে গেল সে। চারপাশে অন্ধকার।

ছয়

ভাগ্য ভাল, যেখানে পড়ল সেখানকার মেঝেতেও নরম বালি, ওপর থেকে বেশি নিচেও নয়। স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত।

ওপর থেকে শোনা গেল মুসা আর রবিনের চিৎকার, 'কিশোর, কোথায় তুমি? কি হয়েছে?'

অবশেষে স্বাভাবিক দম নিতে পারল কিশোর। বলল, 'আমি ঠিক আছি।'

'দূর! আমার টর্চ জ্বলছে না কেন?' রবিনের গলা শোনা গেল। 'মুসা, তোমারটা জ্বালো তো।'

'আমি টর্চ আনিনি,' জবাব দিল মুসা। 'তোমাদের নিতে দেখলাম, তাই আর বোঝা বাড়াইনি।'

উঠে বসল কিশোর। হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে গিয়ে হাতে ঠেকল সিঁড়ি। বুঝে গেল কোথায় পড়েছে। একটা সেলারের মধ্যে—মাটির নিচের ঘর। হাঁটুর কাছে ছড়ে গিয়ে জ্বলছে, চমকের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও, ভীষণ কাঁপছে শরীর; এ ছাড়া সব ঠিকই আছে, আর কোন ক্ষতি হয়নি ওর।

মেঝেতে হাতড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা শক্ত জিনিস। একবার ছুঁয়েই চিনে ফেলল, ওর টর্চ। তুলে নিয়ে সুইচ টিপল। নষ্ট হয়নি। সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে।

'যে ভাবে পড়েছিলে, আরেকটু হলেই ঘাড় ভাঙত!' কিশোরকে উঠে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কিন্তু এই সেলারের ঢাকনা খুলে রেখে গেল কে?'

'হয়েছিল কি?' জানতে চাইল মুসা।

'কিসে যেন মুখ ছুঁয়ে গেল…'

'খাইছে! বলো কি!' ভয় পেয়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা। ভাবছে, গ্রীনহাউসেও ভূত থাকে নাকি?

আবার আলতো ছোঁয়া লাগল কিশোরের গালে। এইবার আর ভয় পেল না সে। দেখতে পেল কিসে ছুঁয়েছে। হেসে ফেলল সে। নিঃশব্দে তার গালের কাছে দিয়ে উড়ে গেল প্রাণীটা।

'কাণ্ড দেখো,' হাসতে হাসতে বলল সে, 'মথের ছোঁয়া! আর আমি ভাবলাম না জানি কি! অন্ধকারে দেখা আর আলোয় দেখার মধ্যে এতটাই পার্থক্য!'

ভূতুড়ে ঘটনাটার রহস্য ভেদ হয়ে যেতে মুসাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ওপরে তাকাতে ছাতের ভাঙা কাঁচের দিকে চোখ পড়ল রবিনের। 'সর্বনাশ! মথগুলো সব বেরিয়ে যাচ্ছে তো!'

টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখে কিশোর বলল, 'তাই তো! বন্ধ করা দরকার ওটা! নইলে সব বেরিয়ে যাবে...'

'কিন্তু করব কি দিয়ে?'

খুঁজতে লাগল কিশোর। বাদামী রঙের একটা জিনিসের ওপর আলো পড়ল। মেঝেতে পড়ে আছে একটা বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। ঠেলেঠুলে ওটাই ঢুকিয়ে দিল ফোকরটাতে। ফোকর পুরোপুরি বন্ধ হলো না, ফাঁক রয়েই গেল, তবে মথ বেরোনোর মত বড় নয়।

সূত্র খুঁজতে শুরু করল ওরা। ভুল করে কোন কিছু ফেলে যেতে পারে চোর। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। অবশেষে সামনের দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর। তার পেছনে অন্য দুজন। দরজার কাছাকাছি এসে আলো নিভিয়ে দিল সে।

'এদিক দিয়ে বেরিয়ে ম্যাটের খপ্পরে গিয়ে পড়ব না তো আবার?' ভয় পাচ্ছে রবিন।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। ভাল করে উঁকি দিয়ে দেখল বাইরের আঙিনায় কেউ আছে কিনা। কাউকে চোখে পড়ল না। ডালডার কটেজটা এখনও আগের মতই অন্ধকার।

'না, কেউ আছে বলে তো মনে হয় না,' সাবধানে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলল সে।

পাল্লা ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল ঘণ্টা! বিকট শব্দ করে বাজতে থাকল। আচমকা এই ঘটনা বিমূঢ় করে দিল ওদের।

'বার্গলার অ্যালার্ম!' বিড়বিড় করল রবিন। ভুলে গিয়েছিল ঘণ্টার কথা।

সবার আগে সামলে নিল কিশোর। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে দৌড় দিল আঙিনা ধরে। সবার পেছনে বেরোল মুসা। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। আশা করেছিল পাল্লা বন্ধ হলেই থেমে যাবে ঘণ্টা। থামল না। একই ভাবে বেজে চলল।

একটা চিৎকার শোনা গেল। পরক্ষণে ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

ফিরেও তাকাল না কিশোর। তার একমাত্র লক্ষ্য মাঠের ওপাশের বেড়া।

যত তাড়াতাড়ি পৌছতে পারবে ওখানে ততই মঙ্গল।

কেউ ধরে ফেলার আগেই বেড়ার কাছে পৌছল ওরা। বেড়া ডিঙিয়ে চলে এল অন্যপাশে। রাস্তা ধরে দৌড় দিল।

থামল ঘন্টার শব্দ। নিশ্চয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গ্রীনহাউসের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে দৌড় থামাল ওরা। ভীষণ হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে দেখছে কেউ পিছু নিল কিনা।

কিশোর বলল, 'আমরা ঢোকাতেই যে ঘন্টাটা বেজেছে এটা কোনভাবে মিস্টার ডালডাকে জানানো দরকার।'

'কি ভাবে জানাবে? ফোন করা যায়,' রবিন বলল।

'দরকারটা কি জানানোর,' মুসা বলল।

'না জানালে অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন,' বলল কিশোর।

সুতরাং মিসেস বেনসনের বাড়িতে ঢুকেই আগে ডালডার বাড়িতে ফোন করল সে। ধরল তাঁর ফোরম্যান ম্যাট। কিশোর নিশ্চিত, তার নাম বললে মনিবকে ডেকে দেবে না লোকটা, তাই মিথ্যে কথা বলতে হলো। তারপরেও ডালডাকে ডেকে দিতে অনেক সময় নিল ম্যাট।

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

'ও থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ,' শুনে বললেন বিজ্ঞানী। 'এদিকে কোন অসুবিধে নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই বন্ধুর দিকে ফিরে বলল কিশোর, 'ওই ম্যাট লোকটাকে আমার ভাল মনে হচ্ছে না। ওর ওপর নজর রাখা দরকার।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'ব্যাটার ভাবভঙ্গিই জানি কেমন। ভাব দেখায়, কতই ভাল চায় মনিবের, ওদিকে রাতদুপুরে গ্রীনহাউসের কাঁচ ভেঙে দিয়ে আসে মথ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'ইচ্ছে করে নাও ভাঙতে পারে,' রবিন বলল। 'হয়তো মই বেয়ে উঠে দেখতে গিয়েছিল ভেতরে সব ঠিক আছে কিনা। তখন কোনভাবে ভেঙেছে কাঁচ, ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে।'

'তাহলে অমন দৌড়ে পালাল কেন? মনে হলো ভূতে তাড়া করেছে!'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'ভয় পাওয়া মানুষের মতই ছুটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

ওর দিকে তাকাল রবিন, 'কে ভয় দেখাল, বলো তো? চোরে? তা হলে তো পাহারাদার হিসেবে ম্যাটকে একটা পুরস্কার দিয়ে দেয়া উচিত, চোর দেখেই যে অমন করে লেজ তুলে পালায়। হাহ্ হাহ্! এমনও হতে পারে, চোরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে, দুজনেই কিছু একটা শয়তানী করছিল, এই সময় কাঁচ ভাঙে। ভয় পেয়ে তখন ঝেড়ে দৌড় মারে দুজনেই।'

'যাই ঘটুক, ম্যাট ডগলাসের ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের।'

অনেক রাত হয়েছে। মিসেস বেনসনের ঘরের আলো নেভানো। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওরাও ঘুমাতে চলল।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বেনসন, 'কাল রাতে কখন ফিরলে?'

'উঁম!' অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে বলল কিশোর, 'অনেক রাতে।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ওই তো, মিস্টার ডালডার ফার্মে। মথ দেখার উপযুক্ত সময় নাকি রাতের বেলা...'

পোকামাকড়ের কথা শুনলেই সিঁটিয়ে যান মিসেস বেনসন। তাড়াতাড়ি ওই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চাকরিতে যাচ্ছ তো আজ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। খেয়েদেয়ে এখনই রওনা হব।'

সাত

ওয়াকার ফার্মে এসে ওদের তিনটে ঘোড়া খুলে নিয়ে চেপে বসল তিন গোয়েন্দা। চলে এল আন্ডারওয়াটার সেকশনে। রিপোর্ট করল ফোরম্যানের কাছে।

লম্বা, বয়স্ক একজন লোক ফোরম্যান এমবার। ওরা পরিচয় দিতেই সামান্য মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'তোমাদের কথা ডিরেক্টর আমাকে জানিয়েছেন।' হাত নেড়ে খাটো, রোমশ একজন লোককে ডাকল, 'কেন্ট, এদিকে এসো তো।'

গোড়ালি ঢাকা বুটের গট গট শব্দ তুলে এগিয়ে এল কেন্ট। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করল তিন গোয়েন্দাকে। শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন?'

'এই ছেলেগুলোকে তোমার আন্ডারওয়াটার সেকশনে কাজে লাগাও। আমি কদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, এদের দায়িত্ব তোমার। কি কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দাও।'

চলে গেল ফোরম্যান।

ভুরু কুঁচকে তিন গোয়েন্দাকে দেখল কেন্ট, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'তিনটে শিশুকে দিয়ে তাহলে কাজ করাতে হবে আমার?'

রাগ চেপে হাসল কিশোর, 'শুধু বলে দিন কি করতে হবে আমাদের। আশা করি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব আমরা।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে বড় বড় একসারি ধাতব ট্যাংক দেখাল কেন্ট, পানিতে অর্ধেক ভরা, 'ওগুলোতে কেমিকেল মিশিয়ে গাছ জন্মানো হয়। গাছের সঙ্গে আগাছাও জন্মে। ওসব সাফ করো।'

কাপড়-চোপড় খুলে কাজের পোশাক পরে ট্যাংকে নামল তিন গোয়েন্দা। কিনারে বসে দেখতে লাগল কেন্ট।

মুসা জানতে চাইল, 'কোনটা আগাছা আর কোনটা গাছ?'

জবাব দিল না লোকটা। না শোনার ভান করে থাকল।

শুরুতেই বুঝেছে কিশোর, ওদের অপছন্দ করেছে কেন্ট, সুতরাং ওই লোকের কাছ থেকে সাহায্যের আশা নেই। কোন প্রশ্ন করল না সে। হাত বাড়িয়ে যা পেল তাই টেনে ছিঁড়তে শুরু করল।

'অ্যাই, অ্যাই,' চিৎকার করে উঠল কেন্ট, 'গাছ ছিঁড়ছ কেন?'

'কই, আমি তো আগাছা তুলছি।'

'ভাল গাছ ছিঁড়ছ!'

'তুলছি তো আগাছা ভেবেই। চিনিয়ে না দিলে বুঝব কি করে কোনটা গাছ আর কোনটা আগাছা?'

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল কেন্ট। কিশোর আবার গাছ ছেঁড়ার জন্যে হাত বাড়াতেই ধমকে উঠল, 'বেরোও! বেরিয়ে এসো ওখান থেকে! তোমাদের দিয়ে কাজ হবে না বুঝে গেছি...'

'কাজ তো আপনিই করতে দিচ্ছেন না। যেহেতু আমরা নতুন, কোনটা গাছ আর কোনটা আগাছা চিনিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব।'

'কাজ বোঝো না আবার মুখে মুখে তর্ক! দাঁড়াও, ম্যানেজারকে বলছি, তারপর বুঝবে মজা,' বুটের শব্দ তুলে গটমট করে চলে গেল সে।

'ব্যাটা হারামির হাড্ডি!' সেদিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'আসলে আমাদের কাজ করতে দিতে চায় না,' রবিন বলল।

'কাজ বন্ধ কোরো না,' কিশোর বলল। 'আগাছা যেগুলোকে মনে হবে, তুলতে থাকো. ম্যানেজার যদি আসে যেন দেখে আমরা বসে নেই। আগাছার জায়গায় ভুল করে গাছ তুললে সেটা আমাদের দোষ নয়, ম্যানেজারকে বোঝাতে পারব।'

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও ফিরল না কেন্ট।

কাজ করতে করতে মুসা বলল, 'কি একখান পচা কামে লাগিয়ে দিয়ে গেলরে বাবা! পচা পানিতে এই ট্যাংকের মধ্যে থাকতে থাকতে শেষে না চামড়াই পচে যায়!'

সারাদিনে আর ফিরল না কেন্ট। একনাগাড়ে কাজ করল তিন গোয়েন্দা। একটা ব্যাপার বুঝে গেছে কিশোর, কেন্টের সামনে ওরা আগাছাই তুলছিল, ভুল করে ভাল গাছ তোলেনি; সেটা বুঝতে পেরে অহেতুক ভয় দেখিয়ে টেনশনে রাখার জন্যে ম্যানেজারকে ডেকে আনার হুমকি দিয়ে চলে গেছে।

বিকেলে ডিউটি শেষ করে ফিরে চলল ওরা। পথের পাশের পুকুরটার দিকে তাকাল মুসা। সেই বকটা এখনও আছে। সকালে যাওয়ার সময়ও দেখে গিয়েছিল। মনে হয় পুকুরের পাড়েই কোন গাছে বাস করে ওটা।

বোর্ডিং হাউসে ফিরে দেখল বাগানে সব্জি তুলছেন মিসেস বেনসন। ওদের কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখে অবাক। 'কি চাকরি নিলে? শুয়োরের খোঁয়াড়ে কাজ করাল নাকি?'

'খোঁয়াড় নয়, আগাছার ট্যাংক,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আপনি

যতটা ভাবছেন ততটা খারাপ নয়।'

'খারাপ না হয়েই এই অবস্থা! যাও যাও, জলদি গোসল সেরে এসো। খাবার রেডি।'

খাবার টেবিলে ওদের কি কাজ করতে হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বেনসন। শুনে বললেন, 'যা দিনকাল পড়েছে, আরামের দিন শেষ। পেটের ধান্দায় দিনরাত খেটে মরতে হয় মানুষকে, তাও ঠিকমত পয়সা আসে না।'

কথায় কথায় জানতে পারল গোয়েন্দারা, মিসেস বেনসনেরও ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। স্বামী মারা গেছে কয়েক বছর আগে। তারপর থেকেই অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। ভীষণ টানাটানি। বাধ্য হয়ে এই বাড়ি, গোলাঘর আর একটুকরো বাগান বাদে বাকি যা জায়গা ছিল বিক্রি করে দিয়েছেন।

'জায়গার টাকা দিয়ে কি করবেন?' জানতে চাইল রবিন। 'অনেক টাকা পেয়েছেন নিশ্চয়?'

'কই আর পেলাম,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন মহিলা। 'মাত্র এক হাজার ডলার দিয়েছে। বাকিটা বলেছে কিস্তিতে দেবে। ব্রেক হেবল নামে এক লোকের কাছে বিক্রি করেছি। আজ দেব কাল দেব করে করে খালি ঘুরাচ্ছে। প্রথম কিস্তিই দেয়নি এখনও।'

'তাই নাকি?' বার্গার চিবুতে চিবুতে মুখ তুলল মুসা। 'কি বলে?'

'কিছুই বলে না। বলে, টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে ওরও। জোগাড় করতে পারলেই দিয়ে দেবে।'

'সেটা আপনি শুনতে যাবেন কেন?' কিশোর বলল, 'টাকার জন্যেই তো বেচেছেন। ওর টানাটানি থাকলে ওই বা কিনতে এল কেন? আপনি সোজা বলে দেন, টাকা দিলে দিক, নয়তো অন্যের কাছে বেচে দেবেন।'

'আমি আসলে মুখের ওপর কাউকে কিছু বলতে পারি না...'

'বেশ, তাহলে আমরাই আদায় করে দেব আপনার টাকা,' মুসা বলল।

শঙ্কিত হলেন মিসেস বেনসন, 'না না, অহেতুক ঝগড়াঝাঁটি করতে যেয়ো না। ওরও টাকার ঠেকা বলেই তো দিচ্ছে না। দেখি না আর কটা দিন।'

'আমার মনে হয় বদলোকের পাল্লায় পড়েছেন আপনি, মিসেস বেনসন,' কিশোর বলল। 'সহজে ওই লোক আপনার টাকা দিতে চাইবে না। সোজা আঙুলে ঘি তুলতে পারবেন না।'

'জায়গাটা নিয়ে কি করছে সে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এখনও কিছু করছে না।'

'তাহলে জায়গা কিনেছে কেন? বাড়ি করবে?'

'আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, খামার করতে চায়। কিন্তু লোকজনের অভাবে কিছু করতে পারছে না। আজকাল অল্প পয়সায় লোক পাওয়াও বড় কঠিন। লোকেই বা কি করবে। কাজ করলে যদি খাওয়ার পয়সাই জোগাড় না হয় করবে কেন।'

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছেন যেন বেনসন। অন্য কথায় চলে গেলেন।

খাওয়ার পর বাগানে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। মাঠের ওপারে কটেজটার দিকে তাকাল কিশোর। ওই জায়গাটাই হেবলের কাছে বিক্রি করেছেন মিসেস বেনসন।

'লোকটা কৌতূহল জাগাচ্ছে আমার,' কিশোর বলল।

'আমারও,' বলল রবিন। 'জায়গাতে কিছু যদি না-ই করে, কিনল কেন?'

'গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত,' মুসা বলল। 'চলো, যাই।'

'মিসেস বেনসন চান না আমরা ওকে টাকার জন্যে চাপাচাপি করি।'

'টাকা চাইব না। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে তো কোন দোষ নেই।'

তা বটে। রওনা হলো ওরা। মাঠ পেরিয়ে এসে দেখে কটেজের ছোট্ট বারান্দায় বসে আছে একজন লোক। ছেলেদের দেখে সোজা হয়ে বসল। চোখে সন্দেহ।

'মিস্টার হেবল?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল হেবল। মধ্যবয়েসী লোক, চৌকোনা চোয়াল, হাত আর গলার রগ ফুলে আছে। বলল, 'হ্যাঁ, আমি হেবল। কি চাই তোমাদের?'

'শুনলাম, ফার্ম করার জন্যে কাজের লোক পাচ্ছেন না...' চুপ হয়ে গেল কিশোর। ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক।

ওরা যেমন অবাক হয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল, ওদের দেখে লোকটারও ভুরু কুঁচকে গেল।

'কেন্ট!' অস্ফুট স্বরে বলল রবিন।

'কি ব্যাপার? এখানে কি চাই তোমাদের?' শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল কেন্ট।

জবাব দিল হেবল, 'কাজের লোক নেব কিনা জানতে এসেছে।'

'এদের নেবে? আর মানুষ পেলে না! ওয়াকার ফার্মে চাকরি নিয়েছে ওরা। কাজকর্ম কিচ্ছু বোঝে না, চরম বেয়াদব।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'কি? এখানে কাজ চাইতে এসেছ কেন আবার? ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে নাকি ম্যানেজার?'

আর সহ্য করতে পারল না মুসা। ফুঁসে উঠল, 'কেন, করার কথা নাকি? লাগিয়েছেন নাকি তার কানে?' মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে, এটা ওয়াকার ফার্ম নয়, উল্টোসিধে বললে সোজা ধরে মার লাগাবে 'কেন্টের বাচ্চাকে'।

ব্যাপারটা বোধহয় আঁচ করতে পারল কেন্ট। মুসার হাতের পেশীর দিকে তাকিয়ে খারাপ কথা বলার সাহস করল না আর। হেবলকে বলল, 'ওরা উঠেছে কোথায় জানো? মিসেস বেনসনের ওখানে।'

'তাই নাকি!' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠল হেবল, 'যাও, ভাগো এখান থেকে! নিশ্চয় টাকা চাইতে পাঠিয়েছে আমার কাছে! যখন পারি তখন দেব, বলে দিও তাকে। যাও, গেট আউট!'

আট

মিসেস বেনসনের অনুমতি নিয়ে টাকা চাইতে আসেনি, অপমানটা তাই সহ্য করে কটেজের কাছ থেকে সরে এল তিন গোয়েন্দা।

তিক্ত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'দারুণ সব লোককে জায়গা দিয়েছেন মিসেস বেনসন!'

'শয়তানগুলোর ঘাড় না মটকানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই!' ফুঁসতে লাগল মুসা। ট্যাংকে নেমে আগাছা তোলার কষ্টের কথা ভুলতে পারেনি এখনও।

এত সকাল সকাল বোর্ডিং হাউসে ফিরতে ইচ্ছে করল না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এল ডালডা ফার্মের কাছে। আলো থাকতে থাকতে খামারটার চারপাশে ঘুরে দেখবে।

'কি দেখতে চাও?' মুসার প্রশ্ন।

'কাল রাতে চোর এসেছিল জানা কথা,' জবাব দিল কিশোর। 'কোনদিক দিয়ে পালাল বোঝা দরকার। মাঠের নরম মাটিতে তার জুতোর ছাপ আছে কিনা দেখব...'

কথা শেষ হলো না তার। পায়ের নিচে কেঁপে উঠল মাটি। থরথর করে কাঁপতে লাগল আশপাশের গাছগুলো।

'খাইছে! ভূমিকম্প!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

সামনের দিকে মুখ তুলে তাকাল রবিন। 'ওদিকে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। পাহাড় কাটার জন্যে ডিনামাইট ফাটাল কিনা কে জানে!'

তবে এই মাটি কাঁপা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না ওরা। ডালডা ফার্মের চারপাশ ঘুরে দেখল। পেছনের মাঠে আর কোন জুতোর ছাপ নেই, কেবল ওদের তিনজনেরগুলো বাদে।

ডালডা বা আর কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

এরপর কি করবে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

কিশোর বলল, 'তদন্তে এখন পর্যন্ত কোন উন্নতি হলো না। কিছুই করতে পারলাম না।'

'করার সুযোগই বা পেলাম কোথায়,' বলল রবিন। 'চিলের নজর রাখে ম্যাট, ওর জ্বালায় কি কিছু করার জো আছে? কিশোর, আজ রাতেও ঢোকার ইচ্ছে নাকি তোমার?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, আর তেমন কিছু দেখার নেই। এ ভাবে চুরি করে ঢুকে লাভও হবে না। সূত্র খুঁজতে হলে দিনের বেলা যেতে হবে, ম্যাটকে সরিয়ে দিয়ে যা করার করতে হবে। ওর সামনে কিছু করতে পারব না।'

'তা তো বুঝলাম,' বলল মুসা, 'এখন কি করব আমরা? বোর্ডিং হাউসে

ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

জবাব দিতে পারল না কিশোর কিংবা রবিন।

শেষে মুসাই বলল, 'এক কাজ করি, চলো, ওরিঙটনে চলে যাই। আইসক্রীম খাব।'

জায়গাটা তিন গোয়েন্দার পরিচিত। আগে যখন এসেছিল, কয়েকবার গেছে আইসক্রীম খাওয়ার জন্যে। চমৎকার আইসক্রীম কেক বানায় ওখানকার একটা দোকানে।

বেশি দূরে না ওরিঙটন। যেখানে আছে ওরা সেখান থেকে বড়জোর সিকি মাইল। ছোট্ট একটা গ্রাম। কয়েক ঘর বসতবাড়ি, একটা মোটর মেকানিকের গ্যারেজ, একটা জেনারেল স্টোর, একটা পোস্ট অফিস আর একটা আইসক্রীম পারলার আছে।

দোকানে ঢুকতে লম্বা একটা ছেলের ওপর চোখ পড়ল, ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। টুলে বসে সোডা খাচ্ছে। শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকিয়েই প্রায় হাঁ হয়ে গেল।

'আরে, তোমরা এখানে!' লাফ দিয়ে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

তিন গোয়েন্দাও অবাক হয়েছে।

'ডন, তুমি!' দ্রুত এগিয়ে গেল মুসা।

ওর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ছেলেটা। ওর নাম ডন ব্লেনটন। রকি বীচে একই স্কুলে পড়ত ওরা। তবে ডন পড়ত ওপরের ক্লাসে। ফুটবল খেলত খুব ভাল। সেজন্যেই মুসার সঙ্গে খাতির বেশি। আর মুসার সঙ্গে খাতির মানে কিশোর আর রবিনেরও বন্ধু হয়ে যাওয়া।

'দেখা তাহলে হয়েই গেল,' কিশোর আর রবিনের সঙ্গেও হাত মেলাল ডন। 'কল্পনাই করিনি এখানে তোমাদের দেখা পাব। ওহ্, কতদিন পর!'

'আমরাও ভাবিনি,' রবিন বলল।

'তারপর কি মনে করে? নিশ্চয় আইসক্রীম খেতে?' শেষ কথাটা মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ডন।

হেসেই মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কি কাণ্ড দেখো!' ডন বলল। 'একেই বলে কাকতালীয় ঘটনা। তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। আর একেবারে সশরীরে এসে হাজির তোমরা!'

'কেন, আমাদেরকে আবার কি দরকার পড়ল?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একটা রহস্য ভেদ করার জন্যে।'

'রহস্য?' হালকা ভাবটা চলে গেছে কিশোরের কণ্ঠ থেকে।

'একটা বিপদে পড়েছি। তোমাদের সাহায্য দরকার।'

দোকানের এককোণে সরে গিয়ে বসল চারজনে, যাতে ওদের কথা আর কারও কানে না যায়। আইসক্রীমের অর্ডার দিল ডন। সাফ বলে দিল, সে-ই খাওয়াবে, দামটা তিন গোয়েন্দার কারও দেয়া চলবে না।

'এবার আসল কথা বলো,' কিশোর জানতে চাইল, 'বিপদটা কি তোমার?'

অহেতুক কাশি দিল একবার ডন। কোনখান থেকে শুরু করবে ভাবছে। বলল, 'স্কুল ছাড়ার পর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়ে ভর্তি হলাম। এখনও ওখানেই আছি। গরমের ছুটি তো এখন, ভাবলাম, বসে না থেকে একটা চাকরি করি। কিছু টাকা আসবে হাতে।'

'এখানেই কোথাও কাজ করছ নাকি?'

'হ্যাঁ. রাস্তার কাজ। মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে। আসার সময় দেখেছ না ডিয়ারভিলে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'দেখেছি।'

'চাকরিটা ভাল। কাজের দিক থেকে কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু বিপদটা হয়েছে অন্যখানে।'

'খুলে বলো সব,' তাগাদা দিল কিশোর।

কনস্ট্রাকশনের জন্যে জিনিসপত্র অর্ডার দেয়া আর দেখে রাখা আমার দায়িত্ব। এটা তেমন কোন কাজ না। কেউ যদি একটু সতর্ক থাকে, আর হিসেব করতে জানে তাহলেই এ কাজ সহজে চালিয়ে যেতে পারে।'

'তাহলে গোলমালটা কোথায়?'

উদ্বিগ্ন দেখাল ডনকে, 'জিনিস চুরি যাচ্ছে!'

'চুরি যাচ্ছে?'

'সেরকমই মনে হয়। আমার হিসেবের খাতায় দেখি জিনিস আছে, অথচ গুদামে গিয়ে দেখি নেই। খাতায় লেখা, পেয়েছি, কিন্তু গুদামে দেখি অর্ধেক আছে। বাকিগুলো গেল কোথায়?'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'হুঁ, ব্যাপারটা সিরিয়াস!'

'আমার জন্যে খুব খারাপ, কারণ দায়িত্বটা আমার। জিনিসগুলো দিতে না পারলে আমাকে ধরবে কর্তৃপক্ষ। চাকরি তো যাবেই, জেলও হয়ে যেতে পারে...'

'কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না তোমার কথা,' রবিন বলল।

'না, করবে না। কনট্রাক্টরকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।'

'কাউকে সন্দেহ হয় তোমার?' জানতে চাইল মুসা।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ডন। 'নাহ্! কাকে সন্দেহ করব? তা ছাড়া জিনিসগুলো আদৌ চুরি হচ্ছে কিনা সেব্যাপারেই তো শিওর হতে পারছি না। দু'একজন শ্রমিক আছে যাদের পছন্দ করি না আমি, কিন্তু তাই বলে ওদেরকে চোর ভাবতে পারছি না—চুরি করতে দেখিনি, প্রমাণ করতে পারব না।'

বাইরে ভারী ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ হলো। আইসক্রীম পারলারের সামনে দিয়ে গিয়ে জেনারেল স্টোরের সামনে থামল বিশাল গাড়িটা। নেমে এল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে সবই দেখা গেল।

ডন বলল, 'ওই দেখো বলতে না বলতেই এসে হাজির। যে দুজনকে

ভাল মনে হয় না আমার, তাদের একজন। ওর নাম আয়ান ফক্স।'

ভাল করে তাকাল তিন গোয়েন্দা। লোকটা বিশালদেহী, পেটের কাছটায় অনেক মোটা, কালো চুল, ফোলা গাল দেখে মনে হয় রাগ করে গাল ফুলিয়ে আছে।

'তোমাদের ওখানে কি করে ও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'লরি চালায়?'

'হ্যাঁ,' লোকটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ডন। 'কিন্তু এখানে কি জন্যে এসেছে ও? এখন ওয়ার্কিং আওয়ার শেষ, খুব জরুরী কাজ না থাকলে কোম্পানির গাড়ি বের করা নিষেধ।'

কি মনে হতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'দেখে আসি, কি আছে ট্রাকে।'

ডনও উঠল। 'চলো, আমিও যাব।'

'না, তোমার আসার দরকার নেই। তোমাকে ট্রাকের ভেতর উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলে সন্দেহ করে বসবে। চোর হলে সাবধান হয়ে যাবে তখন।'

বসে পড়ল আবার ডন। রবিনও রইল। কেবল মুসা চলল কিশোরের সঙ্গে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কিশোর, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে স্টোরের মালিকের সঙ্গে কথা বলছে আয়ান। বিশাল পিঠটা এদিকে ফেরানো।

মুসাকে নিয়ে দ্রুত সরে এল কিশোর। ট্রাকের কাছে এসে মুসাকে দোকানের দিকে নজর রাখতে বলে নিজে উঠে পড়ল পেছন দিকটায়। তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কোন জিনিস।

টান দিয়ে তেরপলের একটা কোনা তুলে দেখল সে। এক কয়েল তামার তার। আর কিছু নেই। আর কিছু দেখারও নেই। তেরপলটা আবার আগের মত করে রেখে লাফ দিয়ে নিচে নামল কিশোর। মুসাকে নিয়ে ফিরে চলল আইসক্রীম পারলারে।

'কিছু দেখলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এক কয়েল তার। এতে তেমন কিছু প্রমাণ হয় না। ট্রাকের মধ্যে জিনিস থাকতেই পারে।'

কিন্তু ডন শুনে অবাক। কুঁচকে গেল ভুরু। 'তামার তার! এ সময়ে কে দিল তাকে এই জিনিস?'

'কেন, এখন ট্রাকে থাকার কথা নয়?' রবিনের প্রশ্ন।

'মোটেও না! কনস্ট্রাকশনের সব জিনিস থাকে গুদামে। প্রয়োজন হলে ওখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় কাজের জায়গায়।' উঠে দাঁড়াল ডন। 'ওকে জিজ্ঞেস করা দরকার।'

নয়

বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে—যাতে আয়ান বুঝতে না পারে, তিন গোয়েন্দাও

ডনের সঙ্গে চলল।

স্টোর থেকে বেরিয়ে ট্রাকের দিকে এগোচ্ছে আয়ান।

ডাক দিল ডন, 'ফক্স, শোন তো।'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ডনকে দেখে লোকটা চমকে গেল বলে মনে হলো ওর।

ডন জিজ্ঞেস করল, 'এ সময় ট্রাক বের করেছ কেন? কি আছে ট্রাকে?'

'কিছু না। আমি শহরে যাচ্ছি।'

ট্রাকের পেছনে উঠে পড়ল ডন। তেরপল তুলে তারের কয়েল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বললে কিছু নেই, এগুলো এল কোত্থেকে? এখানে তো অনেক টাকার তার।'

চোয়াল ডলল আয়ান। ডন এ ভাবে ট্রাকে উঠে দেখবে, ভাবতে পারেনি বোধহয়। ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল যেন।

ধমক দিয়ে বলল ডন, 'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'এমন করে ধমকাচ্ছ যেন আমি একটা চোর! আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে তো। দোকান থেকে জিনিস এনে আবার সেটা ফিরিয়ে দিতে যাওয়াটা কি অপরাধ?'

'মানে? ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ কেন? প্রচুর তার লাগে আমাদের।'

'লাগে,' অনেকটা সামলে নিয়েছে আয়ান। 'এই কয়েলটাতে আছে মোটে একশো ফুট। থাকার কথা একশো পঞ্চাশ। আনার সময় ব্যাপারটা লক্ষ করিনি। আনার পর দেখলাম দোকানদার ভুল করেছে। গিয়ে বললে না-ও বিশ্বাস করতে পারে, তাই কয়েলটাই নিয়ে যাচ্ছি ওকে দেখানোর জন্যে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডন। আয়ানের জবাব মুখ বন্ধ করে দিয়েছে তার।

'বেশ,' অবশেষে বলল সে, 'নতুন যেটা আনবে, কাল সকালে মেপে দেখব আমি। পুরো দেড়শো ফুট চাই।'

'ব্যাপারটা কি, অ্যাঁ?' রেগে গেল আয়ান। 'তুমি কি ভাবছ আমি চোর? কম দেখে আমি যাচ্ছি ঠিক করে আনতে, তার জন্যে প্রশংসা তো দূরের কথা আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে!'

'ব্যস, হয়েছে, যাও এখন,' ঘুরে দাঁড়াল ডন।

পেছন থেকে গজগজ করতে লাগল আয়ান, 'ব্যস বললেই হয়ে গেল? একটা ছেলে এসে আমাকে ধমক-ধামক মারবে, চোর বলবে, আর আমি সেটা সহ্য করব? কিছুতেই না! কোনমতেই না...'

মুসা আর রবিনকে নিয়ে পারলারের দিকে সরে গেল কিশোর। কাছে এসে ডন বলল, 'শুনলে তো ওর কথা? আর তো ওকে সন্দেহ না করে পারছি না। কি করব, বলো? আমার ধারণা ওই তার চুরি করে এনেছে, কিন্তু সেটা প্রমাণ করব কি ভাবে?'

'গল্পটা বানিয়েছে ভালই। উপস্থিত বুদ্ধি আছে।'

'চোরের উপস্থিত বুদ্ধি থাকেই,' রাগ করে বলল মুসা।

'ব্যাটার মেজাজও বড় খারাপ,' বলল রবিন। 'চোরের মার বড় গলা!'

'তা হলে বুঝতেই পারছ কি বিপদে পড়েছি,' ডন বলল। 'অন্যে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে জিনিস, অথচ দায়টা এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। চোরকে হাতেনাতে বমাল ধরতে না পারলে কিছু করতেও পারব না। নিয়েও যাচ্ছে দামী জিনিসগুলো। এই তারের কয়েলটার কথাই ধরো না, অনেক দাম। অনেকেই কিনতে আগ্রহী হবে। বিক্রি করাটা কিছুই না।'

কিশোর বলল, 'বিক্রি করার জন্যে না-ও চুরি করতে পারে।'

অবাক হলো ডন। 'তাহলে চুরি করছে কেন?'

'তামার তার তো, নানা কাজে লাগে, হয়তো তেমন কোন কাজে লাগানোর জন্যে ওটা চুরি করা হয়েছে। এ ধরনের তার কিনতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে দোকানির নজরে পড়ে যেতে পারে, সন্দেহ হতে পারে দোকানদারের, তাই ওসব ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে সবচেয়ে সহজ কাজটা করেছে—চুরি।'

'এ কথা আমার মাথায় আসেইনি। তোমার বিশ্বাস ওরকম কিছুই ঘটছে?'

'আমার সন্দেহের কথাটা কেবল বললাম।'

'কি করতে চাও এখন?'

'গুদামের ওপর নজর রাখতে হবে।'

'এখনই যেতে চাও? চলো, আমার গাড়ি আছে।'

ডনের গাড়িতে করে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। একটা খেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলো চোখে পড়ল মুসার। পলকের জন্যে। কৌতূহল হলো তার। কিশোরকে বলল।

আগের দিন সাগর সৈকতে দেখা আলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। ডনকে বলল, 'একটু সামনে নিয়ে রাখো তো গাড়িটা। আলো নিভিয়ে দাও। কিসের আলো দেখতে চাই।'

'কেন? খেতের মধ্যে আলো জ্বলাটা এমন কোন রহস্যময় ব্যাপার নয়...'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, ডন, একটা রহস্যের তদন্ত করতেই এসেছি আমরা এখানে।'

'কি রহস্য?'

'পরে বলব তোমাকে।'

আর কৌতূহল দেখাল না ডন। কিশোরের কথামত গাড়ি রাখল। সে বসে রইল গাড়িতে। নেমে গিয়ে খেতের যেখানে আলো দেখা গেছে সেদিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি আলো দেখলে? কই, আর তো জ্বলছে না?'

'কিন্তু আমি দেখেছি,' জোর দিয়ে বলল মুসা।

'আলোটা কেমন?'

'সাইকেলের পেছনে লাল রঙের গ্লাস রিফ্লেক্টরে হেডলাইটের আলো

পড়লে যেমন ঝিক করে ওঠে, সেরকম।'

'হুঁ। চলো, আরেকটু এগিয়ে দেখি।' অন্ধকারে এগিয়ে লাভ নেই, কিছু চোখে পড়বে না। টর্চ জ্বালল কিশোর। কিছুদূর এগিয়ে নিচের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। নরম মাটিতে সরু একটা দাগ।

'ঠিকই দেখেছ তুমি মুসা, অনুমানটাও একদম ঠিক,' দাগের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর, 'সাইকেলই।'

রবিনও দেখছে দাগটা। মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে বলল, 'ডালডার বাড়ির দিকে গেছে।'

'চলো দেখি, সাইকেলওলাকে ধরতে পারি কিনা?' টর্চ নিভিয়ে আবার পা বাড়াল কিশোর। নজর সামনের দিকে।

ডালডার অফিসে আলো জ্বলে উঠল। দরজা খুলে গেল। দরজায় এসে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী। সামনের আঙিনায় সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একজন মানুষকে। মুখ দেখা গেল না বলে তাকে চিনতে পারল না গোয়েন্দারা। সাইকেল নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা।

ঢোকার সময় মুখে আলো পড়তে তাকে চিনে ফেলল কিশোর, 'ম্যাট ডগলাস!' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'অন্ধকারে খেতের মধ্যে কি করতে গিয়েছিল সে?'

'লোকটাকে আমার প্রথম থেকেই ভাল মনে হয়নি,' রবিন বলল। 'ওর কথাবার্তা, আচরণ, সবই সন্দেহজনক। অন্ধকারে সাইকেল নিয়ে বেরোনোটা দোষের নয়, কত কাজই থাকতে পারে মানুষের। আমার প্রশ্ন, ভাল রাস্তা থাকতে উঁচুনিচু খেতের মধ্যে ঝাঁকুনি খাওয়ার সাধ হলো কেন ওর?'

গাড়িতে ফিরে এসে ডন কোন প্রশ্ন করার আগেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা আজ সন্ধ্যায় কি ডিনামাইট ফাটানো হয়েছে?'

'না তো! কেন?'

মাটি কেঁপে ওঠার কথা জানাল কিশোর।

'ভূমিকম্প! বলো কি!' এতটাই অবাক হলো ডন, প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'কই, আমি তো কিছু টের পাইনি! সন্ধ্যার পর থেকে আর কাউকে বলতেও শুনলাম না যে ভূমিকম্প হয়েছে।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা দোলাল কিশোর, 'বড় ধরনের কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়!...নাও, চালাও, যেখানে যাচ্ছিলাম যাই।'

দশ

আরও কিছুটা এগোনোর পর মূল রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা রাস্তায় নামল ডন। কিছুদূর এগোতে চোখে পড়ল রাস্তা তৈরির সরঞ্জাম। নতুন যেখানে কাজ

করা হচ্ছে, তার কাছে এনে গাড়ি রাখল সে।

গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই বলে উঠল মুসা, 'অ্যাই, শুনছ!'

কান পাতল সবাই। অন্ধকারে একটা মুহূর্ত কিছুই শুনল না। তারপর কানে এল চাপা গোঙানির মত শব্দ। তার সঙ্গে একধরনের কাঁপা কাঁপা খটখটানি।

'জলদি চলো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'বিপদে পড়েছে কেউ! নিশ্চয় কোন কিছুতে বাড়ি মেরে সঙ্কেত দিচ্ছে!' আজ আর টর্চ আনতে অনীহা দেখায়নি। কোমর থেকে খুলে নিয়ে আলো জ্বেলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পাশের নিচু অঞ্চলে। নিচু বেড়া পার হয়ে দৌড় দিল খেতের দিকে।

খানিকটা খোলা জায়গা পার হয়ে, আরেকটা বেড়া ডিঙিয়ে একটা খেতে ঢুকল। আর কোন শব্দ নেই। কান পেতে শুনতে লাগল। তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে অন্য তিনজন। বাতাসে দুলছে খেতের গাছ। তার মৃদু খসখস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ আবার শোনা গেল গোঙানি। পরক্ষণে ধাতব খটখট। কমতে কমতে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

কোন দিক থেকে এসেছে, আন্দাজ করে ফেলেছে মুসা। গমখেতের ভেতর দিয়ে, সাবধানে গাছগুলোকে যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। সামনে ফুটে উঠল একটা বিশাল মানুষের মত মূর্তি, দু'হাত দুই পাশে ছড়ানো।

চট করে আলো নিভিয়ে দিল সে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসতে গিয়ে কিশোরের গায়ে ধাক্কা খেল। কিশোরের টর্চের আলো পড়ল মূর্তিটার গায়ে।

'ধুর!' হেসে ফেলল মুসা, 'কাকতাড়ুয়া পুতুল! এটা দেখেই এত ভয় পেলাম!'

'ওই যে বলে না, মনের বাঘে খায়,' রবিন বলল, 'তোমার মাথায় তো সর্বক্ষণ ভূতের চিন্তা...'

'ভয় নাহয় পুতুল দেখে পেলাম। কিন্তু গোঙাল কে?'

পুতুলটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। আশপাশে আলো ফেলে দেখল।

এই সময় বয়ে গেল একঝলক জোরাল বাতাস। গোঙানি শোনা গেল। খটখট শব্দটাও হলো আবার।

পুতুলের গায়ে আবার আলো ফেলল কিশোর। ভাল করে দেখল। পুতলটার হাতে ঝুলছে একটা টিনের পাত্র। ভেতরে পাথর ভরা আছে বোঝা গেল। জোরে বাতাস লাগলে টিনের আশপাশের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় বিচিত্র গোঙানির মত শব্দ তোলে বাতাস, দুলে ওঠে টিন, ভেতরের পাথরগুলো গড়াগড়ি খায়, খটখট শব্দ করে। ভয় দেখিয়ে শস্য খাওয়া পাখিকে দূরে রাখার জন্যেই এই শব্দের ব্যবস্থা।

'এই হলো কাণ্ড,' রবিন বলল, 'আর আমরা ভাবলাম কে জানি বিপদে পড়ে মরছে।'

পুতুলটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। পাজামার বাঁ পায়ের

দিকে চোখ। 'এ জিনিসটা এখানে মানায় না। ডন, দেখো, কিছু বুঝতে পারো কিনা।'

পায়ের ভেতর থেকে ভারী একটা জিনিস টেনে বের করল সে। তুলে ধরল আলোর সামনে। মুসা, রবিন আর ডনও দেখল। একটা ড্রিল মেশিন, মোটরে চলে, পাথর ছিদ্র করা কিংবা ফাটানোর কাজে ব্যবহার হয়।

হাঁ হয়ে গেল ডন। 'এটা এখানে এল কি করে! এ তো আমাদেরই জিনিস মনে হচ্ছে!'

'এখানে এনে ড্রিল লুকানোর প্রয়োজন পড়ল কার?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'মূল্যবান সূত্র এটা,' কিশোর বলল।

'কিন্তু লুকাল কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন,' ডন বলল। 'কাজ শেষ করে যাওয়ার আগে যার যার যন্ত্রপাতি সব জমা দিয়ে যায় আমার কাছে। আলমারিতে তালা দিয়ে রাখি আমি। সকালের আগে আর বের করার প্রয়োজন পড়ে না।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল। 'এখন আমার মনে হচ্ছে জিনিস চুরির সঙ্গে এরও কোন সম্পর্ক আছে। প্রথমে তারের কয়েল, তারপর এই ড্রিল মেশিন···এক কাজ করো, যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দাও। দরকার হলে সারারাত লুকিয়ে থেকে পাহারা দেব আমি আজ। দেখব এটা কে নিতে আসে।'

'তোমার সঙ্গে আমরাও থাকব,' মুসা বলল।

'লাগবে না। এটা আমার দায়িত্ব। তবে চাইলে একটা উপকার করতে পারো। আমার এক বন্ধু থাকে গাঁয়ে, একই ঘরে থাকি আমরা। সে-ও আমার সঙ্গে চাকরি করে। তাকে গিয়ে বলতে পারো, সে যেন এসে আমাকে পাহারা দিতে সাহায্য করে। গাড়ি নিয়ে চলে যাও।'

'মুসা আর কিশোর যাক,' রবিন বলল। 'ততক্ষণ একজন অন্তত থাকি তোমার কাছে। ইতিমধ্যে দেখা যাক কিছু ঘটায় কিনা তোমার রহস্যময় চোর। কিশোর, কি বলো?'

ঘাড় কাত করল কিশোর। ডনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার বন্ধুর? এখনও ভেবে দেখো, ওকে আনার দরকার আছে নাকি?'

'আছে,' ডন বলল। 'তোমাদেরকে বেশি খাটাতে চাই না। চুরির রহস্য ভেদ করার জন্যে সাহায্য চেয়েছি তোমাদের কাছে, সেটাই করো। এই কাজটা আমাকে করতে দাও। তা ছাড়া গাঁয়ে এমনিতেও যাওয়া দরকার, খিদে পেয়েছে, কিছু স্যান্ডউইচ আর দুধ নিয়ে আসতে বোলো ওকে।'

'কি নাম তোমার বন্ধুর?'

'হ্যারিস ফার্গুসন।' কোথায় থাকে, ঠিকানা বলে দিল ডন।

রওনা হয়ে গেল কিশোর আর মুসা।

আলো নিভিয়ে দিয়ে বেড়ার একটা খুঁটির কাছে এসে বসল ডন আর রবিন। কয়েক মিনিট পর ডনের গাড়ির হেডলাইট জ্বলতে দেখল। গাঁয়ের

দিকে চলে গেল গাড়িটা।

আরও কয়েক মিনিট পর পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তে আলো দেখতে পেল রবিন। সরু যে রাস্তাটা পাহাড়ে চলে গেছে আলো জ্বলছে সেই রাস্তার ওপর। উত্তেজিত হয়ে উঠল। আলোটা জ্বলছে-নিভছে।

'শিওর সঙ্কেত দিচ্ছে!' ফিসফিস করে বলল সে। 'দেখা দরকার!'

নিভে গেল আলোটা। ডন আর রবিন রওনা হতেই আবার দেখা গেল। কিছুটা কাছে যাওয়ার পর দেখল ওরা লম্বা, মাথাঢাকা আলখেল্লার মত পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, একটা টর্চ মাথার ওপর তুলে ধরে নাড়ছে এপাশ ওপাশ।

'বললাম না সঙ্কেত দিচ্ছে!' আবার বলল রবিন। 'ব্যাটাকে ধরতে হবে!'

দৌড় দিল সে।

বোধহয় তার কথা কানে গেছে লোকটার, কিংবা দৌড়ের শব্দ শুনেছে, মুহূর্তে আলো নিভিয়ে দিল।

দৌড়ে চলল রবিন আর ডন। ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে পথ। উঁচু-নিচু হয়ে আছে মাটি। পাথরও আছে। লোকটা যেখানে ছিল সেখানে এসে দেখল কেউ নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতল পদশব্দের আশায়।

নীরব রাত। কানে এল শুধু খাড়া পাহাড়ের দেয়ালে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ।

এগিয়ে চলল দুজনে। ঢালের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। আর এগিয়ে লাভ নেই। ওদের দেখে গা ঢাকা দিয়েছে লোকটা।

আর লুকোচুরির প্রয়োজন নেই। টর্চ জ্বেলে পাহাড়ের ওপরে, আশপাশে যতখানি সম্ভব দেখল রবিন। কোন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ল না।

'লুকিয়ে পড়েছে!' বিড়বিড় করল রবিন।

'বেশিদূর যেতে পারেনি,' ডন বলল। 'আরও দেখা দরকার।'

দুজনে আলাদা হয়ে গিয়ে খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু পেল না লোকটাকে। একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। নৌকায় করে পালায়নি তো? চূড়ায় দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল রবিন, আতিপাতি করে খুঁজল তার চোখ, কিন্তু কোন ধরনের একটা জলযান দেখতে পেল না।

'শিওর কাউকে সঙ্কেত দিয়েছে সে। হয় আসতে বলেছে, নয়তো চলে যেতে বলেছে।'

রবিনের কথায় ভাবনাটা মাথায় এল ডনের। 'আমাদের দেখে দেয়নি তো?'

'মানে?'

'ওই ড্রিল মেশিন! লোকটা জানত, ওর আলো দেখামাত্র ছুটে আসব আমরা ধরার জন্যে। আর এটাই সে চেয়েছে।'

'পুতুলের কাছ থেকে আমাদের সরিয়ে দেয়ার জন্যে! ঠিক বলেছ তুমি, এটাই করেছে!'

ঢাল বেয়ে দৌড়ে নেমে সরু রাস্তা ধরে ছুটে এল ওরা। আবার ঢুকল

শস্যখেতে। আবছা অন্ধকারে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মূর্তিটাকে। বাতাস লেগে টিনে ভরা পাথর বাজছে খটাখট খটাখট।

কাছে এসে টর্চ জ্বালল রবিন। পাজামার বাঁ পা না তুলেও বুঝতে পারল, ড্রিল মেশিনটা নেই।

এগারো

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় এলেন মিস্টার ডালডা। তাঁকে ডাইনিং রুমে বসিয়ে এসে ওদের খবর দিলেন মিসেস বেনসন।

তাড়াহুড়া করে খাওয়া সেরে ডাইনিং রুমে এল ওরা।

গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন ডালডা। ক্লান্ত লাগছে তাঁকে। খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন মনে হচ্ছে।

'কিছু হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী, 'আবার চোর ঢুকেছিল।'

'কখন?'

'কাল রাতে,' হতাশ কণ্ঠে বললেন ডালডা। 'কিছু বুঝতে পারছি না। এ ভাবে পাহারা দিয়ে রাখার পরও আমার মথগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে।'

'চোর কি করে ঢোকে কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?'

আবার মাথা নাড়লেন বিজ্ঞানী। 'আজ সকালেও যখন গ্রীনহাউসে ঢুকেছি, সব ঠিক ছিল দেখেছি আমি।'

'আসলে ভেতরে ঢুকে ভাল করে একবার তদন্ত করা দরকার আমাদের,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এখন পর্যন্ত তো দেখতেই পারলাম না ঠিকমত। চোরের মত ঢুকতে হয়েছে আমাদের। ভাল করে দেখতে পারলে আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে এমন কোন না কোন সূত্র চোখে পড়বেই আমাদের।'

চমকে গেলেন ডালডা। 'না না, তোমরা ওভাবে যেয়ো না! তাতে ম্যাট জেনে যাবে তোমরা তদন্ত করছ।'

'চুরি যেখানে হচ্ছে সেখানে ঢুকতেই যদি না পারি তো তদন্ত করব কিভাবে?'

'চুরির তদন্ত করতে গেছ, এ কথা বলে ঢোকার দরকারটা কি? একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। শোনো, দেখো পছন্দ হয় কিনা। মাঝে মাঝে এক ধরনের সার মেশানো মাটির অর্ডার দিই আমি ওয়াকার ফার্মে, তোমরা যেখানে কাজ করছ। আজও দিতে পারি। ওদের অনুরোধ করতে পারি তোমাদের দিয়ে যেন ওই মাটি পাঠানো হয়। কাস্টোমারের অনুরোধ ফেলতে পারবে না ওরা।'

রবিন আর মুসার দিকে তাকাল একবার কিশোর। ডালডার দিকে ফিরে

বলল, 'বুদ্ধিটা ভালই।'

ঘড়ি দেখলেন ডালডা। 'এবার আমাকে যেতে হয়। অনেকগুলো মথ খোয়া গেছে। কি করে যে ক্ষতিটা পূরণ করি...'

'মিস্টার ডালডা, একটা কথা সরাসরিই জিজ্ঞেস করতে চাই, ম্যাট ডগলাসকে কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

একটা ধাক্কা খেলেন যেন বিজ্ঞানী। 'তুমি বলতে চাইছ ও মথ চুরি করছে? অসম্ভব। ওকে বিশ্বাস করি আমি। কাজের লোক। ওকে ছাড়া আমি চলতেই পারব না...' থেমে গেলেন তিনি। কিশোরের দিকে তাকালেন, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'ওর আচরণ মাঝে মাঝে বড় উদ্ভট ঠেকে।'

কয়েক সেকেন্ড ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডালডা। মুখ নামিয়ে বললেন, 'ম্যাট কোন অসৎ কাজ করছে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ওকে সন্দেহ করা বাদ দাও।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আর একটাও কথা না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেদের গুড-বাই জানাতেও ভুলে গেছেন। আনমনে মাথা নেড়ে পা টেনে টেনে এগিয়ে গেলেন তিনি গেটের দিকে। তাঁর জন্যে দুঃখ হলো ছেলেদের।

কাজের সময় হয়ে গেছে। ওয়াকার ফার্মে রওনা হলো ওরা। আন্ডারওয়াটার সেকশনে পৌঁছতেই ওদের দেখে এগিয়ে এল কেন্ট। কঠিন স্বরে বলল, 'তোমাদেরকে বদলি করে দেয়া হয়েছে।'

ওর ভঙ্গি দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কাল ঠিকমত আগাছা তুলিনি বুঝি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেন্ট, 'অন্য আরেকটা জায়গার জন্যে লোক চাওয়া হয়েছে। বাড়তি লোক আর নেই, তাই তোমাদেরকেই পাঠাতে হবে। ঘাস আর পদ্ম নিয়ে গবেষণা করা হয় ওখানে। রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও। একশো গজ গেলেই সাইনবোর্ড দেখতে পাবে।'

সরে গেল কেন্ট।

ফিরে তাকালে দেখতে পেত ওরা একটা ট্যাংকের আড়াল থেকে ওদের দিকে চেয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসছে লোকটা।

'সব শয়তানির মূলে সে!' ফুঁসে উঠল মুসা।

'পারলে চাকরিটাই খেয়ে দিত,' কিশোর বলল। 'সে ক্ষমতা তো নেই, তাই যতটুকু আছে ততটুকুই খাটাচ্ছে। বদলি করে দিয়ে মন্দ করেনি। পানির খেত তো দেখলাম কাল, চলো এখন ঘাস আর পদ্মের অবস্থা দেখিগে।'

এই সেকশনের ফোরম্যান কেন্টের মত পাজি নয়। হাসিখুসি একজন লোক। নাম বেনওয়ার্থি। ওকে দেখেই বুঝতে পারল ছেলেরা, ওর কাছে টিকতে পারবে, যদি কাজটা অতিরিক্ত পরিশ্রমের না হয়।

'তাহলে তোমরা আমার নতুন সহকারী, অ্যাঁ? গুড,' হেসে বলল বেন। 'চারজন চেয়েছিলাম, তিনজন পাঠিয়েছে...ঠিক আছে, চলবে এতে। কাজ

করার আগে এসো, দেখে নাও কোন জায়গায় কাজ করতে হবে।'

ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল সে। চারকোনা টুকরো টুকরো জমিতে নানা রকম ঘাসের চাষ করা হয়েছে। বেশির ভাগই গরু-ঘোড়ার খাবার। দুর্লভ পদ্মফুলের চাষ করা হয়েছে ছোট ছোট পুকুরে।

গর্বভরে সেসব দেখাতে লাগল বেন। একধরনের বিচিত্র ফুলের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওগুলো খুব দুর্লভ জিনিস। এই এলাকার কোথাও দেখতে পাবে না।'

'কি ধরনের পদ্ম ওটা, মিস্টার বেনওয়ার্থি?' জানতে চাইল রবিন।

'এর নাম আফ্রিকান লিলি। মজার ব্যাপার হলো, নামে পদ্ম হলেও আসলে পদ্মফুল নয় ওটা, আর আফ্রিকা থেকেও আসেনি। বছরের একটা বিশেষ সময়ে গন্ধটাও হয় ভয়াবহ।'

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসল বেন। 'আফ্রিকার পবিত্র পদ্মও বলে অনেকে। কিন্তু পরাগায়নের সময় পবিত্র তো দূরের কথা, অপবিত্র বললেও কম বলা হবে। এর দুর্গন্ধ তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অথচ এই দুর্গন্ধটা না থাকলে এই ফুলের বংশবৃদ্ধিই ঘটত না।'

'বুঝিয়ে বলুন না?' অনুরোধ করল কিশোর।

'পচা মাংসের গন্ধ বেরোয় তখন এই ফুল থেকে। গন্ধ পেয়ে উড়ে আসে বড় বড় মড়িখেকো মাছি। ফুলের ওপর গিয়ে বসে। যখন বোঝে ওটা পচা মাংস নয়, ফুল, তখন উড়ে যায় আরেকটা ফুলের দিকে। তবে ততক্ষণে ওর পায়ে ফুলের রেণু লেগে গেছে।'

বুঝে ফেলেছে কিশোর, 'এ ভাবে এ ফুল থেকে সে-ফুলে ঘুরতে ঘুরতে পরাগায়ন ঘটিয়ে দেয় মাছির দল। দারুণ মজার ব্যাপার তো!'

'হ্যাঁ, উদ্ভিদ বটে একটা।'

আরও মজার মজার ফুল আছে এই সেকশনে। এতই মজা পেল তিন গোয়েন্দা, কাজ করতে করতে সকালটা যে কোনদিক দিয়ে উড়ে চলে গেল টেরও পেল না। প্রচুর পরিশ্রম করল, কিন্তু তবু কাজটাকে কাজই মনে হলো না। লাঞ্চের পর আবার কাজে হাত দিয়েছে এই সময় অফিসে ডেকে পাঠালেন ম্যানেজার।

'তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে,' বললেন তিনি। 'মাটিতে সার মেশানো হয় যেখানে, সেখানে চলে যাও। কিছু মাটি দরকার মিস্টার আলমন্ড ডালডার। তোমাদেরকে ওগুলো তাঁর ফার্মে পৌছে দিতে হবে। যেখানে যেখানে মিশিয়ে দিতে বলেন, দিয়ে আসতে হবে। পারবে না?'

'পারব,' বলতে একমুহূর্ত দ্বিধা করল না কিশোর।

'গুড। যাও, ওয়্যাগনে ভরাই আছে মাটি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ফুলের পুকুরে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছিল, মিস্টার ডালডার পরিকল্পনা মাফিক কাজ হবে তো? হয়েছে। তাঁর কাজ তিনি করেছেন, এখন বাকিটা ঠিকমত সারতে পারাটা ওদের দায়িত্ব।

ঘোড়া জুতে রাখা হয়েছে ওয়্যাগনে। বসার জায়গায় উঠে বসল ওরা। তিনজনের জায়গা হয় না। গাদাগাদি করে বসতে হলো।

ডালডা ফার্মের গেটে দেখা হয়ে গেল ম্যাটের সঙ্গে। কিন্তু ওয়্যাগন ভর্তি মাটি দেখে কোন সন্দেহ করতে পারল না, কিংবা করলেও বাধা দিতে পারল না। নির্বিবাদে ভেতরে ঢুকতে দিতে হলো ওদের।

'মাটি নিয়ে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন তোমাদের মিস্টার ডালডা। কোথায় কোথায় ফেলতে হবে দেখিয়ে দেবেন। কোনই প্রয়োজন ছিল না এখন মাটির, কেন যে আনালেন··· যাকগে, তিনি মালিক। যা বলবেন মানতে হবে।'

খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন ডালডা। চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন। 'তোমরা সেই তিনজন না সেদিন যারা আমার রেশমপোকা দেখতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার, আমরাই,' জবাব দিল কিশোর।

'আশ্চর্য! কয়েকটা ছেলেকে পাঠাল ওরা। কেন, বড় মানুষের কি অভাব পড়েছে ওয়াকার ফার্মে?' হতাশ ভঙ্গিতে গজগজ করলেন ডালডা। ভাল অভিনয় করছেন বুড়ো, হাসি পেল মুসার, চেপে গেল।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি, 'পাঠিয়েই যখন দিয়েছে, তোমাদের দিয়েই কাজটা সারাতে হবে···ইয়ে করো, গ্রীনহাউসের পেছনে ওই ওদিকটায় নিয়ে গিয়ে সব মাটি ঢালো। তারপর দেখিয়ে দেব কোন কোন জায়গায় দিতে হবে।'

চমৎকার ভাবে ঘটে যাচ্ছে সব কিছু। কোন্ রকম সন্দেহ করতে পারল না ম্যাট। ওখানে আর থাকার প্রয়োজন মনে করল না সে। সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল একটা বড় গ্রীনহাউসের দিকে।

মুচকি হাসলেন ডালডা। ছেলেদের বললেন, 'এবার যত খুশি তদন্ত চালাও, যাও।'

'কাল রাতে যে চুরিটা হলো, সেব্যাপারে নতুন কিছু জেনেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নাহ্। দেখো, তোমরা কিছু পাও কিনা। পাবে বলে মনে হয় না।'

কাজে লেগে গেল তিন গোয়েন্দা। গ্রীনহাউসের পেছনে এক জায়গায় সমস্ত মাটি ঢেলে ফেলে, খানিকটা করে তুলে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল গ্রীনহাউসের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায়। ইচ্ছে করে দেরি করতে লাগল। নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল। ভাল একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন ডালডা। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও চোর ঢোকার পথ আবিষ্কার করতে পারল না।

'কোন কাঁচ ভাঙেনি, বার্গলার অ্যালার্ম বাজেনি,' অবশেষে কিশোর বলল, 'অথচ মথগুলো ঠিকই গায়েব হয়ে গেছে। সত্যি অবাক কাণ্ড! বুঝতে পারছি না কিছু!'

মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে লাথি মেরে সরিয়ে দিল রবিন।

চোখ পড়ল কিশোরের। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ডালটার দিকে তাকিয়ে থেকে তুলে নিল। ভাল করে দেখে বিড়বিড় করল, 'অদ্ভুত!'

এগিয়ে এল মুসা আর রবিন। অদ্ভুতটা কি বোঝার চেষ্টা করল।

প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ একটা ডাল বলে মনে হয়, কিন্তু ভাল করে তাকালে দেখা যাবে একমাথায় একটা গর্ত।

'এটা কি কোন সূত্র বলে মনে হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সেরকমই তো লাগছে,' ডালটার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। 'প্রথম কথা, গ্রীনহাউসের ভেতরে এই ডাল পড়ে থাকার কথা নয়। আর দ্বিতীয় কথা…এই গর্ত…'

পকেট থেকে দেশলাই বের করল। কাঠি জ্বেলে ধরল গর্ত হওয়া মাথাটার কাছে।

বারো

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন। আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'দামী সূত্র হলে ওটা পুড়ে ফেলছ কেন?'

'চিন্তার কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'পুড়ছি না। আর পুড়তে চাইলেও আমার মনে হয় না এভাবে এটাকে পোড়ানো যাবে।'

ওর কথায় আরও অবাক হলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাকিয়ে রয়েছে ডালটার দিকে।

নিভে গেল কাঠিটা। আরেকটা জ্বেলে ডালের মাথার কাছে ধরল কিশোর। এই কাঠিটাও পুড়ে শেষ হলো। আগুন ধরল না ডালে।

'বলেছি না, পোড়ানো যাবে না,' বলল সে। 'এমন কিছু করা হয়েছে এটাতে, যাতে এর গায়ে আগুন না ধরে।'

কিশোরের রহস্যময় কথা বুঝতে পারল না দুজনে। রবিন বলল, 'একটা সাধারণ ডাল নিয়ে এ কাণ্ড করতে যাবে কে? কি লাভ তার? তোমার কথায় তো মনে হচ্ছে ডালের মাথার ওই গর্তটাও আপনাআপনি হয়নি।'

ডালটায় আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে লাগল কিশোর।

'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না,' ধীরে ধীরে যেন নিজেকেই বোঝাল সে, 'গর্তটা কোন মোমদানির মত? মোম বা এমন কোন দাহ্য পদার্থ এতে ভরে রাখা যায়, যেটাতে আগুন দিলে জ্বলতে থাকবে, অথচ ডালটা পুড়বে না।'

'নতুন ধরনের কোন মশাল!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন।

তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল কিশোর, 'আস্তে! হ্যাঁ, কোন ধরনের মশাল।'

'কিন্তু মথ গায়েবের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?' মুসার প্রশ্ন। 'আগুন দেখলে

সেদিকে উড়ে যায় পতঙ্গ। এই মশালের আগুন দেখিয়ে কি ওগুলোকে উড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। বাইরে আগুনের দিকে যেতে হলে আগে গ্রীনহাউস থেকে বেরোতে হবে ওগুলোকে। বেরোয় কি করে, সেটাই তো জানতে পারলাম না এখনও। এটার জবাব জানতে পারলে, আমার বিশ্বাস, আরও অনেক প্রশ্নের জবাব জানা হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, প্রশ্ন তো অনেক,' রবিন বলল। 'এই যেমন, কাল রাতে কে ঢুকেছিল গ্রীনহাউসে? কি করে ঢুকল...'

'ঘরের ইঁদুরে বেড়া কাটছে,' মুসা বলল, 'আমি বলে দিলাম, ভেতরের কোন লোক এই চুরির সঙ্গে জড়িত।'

'চলো, এটার কথা জিজ্ঞেস করিগে মিস্টার ডালডাকে,' কিশোর বলল। 'দেখি, তিনি কিছু বলতে পারেন কিনা?'

কিশোরের হাত থেকে ডালটা নিয়ে নিলেন বিজ্ঞানী। বললেন, 'এটা একটা অ্যানটিক। আমাদের এই অঞ্চল অনেক পুরানো এমন সব জিনিস মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে, দেখে তাক লেগে যায়। আগের দিনে চোর-ডাকাতের অভাব ছিল না এদিকে। গুহায় বাস করত অনেকে। তাদেরই কেউ নিশ্চয় আবিষ্কার করেছে এই মশাল।...ওই যে, ম্যাট আসছে! জলদি কাজ শুরু করে দাও!'

বিল্ডিঙের কোণে যেখানে ডালডার সঙ্গে কথা বলছে ওরা, সেখানেই মাটি ফেলতে আরম্ভ করল।

সরে গেলেন ডালডা।

খানিক পর কাজ শেষ করে ডালডা ফার্ম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রহস্যটার কোন কিনারা করতে পারল না। ডালটা একটা সূত্র হতে পারে, কিন্তু চোরের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক বুঝতে পারছে না।

'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ,' রবিন বলল, 'ডালটা আর আমাদের ফিরিয়ে দেননি, মিস্টার ডালডা।'

জবাব দিল না কিশোর। চুপচাপ চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

ওয়্যাগন চালাচ্ছে মুসা।

ওয়াকার ফার্মে ফিরতে ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। ওয়্যাগন রেখে, ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে বেঁধে, হেঁটে রওনা হলো ওরা বোর্ডিং হাউসে।

খাবার তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে ওদের অপেক্ষায়ই আছেন মিসেস বেনসন। হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ওরা।

কথায় কথায় আবার তাঁর জায়গা বিক্রির কথা উঠল।

'হেবল আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকাচ্ছে,' রবিন বলল, 'কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে।'

'কিন্তু তাকে তো আমার খারাপ লোক মনে হয় না,' আরেক দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস বেনসন। 'বার বার টাকা চাইতে যেতে লজ্জা লাগে আমার।'

'আপনার লজ্জা লাগলে আমাদের বলুন,' মুসা বলল, 'আমরা আদায় করে দেব।'

'কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না...'

'আসলে অতিরিক্ত নরম মন আপনার, মিসেস বেনসন। যে লোকের কাছে বেচেছেন,' কিশোর বলল, 'চাপ না দিলে টাকা দেবে না সে কিছুতেই।'

চুপ করে রইলেন মিসেস বেনসন।

খাওয়ার পর বসার ঘরে এসে বসল তিন গোয়েন্দা।

'ওই হেবল ব্যাটাকে ধরে কিলাতে পারলে মনের ঝাল মিটত আমার,' রাগ করে বলল মুসা।

'কিন্তু যার জায়গা,' রবিন বলল, 'তিনি অনুমতি না দিলে কিছুই করতে পারি না আমরা। পাত্তাই দেবে না আমাদের হেবল। যদি মুখের ওপর বলে দেয়—তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?—তাহলেও কোন জবাব থাকবে না আমাদের।'

'কিন্তু দুর্বল ভেবে একজনকে ঠকাবে সে, তাও হতে দিতে পারি না,' কিশোর বলল। 'এ অন্যায়। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে আমাদের। বুঝতে পারছি, মিসেস বেনসন আমাদের কিছু করতে বলবেন না।'

'চলো, যাই,' এ ব্যাপারে মুসার খুব উৎসাহ। 'দেখি কি করা যায়।'

রওনা হলো ওরা। মাঠ পেরিয়ে এসে ঢুকল কটেজের আঙিনায়। কাউকে চোখে পড়ল না। হেবল নেই নাকি? দরজায় থাবা দিল কিশোর। কেউ সাড়া দিল না। কোন রকম শব্দও নেই ভেতরে।

'ধাক্কা দিয়ে দেখো,' মুসা বলল।

তাই করল কিশোর। তবু সাড়া নেই। তবে ঘরের ভেতরে কোথাও খুট করে মৃদু একটা শব্দ হলো বলে মনে হলো ওদের।

সামনের একটা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল রবিন।

সাধারণ একটা ঘর। আসবাবপত্র তেমন নেই। কেউ নেই ঘরে। জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে সে, এই সময় দেখল মেঝের একটা অংশ নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করল, তিন বর্গফুট মত জায়গা।

ট্র্যাপ ডোর!

ঢাকনাটা আরেকটু উঠতে হেবলের মাথা দেখা গেল। সিঁড়ি বা মই বেয়ে উঠে আসছে সে।

ওপরে উঠে জানালায় রবিনকে উঁকি দিয়ে থাকতে দেখে ভীষণ চমকে গেল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল মেঝেতে উল্টে পড়ে থাকা ট্র্যাপ ডোরটার দিকে। বন্ধ করার জন্যে এগোতে গিয়েও থেমে গেল। আর বন্ধ করে লাভ নেই, যা দেখার দেখে ফেলেছে ছেলেটা।

'দাঁড়াও, আসছি,' চেঁচিয়ে বলল সে, গটমট করে এসে খুলে দিল দরজা। কোমরে হাত দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকাল, 'কি করছ এখানে? অন্যের বাড়িতে উঁকি মারছ কেন?'

'সেই কখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছেন না?' নিরীহ স্বরে বলল কিশোর। 'আমরা ভাবলাম আপনি বাড়িতে নেই···'

'সেলারে ছিলাম। দরজা ধাক্কানো শুনব কি করে?' ঘোঁৎঘোঁৎ করে বলল হেবল। 'কি জন্যে ডাকছিলে?'

কিশোর জানাল, কিস্তির পাওনা টাকা নিতে ওদেরকে পাঠিয়েছেন মিসেস বেনসন।

'আপনি নাকি বলেছেন নিজেই গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবেন,' বলল সে, 'কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল, একবারও যাননি। তাঁর ধারণা, কাজের ঝামেলায় ভুলে গেছেন আপনি। টাকাটা আমাদের কাছে দিয়ে দিতে বলেছেন।'

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল হেবল।

কিশোর ভাবল, এই বুঝি ধমকে ওঠে, বেরিয়ে যেতে বলে ওদেরকে ওর বাড়ি থেকে। ধমক দিল না। খসখসে গলায় বলল, 'ওহ্‌হো, মনেই ছিল না। কত পাবে সেটাও তো ভুলে গেছি। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আর সময় আছে নাকি আমার।'

মনের মত একটা জবাব এসে গিয়েছিল মুখে, জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল কিশোর। কত টাকা পাবেন মিসেস বেনসন, বলল।

'মিসেস বেনসনকে বোলো, কাল সকালে আমি নিজেই গিয়ে টাকা দিয়ে আসব। আর কাউকে পাঠানোর দরকার পড়বে না।'

'টাকাটা তিনি আমাদের কাছে দিয়ে দিতে বলেছেন,' শীতল কণ্ঠে বলল মুসা, 'এখনই।'

ধক করে জ্বলে উঠল হেবলের চোখ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মুসার দিকে, চোখের আগুনে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল যেন। চোখে চোখে তাকিয়ে রইল মুসা। সেও চোখ সরাল না।

দৃষ্টির লড়াইয়ে অবশেষে হেবলই পরাজিত হয়ে আচমকা গর্জে উঠল, 'কোন আক্কেলে যে জায়গাটা কিনতে গেছিলাম মহিলার কাছ থেকে! দুদিন যেতে না যেতেই পয়সা চায়। মেরেই ফেলবে আমাকে···দাঁড়াও, আনছি।'

ভেতরে চলে গেল সে। আপনমনে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে ট্র্যাপ ডোর দিয়ে নিচে নেমে যেতে দেখল ওকে রবিন।

'টাকাপয়সা যদি তেমন না-ই থাকে,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'মাটির নিচের ঘরে লুকিয়ে রাখে কেন?'

'যেখানে খুশি রাখুকগে,' মুসা বলল। 'এত সহজে যে দিয়ে দিচ্ছে সেটা হলো আসল কথা। দিতে রাজি হবে, ভাবিনি। আমি তো ভেবেছি টাকা আদায় করতে মারামারি করতে হবে।'

টাকা আনতে অনেক সময় লাগাল হেবল। একতাড়া নোট নিয়ে সেলার থেকে উঠে এল সে। ধীরে ধীরে গুণে কয়েকটা নোট টেনে বের করে বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'নাও। নিয়ে বিদেয় হও। হ্যাঁ, রশিদ এনেছ?'

'না,' টাকাটা হাতে পেয়ে গেছে কিশোর, এখন আর বলতে অসুবিধে নেই, 'আপনি যে দেবেন এত সহজে সেটাই ভাবিনি। চিন্তা করবেন না, রশিদ

দিয়ে যাব। আপনার মত কথার বরখেলাপ করব না। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

হেবলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। পিছু নিল মুসা আর রবিন। ফিরে তাকালে দেখত, কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে হেবল।

তেরো

টাকা আদায় হয়েছে শুনে অবাক হয়ে গেলেন মিসেস বেনসন। বিশ্বাসই করতে পারছেন না হেবল টাকা দেবে। বললেন, 'বলেছি না, লোক খারাপ না। টাকা ছিল না বলেই দিতে পারেনি এতদিন।'

তর্ক করল না কিশোর। বলল, 'নিন, গুণে নিয়ে একটা রশিদ লিখে দিন। দিয়ে আসব বলেছি।'

রশিদ লিখে দিলেন মিসেস বেনসন, 'এখনি দিতে যাবে বলেছ?'

'বলেছি।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। দুই সহকারীকে বলল, 'তোমাদের আর যাওয়ার দরকার নেই। আমি চট করে গিয়ে দিয়ে আসি।'

'যদি কোন বিপদ হয়?' মুসা বলল।

'বিপদ আর কি হবে? আসল ঝামেলাটা তো গেলই। খারাপ কিছু করলে তখনই করত, এখন আর করবে না। রশিদটা দিয়েই চলে আসব।' বেরিয়ে এল কিশোর।

মাঠ প্রায় পেরিয়ে এসেছে, এই সময় একটা গাড়ির আলো দেখল সে। হেবলের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে গাড়িটা। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। একটা লোক নেমে গিয়ে বারান্দায় উঠল।

চিনতে পারল কিশোর। কেন্ট।

দরজা খুলে দিল হেবল। ভেতরে চলে গেল কেন্ট।

সাবধান হয়ে গেল কিশোর। পা টিপে টিপে এগোল কটেজের দিকে। জানালার কাছে আসতেই শুনতে পেল চিৎকার করে বলছে কেন্ট, 'তুমি একটা গাধা! ওদের সামনে ট্র্যাপ ডোর দিয়ে নামলে কেন?'

ঘোঁৎঘোঁৎ করে কি বলল হেবল, বোঝা গেল না।

'এ কাজটা করা মোটেও উচিত হয়নি তোমার!' আবার ধমকে উঠল কেন্ট। 'আগেই বলেছি প্রয়োজনীয় যা কিছু ওপরের ঘরে রাখবে। কারও সামনে কোন জিনিসের জন্যে যাতে নিচে নামতে না হয়...'

জবাবে হেবল যা বলল, সেটা ভাল করে শোনার জন্যে পা বাড়াতে গেল কিশোর। কি যেন পড়ল পায়ের নিচে। মড়মড় করে উঠল।

ঝট করে ফিরে তাকাল কেন্ট। চিৎকার করে উঠল, 'কে, কে ওখানে!'

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল জানালার দিকে, 'ও, তুমি! আবার এসেছ! আড়ি পেতে শোনা হচ্ছিল, না?'

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে দেখিয়ে বলল, 'না, টাকার রশিদ দিতে এসেছি।'

বেরিয়ে এল কেন্ট। হাত চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল কিশোরকে। ধমক দিয়ে বলল, 'রশিদ না ছাই! একটা ছুতো করে কথা শুনতে এসেছ! কেন এসেছ, সত্যি করে বলো!!'

'বললাম তো, রশিদ দিতে।'

জোরে ধাক্কা দিয়ে কিশোরকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল কেন্ট। 'ব্রেক, দরজা লাগিয়ে দাও। ওর মুখ আমি খোলাচ্ছি। আজ কথা আদায় করেই ছাড়ব।'

দরজা লাগিয়ে দিল হেবল। 'উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না, কেন্ট।'

'করতে চাই না বলেই তো কথা বলতে বলছি ওকে,' জ্বলন্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল কেন্ট। 'হ্যাঁ, বলো এবার, ডিয়ারভিলে কেন এসেছ তোমরা?'

'বারে, কেন আবার, চাকরি করতে,' জবাব দিল কিশোর।

'খবরদার!' গর্জে উঠল কেন্ট। 'মিথ্যে বোলো না! তোমাদের পরিচয় আমি জেনে গেছি। তোমরা তিন গোয়েন্দা। তোমার নাম কিশোর পাশা। অন্য দুজনের একজনের নাম মুসা, আরেকজনের রবিন। কেউ তোমরা এত গরীব নও যে টাকার জন্যে খামারে কাজ করার দরকার হবে। অন্য কোন কারণ আছে। কেন এসেছ তোমরা, জলদি বলো!'

ওদের পরিচয় জানল কি করে কেন্ট, বুঝতে পারল না কিশোর। তবে অস্বীকার করে লাভ নেই। বলল, 'বেশ, আমি কিশোর পাশাই। গোয়েন্দা। তাতে কি?'

'তাতে অনেক কিছু!'

'সেই অনেক কিছুটা কি? গোয়েন্দা আর পুলিশকে ভয় পায় একমাত্র অপরাধীরা। খারাপ কিছু করে যারা। আপনারা কি তেমন কিছু করছেন?'

থমকে গেল কেন্ট। একটা মুহূর্ত জবাব আটকে গেল। তারপর মিন মিন করে বলল, 'তা নয়, তবে···আমরা খারাপ কাজ করতে যাব কেন?'

'তাহলে আমাদের ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা গোয়েন্দাই হই আর যাই হই, আপনাদের তো কিছু না। আপনি এত মাথা গরম করছেন কেন?'

জবাব খুঁজে পেল না কেন্ট।

তাকে সাহায্য করল হেবল, 'দেখো, আমাদের লুকানোর কিছু নেই, কারণ খারাপ কিছু করছি না। সারাদিন খেটে খেটে মাথা গরম হয়ে গেছে কেন্টের। তোমাকে উঁকি মারতে দেখে তাই আরও রেগে গেছে। ঘরের মধ্যে কাউকে উঁকি মারতে দেখলে রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক।'

ট্র্যাপ ডোর খোলা রাখা নিয়ে বোধহয় ধমকাচ্ছিল আপনাকে, কেন্ট,' যেন কথার কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ওটা নিয়ে ভয় পাওয়ার

তো কিছু নেই। যে কারও বাড়িতে সেলার থাকতে পারে, ওটা বেআইনী কিছু না।'

'তা তো বটেই,' বলল হেবল। 'টাকাও যদি সেলারে রাখি, সেটাও অন্যায় নয়। আমার টাকা আমি যেখানে ইচ্ছে রাখতে পারি, তাই না?'

'নিশ্চয় চোরের ভয়ে সেলারে রাখেন, তাই না? ব্যাংকে রাখলেই পারেন। ব্যাংক অনেক নিরাপদ।'

'নাহ্, ব্যাংকে রাখতে ইচ্ছে করে না আমার। শান্তি পাই না। হাতের কাছে টাকা থাকলে ভাল লাগে আমার। দরকার হলেই বের করে নেয়া যায়। ব্যাংক খোলার জন্যে বসে থাকতে হয় না।'

'ওর টাকা ও কোথায় রাখবে না রাখবে সেটা ওর ব্যাপার,' রেগে উঠল কেন্ট, 'তোমার এত কথা বলার কি দরকার? দেখো, গোয়েন্দাগিরি যদি করতেই হয়, রকি বীচে গিয়ে করোগে। এখানে নয়।'

'কে বলল এখানে আমরা গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি?'

আবার চুপ হয়ে গেল কেন্ট। জবাব দিতে পারল না।

এবারও বাঁচাল হেবল। কিশোরের দিকে হাত বাড়াল, 'কই দেখি, দাও রশিদটা।'

দিল কিশোর।

রশিদে টাকার অঙ্ক ঠিকমত লেখা আছে কিনা দেখল না হেবল, ভাল করে তাকালও না কাগজটার দিকে, কিশোরকে বলল, 'হুঁ, পেলাম। যাও এখন।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

কঠিন স্বরে কেন্ট বলল, 'আবার যদি এখানে উঁকি মারতে দেখি ভাল হবে না বলে দিলাম।'

দরজা খুলে দিল হেবল। কিশোরকে বের করে দেয়ার জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।

বোর্ডিং হাউসে ফিরে রবিন আর মুসাকে উত্তেজিত দেখল সে। ওকে দেখেই বলে উঠল রবিন, 'দেখো, কি পেয়েছি!'

একটা নোট। জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কোথায় পেলে?'

'এইমাত্র দিয়ে গেলেন মিসেস বেনসন। ডাকবাক্সে চিঠির সঙ্গে পেয়েছেন।'

'কি লেখা?' কাগজের টুকরোটা হাতে নিল কিশোর। তাতে লেখা:

নিজেদের বেশি চালাক ভেব না, তিন গোয়েন্দা। তোমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। ভাল চাও তো বাড়ি ফিরে যাও। আলমন্ড ডালডার কোন ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। যা বললাম ভেবে দেখো। এরপর আর সাবধান করব না। গ্রীনহাউসের আশেপাশে তোমাদের ছায়া দেখা গেলেও আর কোনদিন বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না বলে দিলাম।

মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি

বুঝলে?'

'আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে,' রবিন বলল।

'কেন্ট আর হেবলও জানে আমাদের পরিচয়।' কটেজে রশিদ দিতে গিয়ে যা যা ঘটেছে খুলে বলল কিশোর। 'কিন্তু এই নোট ওরা লেখেনি। গ্রীনহাউসে মথ চুরির ঘটনা ওদের জানার কথা নয়।'

'টেলিফোনে যে লোক মিস্টার ডালডাকে হুমকি দিয়েছিল মনে হচ্ছে সেই একই লোকের কাজ।'

'হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে সে আমাদের ভয় পাচ্ছে। তারমানে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা, কিংবা করতে চলেছি যাতে সে ভয় পেয়ে গেছে।'

'সেই কিছুটা কি?' মুসার প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে।'

'এমন হতে পারে,' রবিন বলল, 'গুদাম থেকে যে লোক চুরি করে সে চাইছে না চুরির তদন্ত হোক। আয়ানের কাজও হতে পারে।'

'তা পারে। ওই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে একবার দেখা দরকার, আজও মশাল জ্বেলে সঙ্কেত দেয় কিনা।'

বসে থাকতে ভাল লাগছে না মুসার। এত তাড়াতাড়ি ঘুমও আসবে না। বলল, 'চলো, এখনই যাই।'

'বসো, আগে ঠিক করে নিই কিভাবে কি করব। একটা ব্যাপার ভেবে দেখো, চূড়ায় দাঁড়িয়ে সৈকতের কাউকে সঙ্কেত দেয় লোকটা, সৈকত থেকে পাল্টা জবাব দেয়া হয়। তারমানে কমপক্ষে দুজন লোক থাকে—ওপরে একজন, নিচে একজন। দুজনকেই ধরা দরকার। তার জন্যে একই সময়ে দুই জায়গায় থাকতে হবে আমাদের, পাহাড়ে এবং সৈকতে। একজন পাহাড়ে যাব, আর দুজন সৈকতে। ওদিকে একাধিক লোক থাকার সম্ভাবনা।'

'বেশি হলে প্রশ্নই ওঠে না ধরার, আমাদেরকেই কাবু করে ফেলবে,' মুসা বলল। 'পাহাড়েও একজন গিয়ে একজনকে ধরা সম্ভব না। আরও লোক দরকার।'

'পাবে কোথায়?'

'পাব। ডন।'

'সে কি সঙ্গে যাবে?'

'আমার তো ধারণা খুশি হয়েই যাবে,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'তাকে রাজি করানোর ভার আমার। চলো, বেরোই।'

চোদ্দ

আকাশে মেঘ জমেছে। তারা নেই, চাঁদও অদৃশ্য। পাহাড়ের চূড়াগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে রাতের কালো আকাশের পটভূমিতে বিশাল সব দৈত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড় বাইছে মুসা। নৌকার মাঝখানে বসে চুপচাপ তীরের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সাগরের তীর ঘেঁষে চলে গেছে পাহাড়ের সারি। খানিক দূর দিয়ে চলেছে ওরা।

নৌকাটা জোগাড় করে দিয়েছে ডন। ঠিকই বলেছে মুসা, খুশি হয়েই সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে সে। শুনেই লাফিয়ে উঠেছে। সে আর রবিন চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। নৌকা নিয়ে কিশোর আর মুসা এসেছে সৈকতে পাহারা দিতে।

সামনে সৈকত দেখা গেল। খোলা সৈকতের কাছে রাখলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। একটা খাঁড়ি দেখে সেদিকে নৌকার নাক ঘুরিয়ে দিল মুসা। বড় একটা পাথরের চাঙড়ের আড়ালে নৌকা রাখল।

'কি করব এখন?' জিজ্ঞেস করল কিশোরকে।

'অপেক্ষা। বসে থাকব চুপ করে। দেখি কেউ আসে কিনা।'

বসে আছে তো আছেই ওরা। কিছু আর ঘটে না। আসছে না কেউ। মাঝে মাঝে মুখ তুলে একপাশের কালো পাহাড়টার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। এমন করে খাড়া উঠে গেছে, তাকালে গা ছমছম করে। রাতের বেলা বলেই বোধহয় এমন লাগছে।

হঠাৎ কনুই দিয়ে ওর গায়ে আলতো খোঁচা দিল মুসা।

কথার শব্দ কানে আসছে। সামনেই কোথাও খুব নিচু গলায় কথা বলছে দুজন লোক। কি বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে। এগিয়ে আসছে কণ্ঠস্বর।

খানিক পরেই একটা নৌকা দেখা গেল। দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে। টর্চ জ্বলে উঠল একটা। আশপাশের পানি আর ডাঙায় আলো ফেলল। তারপর নিভে গেল টর্চ।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাল কিশোর। কোন মশাল বা টর্চ জ্বলল না। কোন সঙ্কেত এল না কোনখান থেকে।

ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল নৌকাটা। বোঝা গেল, সৌখিন মৎস্যশিকারীরা মাছ ধরতে বেরিয়েছে।

এরপর আর কিছু ঘটল না। রাত অনেক। মেঘ কেটে গেছে। মধ্য আকাশ পেরিয়ে দিগন্তের অনেক কাছে চলে গেছে চাঁদ। রাত শেষ হয়ে আসছে।

আজ আর বোধহয় কিছু ঘটবে না। অহেতুক বসে থাকার মানে হয় না।

সকালে উঠে আবার কাজে যেতে হবে।

মুসাকে নৌকা চালাতে বলল কিশোর। নিজেও একটা দাঁড় তুলে নিল। রবিনকে বলা আছে, রাত তিনটের মধ্যে কিছু না ঘটলে বাড়ি ফিরে যেতে।

ওরা দুজনে ফিরে দেখল, আগেই এসে বসে আছে রবিন। জানাল, কিছু ঘটেনি পাহাড়ে। নির্দিষ্ট সময় উঠে বাড়ি রওনা হয়েছে সে, ডন চলে গেছে ওর বাসায়।

ঘন ঘন হাই উঠছে মুসার।

আর দেরি না করে শুতে চলল তিনজনে।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস বেনসন, 'কাল তো শেষ রাতে বাড়ি ফিরলে, অতক্ষণ ছিলে কোথায়? দেখো, আর আমার কাছে মিথ্যে কথা বোলো না। নিশ্চয় তোমরা কোন কেস নিয়ে এসেছ এখানে।'

এই ভয়ই করছিল কিশোর। মিথ্যে বলে আর লাভ নেই। মহিলার সন্দেহ তাতে আরও বাড়বে। বলল, 'তা ঠিকই ধরেছেন। তবে বিশেষ কারণে মক্কেলের নাম বলতে অসুবিধে আছে আমাদের...'

'মক্কেল কে, সেটাও আন্দাজ করতে পারছি। মিস্টার ডালডা, তাই না?'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিশোর, এই সময় ফোন বাজল। উঠে গিয়ে ধরলেন মিসেস বেনসন। ওপাশের কথা শুনে বললেন, 'হ্যাঁ আছে।' ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কিশোর, তোমার ফোন। মিস্টার ডালডা।'

হাতের চামচটা প্লেটে নামিয়ে রেখে উঠে গিয়ে ফোন ধরল কিশোর। 'হ্যালো।'

'কিশোর? আমি। কাল রাতে আবার অঘটন ঘটে গেছে।'

'সেই একই ব্যাপার?'

'হ্যাঁ। তবে অনেক বেশি নিয়েছে কাল রাতে। এতবড় চুরি আর হয়নি। আমার সবচেয়ে বড় আর ভাল মথগুলো নিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অনেকগুলো রেশমপোকা।'

'আমরা এখুনি আসছি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বর, 'ওই কাজও কোরো না! আমি তোমাদের ঢোকার কোন একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ঢুকবে না।'

কিশোরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

রিসিভারটার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আস্তে করে ওটা ক্রেডলে নামিয়ে রেখে টেবিলে ফিরে এল কিশোর।

'তাহলে যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই,' মিসেস বেনসন বললেন, 'মিস্টার ডালডাই তোমাদের মক্কেল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আসলে মক্কেলের কথা গোপন রাখাটা...'

'থাক, আর কৈফিয়ত দিতে হবে না,' বাধা দিলেন মিসেস বেনসন, 'আমি বুঝতে পারছি। মক্কেলের কথা অন্য কারও কাছে ফাঁস না করাই উচিত। হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল তোমাদের জন্যে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম আমি।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি। রাস্তায় বেশ কয়েকবার ট্রাক যাওয়া আসা করেছে। অনেক লোকের গলা শুনেছি। এ রকম সাধারণত হয় না এদিকে। কৌতূহল হওয়ায় উঁকি দিলাম। ব্রেক হেবলের পিকআপটাও যেতে দেখেছি। কি ঘটছে, বলো তো?'

জবাব দিতে পারল না কিশোর।

অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় নিয়ে ওয়াকার ফার্মে কাজ করতে চলল ওরা। বিশেষ করে গভীর রাতে হেবলের ট্রাক দেখা যাওয়া, আর সেলারে নামা নিয়ে হেবল আর কেন্টের উদ্বিগ্ন হওয়ার ব্যাপারটা।

'মাটির নিচের ঘরে কি আছে বলো তো?' প্রশ্ন করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল, 'কেন্টের ওপর নজর রাখতে হবে। হেবলের বন্ধু যখন, তার দিকেই চোখ রাখা উচিত।'

কিন্তু কেন্টের ওপর নজর রাখার সুযোগ পাওয়া গেল না। ঘাস আর পদ্ম বিভাগে ঢুকতেই ওখানকার ফোরম্যান বলল, ম্যানেজার বলে রেখেছেন এলেই যেন ওরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

সুতরাং ম্যানেজারের অফিসে রওনা হলো ওরা।

'ঘটনাটা কি বলো তো? এত জরুরী তলব?' মুসা বলল, 'আমাদের চাকরিটা খেয়ে দিল না তো কেন্ট!'

'গেলেই বুঝব,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

ম্যানেজারের অফিসে ঢুকতে যাবে, এই সময় দারোয়ান খবর দিল, একজন লোক ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে আবার এল?

গেটের দিকে এগোল ওরা।

বাইরে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে একজন লম্বা লোক। ওদের দেখে এগিয়ে এল। নিজের পরিচয় দিল রেড জোনাথন বলে। ডন যেখানে চাকরি করে ওখানকার নাইট গার্ড।

'ডিউটি সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছে ডন,' বলল সে। 'একটা খবর জানিয়ে যেতে বলেছে। কাল রাতে গুদাম থেকে অনেক মাল চুরি গেছে। কে যে নিল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এটা একটা খবর বটে গোয়েন্দাদের কাছে।

'গুদাম পাহারায় কে ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমি।'

'তা হলে? নিল কি করে?'

'আমার ধারণা আমাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল,' রেড বলল।

'খুলে বলুন।'

'বলার তেমন কিছু নেই,' নাকের ডগা চুলকাল রেড। 'টহল দিচ্ছি, এই সময় পচা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে...'

'কেমন পচা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ও বলে বোঝাতে পারব না। কুত্তাপচা গন্ধের চেয়েও ভয়াবহ। অবাক হলাম, হঠাৎ করে জানোয়ার পচল কি করে এখানে! খানিক আগেও ছিল না

গন্ধটা। ভাবলাম, কেউ বোধহয় পচা জানোয়ার ফেলে গেছে গুদামের কাছে। দেখতে গেলাম। অন্ধকার একটা কোণে যেতেই কে যেন পেছন থেকে জাপটে ধরে নাকে রুমাল চেপে ধরল। মিষ্টি একটা গন্ধ…তারপর আর কিছু মনে নেই।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এমন হতে পারে পচা গন্ধটা একটা টোপ। ওই গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আপনাকে অন্ধকার জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে চোর, তারপর ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু দিয়ে বেহুঁশ করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রেড, 'আমারও সেরকমই মনে হয়।' বিড়বিড় করে অচেনা চোরকে একটা গাল দিল সে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ধরতে পারলে হয় একবার…পালিয়ে যাবে কোথায়? হাতে পাবই একদিন না একদিন…'

এখন কাজের সময়, বেশিক্ষণ কথা বলার নিয়ম নেই। কি কি চুরি হয়েছে রেডের কাছ থেকে জেনে নিল কিশোর।

ম্যানেজারের অফিসে যেতে যেতে মুসা বলল, 'তার আর বিস্ফোরক দিয়ে কি করে ব্যাটারা?'

'কি জানি,' রবিন বলল, 'চুরি করে আরেকটা রাস্তা বানাচ্ছে বোধহয় কোথাও!'

ম্যানেজারের অফিসে ঢুকল ওরা। হাসিমুখে ওদের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'ঘাস-পদ্ম বিভাগের ফোরম্যানের কাছে তোমাদের প্রশংসা শুনলাম। তাই মনে হলো, কাজটার দায়িত্ব তোমাদের ওপরই দেয়া যাক।'

ড্রয়ার থেকে একটা ছোট শিশি বের করলেন তিনি। ভেতরে ছোট ছোট বীজ। সেগুলো দেখিয়ে বললেন, 'দেখতে এগুলো অতি সাধারণ মনে হলেও সাধারণ নয়। এর বয়েস জানো? পঞ্চাশ বছর। এগুলো রোপণ করতে হবে তোমাদের।'

'লাভ কি?' মুসা বলল, 'এত পুরানো বীজ থেকে কি আর চারা গজাবে?'

'আমার তো মনে হয় গজাবে।'

মুসার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। পঞ্চাশ বছরের বীজ থেকে চারা গজায় কি করে?

কিন্তু ম্যানেজার বললেন, গজাবে। 'উদ্ভিদের টিকে থাকার যে কি সাংঘাতিক ক্ষমতা, জানো না তোমরা। এগুলোর বয়েস তো মাত্র পঞ্চাশ বছর। মিশরের এক ফারাওয়ের কবরে পাওয়া গমের বীজ পুঁতে দেখা গেছে, সেটা থেকে চারা বেরিয়েছে। বোঝো। পাঁচ হাজার বছরের পুরানো বীজ থেকে চারা!'

'খাইছে!' হাঁ হয়ে গেল মুসা।

হেসে মাথা ঝাঁকালেন ম্যানেজার। 'হ্যাঁ, তাই।' শিশিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এগুলো থেকে চারা বের করার দায়িত্ব তোমাদের। নাও। এটাকে বাড়তি কাজ মনে করার কোন কারণ নেই। ডিউটির সময়ের মধ্যেই কোন এক ফাঁকে করবে। তোমাদের আসল কাজ ওখানেই, ঘাস আর পদ্ম বিভাগে। ফোরম্যান তো বলল, ওখানে কাজ করতে নাকি খুব মজা পাচ্ছ।'

'তা পাচ্ছি, স্যার,' রবিন বলল। 'তবে যা গন্ধ ওই আফ্রিকান লিলির! বাপরে বাপ! মাংস পচা ওর কাছে কিছু না!'

হাসলেন ম্যানেজার, 'তা ঠিকই বলেছ। ফুলের ওরকম গন্ধ হবে ভাবা যায় না। দুর্গন্ধটা আসলে ওর রেণুর।'

একটা ধারণা মাথায় উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে কিশোরের। অনুরোধ করল, 'ওটার কিছু রেণু আমার দরকার, স্যার, বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটা গবেষণা চালাতে চাই। কোন্ ধরনের মাছি আর পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করে জানতে পারলে বায়োলজি ক্লাসের জন্যে সুবিধে হত।'

'মজা করার জন্যে কোন বন্ধুর ওপর প্রয়োগ করতে যেয়ো না যেন আবার,' হেসে বললেন ম্যানেজার।' 'চিরকালের জন্যে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।' একটুকরো কাগজ নিয়ে তাতে খসখস করে লিখে সেটা বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে, 'নাও, ল্যাবরেটরি ক্লার্ককে এটা দিয়ো।'

ঘাস আর পদ্ম বিভাগে যাওয়ার আগে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা।

নোট দেখে হাসল ক্লার্ক। 'ওই খাটাশে গন্ধওলা জিনিস দিয়ে কি করবে? ও জিনিস কেউ হাতায় নাকি! নাক বাঁকা করে দেয়!'

তাকের একজায়গায় কতগুলো শিশি-বোতলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। যা খুঁজছে, পেল না। সামনের শিশিগুলো সরিয়ে ভালমত দেখল। অবাক হয়ে বলল, 'গেল কোথায়? এখানেই তো রেখেছিলাম!'

তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না শিশিটা।

কিশোর বলল, 'কেউ গবেষণা করার জন্যে অন্য কোথাও নিয়ে যায়নি তো?'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক, 'না, আমাকে না বলে কেউ কোন জিনিস সরাবে না, নিয়ম নেই।'

'যদি চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে?'

'এ জিনিস কে চুরি করবে? কেন করবে?'

জবাবটা মাথায় ঘুরছে কিশোরের, কিন্তু সেটা ক্লার্ককে বলল না। তাকে শিশিটা খুঁজে বের করে রাখতে অনুরোধ করল। পেলে যেন ঘাস আর পদ্ম বিভাগে খবর পাঠানো হয়। বলল বটে, কিন্তু সে নিশ্চিত, শিশিটা পাবে না ক্লার্ক।

পনেরো

তার ধারণাই ঠিক হলো। ক্লার্কের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া গেল না।

কেন্টের ওপর কিশোরের সন্দেহ জোরদার হতে লাগল। ল্যাবরেটরিতে ঢুকে তার পক্ষে ওই শিশি চুরি করা সহজ। গতরাতে কি সে-ই গিয়েছিল গুদামের কাছে? বাতাসে আফ্রিকান লিলির রেণু ছড়িয়ে দিয়েছিল? রেডকে

বেহুঁশ করে চুরি করতে সহায়তা করেছিল ওর বন্ধুদের?

ফার্মে ওকে দেখতে পেল না কিশোর। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিতে পাঠাল রবিনকে।

রবিন ফিরে এসে জানাল, 'দারোয়ান বলল আজ নাকি আসেইনি কেন্ট।'

শুনেই মুসা বলে উঠল, 'কি করে আসবে! সারারাত করেছে চুরি! ঘুম থেকে কি আর উঠতে পারে!'

'চুপ!' কিশোর বলল, 'আস্তে! কেউ শুনে ফেলবে!'

ওদের কাজের তদারক করতে এল কেনওয়ার্থি। কথায় কথায় তার সঙ্গে কেন্টের প্রসঙ্গ তুলল কিশোর। বলল, 'আচ্ছা, বলুন তো এত বদমেজাজ কেন লোকটার? প্রথম দিন যে কি নির্যাতন চালিয়েছে আমাদের ওপর! দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেব, তাও ওর ডিপার্টমেন্টে আর কাজ করতে যাচ্ছি না।'

হাসল কেনওয়ার্থি, 'ওর এই বদনাম আছে। কেউই ওর কাছে কাজ করতে চায় না। বদমেজাজ সহ্য করেও ওকে রাখা হয়েছে কাজ বোঝে বলে। ধানের ব্যাপারে সে একজন বিশেষজ্ঞ। বিশেষ করে বোরো ধান। তাই তাকে দেয়াও হয়েছে পানিতে ধানগাছ গজানোর দায়িত্ব।'

'দেখে তো ডাকাত বলে মনে হয়,' বলে বসল মুসা, 'ধানের চাষ শিখল কোথায়?'

'বহুদিন এশিয়ায় ছিল—বার্মা আর কোথায় কোথায় যেন। পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের ব্যাপারেও তার অনেক জ্ঞান, খুব আগ্রহ। মাঝে মাঝেই দেখতে আসে আফ্রিকান লিলির ওপর কোন্ কোন্ পোকা বসে।'

বিকেলে কাজ সেরে ফার্ম থেকে বেরোনোর আগে ল্যাবরেটরিতে খোঁজ নিল কিশোর।

গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে ক্লার্ক বলল, 'নাহ্, পেলাম না! কি হলো, বুঝতে পারছি না! ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলে যে কি জবাব দেব...'

বিকেলে ফেরার পথে অন্য দিনের মতই গাছে ঘেরা পুকুরটার দিকে চোখ পড়ল মুসার। এককোণে ধ্যানমগ্ন সেই বক। অন্ধকার না হলে যাবে না।

'ইস্, গরমে একেবারে ঘেমে গেছি,' মুসা বলল, 'আজ আর না নেমে যাচ্ছি না আমি।'

'তোমার ইচ্ছে হলে নামো, আমি নামব না,' মানা করে দিল কিশোর। মুসার মত পানি পছন্দ নয় ওর।

রবিন বলল, 'আমিও না।'

শার্ট খুলতে খুলতে মুসা বলল, 'তাহলো বসো তোমরা, আমি দুটো ডুব দিয়ে নিই।'

জামাকাপড় খুলে পাড়ে রেখে নেমে পড়ল সে। ঢাল খুব খাড়া, আর অনেক পাথর। পা দিলেই পাথর লাগে। কিনার থেকে কয়েক ফুট যেতে না যেতে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। ব্যাপারটা অবাক করল ওকে। এত গভীর! বেশি পানি ডাইভিঙের জন্যে চমৎকার। কোন গাছে উঠে ডাল থেকে দেবে নাকি ঝাঁপ? না, সময় নেই। ইচ্ছেটা দমন করল সে। দাপাদাপি করে

সাঁতার কাটতে শুরু করল।

এত হট্টগোলের মাঝে আর ধ্যান করা সম্ভব নয়। বিরক্ত হয়ে উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে বসল বকটা। তবে সতর্ক। গোলমালের সম্ভাবনা দেখলেই আবার উড়ে যাবে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'খুব আরাম। পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। শরীর জুড়িয়ে যায়। নেমে দেখো।'

হাত নেড়ে মানা করে দিল রবিন। 'না ভাই, অত কালো পানি দেখলে আমার ভয় লাগে।'

'দেখো তলায় সিন্দুক-টিন্দুক আছে নাকি,' হেসে বলল কিশোর। 'শেকল দিয়ে না পেঁচিয়ে ধরে।'

ভূতকে ভয় পেলেও পানির ওসব কল্পিত দানবকে ভয় করে না মুসা। হেসে বলল, 'দাঁড়াও, ধরে আনছি সিন্দুককে।'

ডুব দিল সে। ডাইভ দিয়ে সোজা নেমে চলল। তল কতখানি নিচে দেখবে। কিন্তু যতই নামছে, তল আর মেলে না। দম ফুরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠতে শুরু করল ওপরে।

পানির ওপর ভুস করে মাথা তুলে জোরে জোরে শ্বাস টানল কয়েকবার। চিৎকার করে বলল, 'অবাক কাণ্ড! তলাই নেই মনে হচ্ছে! এ তো পুকুর না, বিরাট এক গর্ত!'

পানি থেকে উঠে এল মুসা। কাপড় পরতে শুরু করল।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'জলদি কাপড় পরো! মিসেস বেনসনকে জিজ্ঞেস করতে হবে!'

'এই তো শুরু হলো গ্রীক ভাষা!' মুসা বলল। 'কি জিজ্ঞেস করবে?'

'বহুদিন থেকে এই এলাকায় আছেন মিসেস বেনসন। এখানকার সব খবর তাঁর জানা থাকার কথা। জিজ্ঞেস করে দেখব এই পুকুরটার সঙ্গে কোন গুজব বা কাহিনী যুক্ত আছে কিনা।'

'পুকুরের সঙ্গে কিসের কাহিনী থাকবে?'

'ওই যে বললে না, পুকুর নয়, গর্ত—সেটা শুনেই মনে হলো...চলো চলো!'

মুসা ওখানে নেমেছে শুনে তো চোখ কপালে তুললেন মিসেস বেনসন। 'ওটাতে নেমেছ! সাহস তো তোমার কম নয়! ওটা পুকুর না, গর্ত, বিরাট এক গর্ত! তোমার মতই লোভ করে আরও অনেকে সাঁতার কাটতে নেমেছে, তিনজন ডুবে মারা যাওয়ার পর থেকে ভয়ে আর কেউ নামে না ওটাতে। লোকে বলে ওটার তল নেই।'

'হলো কি করে ওই গর্ত?' জানতে চাইল কিশোর।

'খনি কাটার সময়। একসময় লোহার খনি ছিল ওখানে...'

'তারমানে ওই গর্তটা আসলে মাইন শ্যাফট!'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস বেনসন। 'গল্প পরেও করতে পারবে। তুমি আর

রবিন হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি খাবার নিয়ে আসি।'

রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

'মাইন শ্যাফট!' তুড়ি বাজাল কিশোর, 'পেয়ে গেছি সূত্র!'

কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।

'বুঝলে না?' কিশোর বলল, 'খনি ছিল, তার মানে অনেক গর্ত আর সুড়ঙ্গ এখনও আছে মাটির তলায়। কোন একটা সুড়ঙ্গ হেবলের বাড়ির নিচ দিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। মনে করে দেখো, মেঝের নিচ থেকে উঠে আসতে দেখেছি আমরা ওকে। সেলারে না নেমে সুড়ঙ্গেও তো নেমে থাকতে পারে সে?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। পুকুর থেকে মাইন শ্যাফট, শ্যাফট থেকে সেলার এবং তারপর সুড়ঙ্গ…

'মনে হয় আসল জায়গায় টোকা দিয়েছ এবার, কিশোর,' বলল সে, 'বাতিল খনি! চোরাই মাল লুকানোর চমৎকার জায়গা! মাটি কাঁপার রহস্যও ভেদ হলো। খনির মধ্যে ডিনামাইট ফাটিয়েছে কোন কারণে। সুড়ঙ্গ কিংবা গুহা বড় করার জন্যেও ফাটাতে পারে।'

'আজ রাতে হেবলের ওপর নজর রাখব। ডালডার ফার্মেও রাখা উচিত। তবে দুজনের মধ্যে প্রথমটাই বেশি জরুরী।'

মিসেস বেনসনের বাড়ির পেছনের মাঠ ধরে যখন রওনা হলো ওরা, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। মাঠ পেরিয়ে হেবলের কটেজে যাওয়ার রাস্তায় উঠল। হাইওয়েতে মোড় নিচ্ছে একটা ট্রাক। সরু রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল কটেজের পেছনে। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। আর এগোবে কিনা বুঝতে পারছে না।

'হেবলও হতে পারে ট্রাকের ড্রাইভার,' অন্য দুজনকে শুনিয়ে নিজেকেই বলল সে। 'আমাদের দেখে ফেললে সাবধান হয়ে যাবে।'

'দাঁড়াই এখানেই,' মুসা বলল। 'দেখি খানিকক্ষণ।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কিছু ঘটল না। কটেজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ট্রাকটা। চলে গেল সরু রাস্তা ধরে।

'কটেজে তো কোন আলো নেই,' ফিসফিস করে কিশোর বলল। পা টিপে টিপে এগোল বেড়ার দিকে। 'তবে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। আলো নিভিয়ে দিয়েও ভেতরে লোক থাকতে পারে। আর মাটির নিচে থাকলে ওপরে আলো জ্বালানোর দরকার পড়ে না।'

হেবলের আঙিনায় ঢুকে পড়ল ওরা। সেই জানালাটার সামনে চলে এল রবিন। ভেতরে উঁকি দিল। যা ভেবেছিল তাই। ট্র্যাপ ডোরটা খোলা। নিচ থেকে আলো আসছে।

জানালায় শিক নেই।

কিশোর বলল, 'কাউকে দেখছি না। ঢোকার এইই সুযোগ।'

'পাতালে নামবে নাকি?' মুসা জানতে চাইল।

'সিঁড়ির গোড়ায় কাউকে না দেখলে নামব।'

জানালা টপকে ভেতরে ঢুকল তিনজনে। ট্র্যাপ ডোরের কাছে এসে নিচে উঁকি দিল কিশোর। তার অনুমান ঠিক। সেলার নয়। সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে, গর্তের একপাশের দেয়ালে সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে। একটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে সিঁড়ির গোড়ায়।

নেমে পড়ল ওরা। অনেকখানি সোজা এগিয়ে বাঁক নিয়েছে একটা সুড়ঙ্গ। ভেতরটা আলোকিত। ঠুকঠুক ঠুকঠুক করে একটানা শব্দ আসছে সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্ত থেকে।

সারি দিয়ে এগোতে শুরু করল ওরা। আগে আগে রয়েছে কিশোর। বেশি লম্বা নয় সুড়ঙ্গটা। শেষ মাথায় আসতে একটা কাঠের চাতাল মত দেখা গেল। তার ওপাশ থেকে আরেকটা সিঁড়ি নেমেছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে সামনে আরেকটা লম্বা সুড়ঙ্গ দেখা গেল, পাথর কেটে তৈরি হয়েছে ওটা।

'এ সব কাণ্ড হেবলই করেছে নাকি?' মুসা বলল।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। তার পক্ষে একা এই সুড়ঙ্গ কাটা সম্ভব না।'

পাথুরে দেয়ালে সামান্য কথার শব্দই অনেক জোরাল হয়ে বাজল, প্রতিধ্বনি তুলল। থপ করে একটা শব্দ হলো পেছনে। মনে হলো কেউ লাফিয়ে পড়ল। এগিয়ে আসতে শুরু করল পদশব্দ।

ষোলো

দ্রুত চারপাশে তাকাল কিশোর। লুকানোর জায়গা নেই। উপায় একটাই, সুড়ঙ্গের আরও গভীরে ঢুকে যাওয়া।

তাই করল ওরা। যতই সামনে এগোচ্ছে জোরাল হচ্ছে ঠুকঠুক শব্দ। কিছু একটা ঘটছে ওদিকটায়। পেছনে কাঠের চাতালের সিঁড়ি বেয়ে নামার শব্দ হচ্ছে মচমচ করে। ফেরার পথ নেই। লুকানোর জায়গা দেখছে না। যাবে কোনদিকে এখন?

'ধরা বুঝি পড়লাম!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

কথা না বলে সামনে এগোল কিশোর। পেছনে লুকানোর কোন জায়গা নেই, দেখা যাক সামনে আছে কিনা।

সুড়ঙ্গের আরেকটা মোড় ঘুরতে একপাশে একটা দরজা চোখে পড়ল। পেছনে দ্রুত এগিয়ে আসছে পদশব্দ। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লাটা। একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর। ভেতরে যা থাকে থাক, আপাতত পেছনের লোকটার নজর থেকে সরতে হবে। ঢুকে পড়ল সে। তার পর পর ঢুকল রবিন আর মুসা।

ঢুকেই পাল্লা লাগিয়ে দিল মুসা।

কোন গুহাটুহা বা ঘরে নয়, ঢুকেছে ওরা বড় একটা আলমারিতে। খনি কাটার যন্ত্রপাতি রাখা হত বোধহয় এটাতে। ভেতরে অন্ধকার, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াতে হয়েছে তিনজনকে। এই বদ্ধ জায়গায় কতক্ষণ অক্সিজেন থাকবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। রবিনের গায়ে হালকা কি যেন একটা লাগছে, কাপড়ের মত।

অন্ধকারে কান পেতে রইল ওরা।

এগিয়ে আসছে পদশব্দ। ওদের নামতে দেখল নাকি লোকটা? তাহলে এগিয়ে এসে সুড়ঙ্গে না দেখলে ঠিকই আন্দাজ করে ফেলবে কোথায় ঢুকেছে ওরা। বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে দিয়েও চলে যেতে পারে। তাহলে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে।

আলমারির দরজার সামনে চলে এল পদশব্দ।

ধকধক করছে গোয়েন্দাদের বুকের ভেতর। থামবে না তো লোকটা?

থামল না পদশব্দ। সরে গেল আস্তে আস্তে।

'বাঁচলাম!' হাঁপ ছাড়ল মুসা। 'খুলব নাকি?'

'আরেকটু পর,' কিশোর বলল।

আরও মিনিট দুই পর আস্তে করে পাল্লা খুলল মুসা। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল সুড়ঙ্গের এ মাথা ও মাথা। কেউ নেই। বেরিয়ে এল সে। পেছনে বেরোল কিশোর আর রবিন।

সুড়ঙ্গের আলো পড়েছে খোলা আলমারির ভেতর। পেছনের দেয়ালে হুক থেকে ঝুলছে অদ্ভুত তিনটে পোশাক। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রবিন। কালো আলখেল্লার মত একধরনের পোশাক, যা দিয়ে মাথাও ঢেকে রাখা যায়। এই জিনিসই দেখেছিল সেদিন রাতে মশাল নিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছিল যে লোকটা তার পরনে।

নীরবে আঙুল তুলে পোশাকগুলো দেখাল কিশোরকে।

একনজর দেখেই মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মশালধারী হঠাৎ করে কোথায় গায়েব হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছে। নিশ্চয় পাহাড়ের মাঝে কোন পাথরের আড়ালে গর্ত বা ফাটল আছে, সেটা দিয়ে ঢুকে পড়া যায় সুড়ঙ্গে, দ্রুত লুকিয়ে পড়তে অসুবিধে হয় না। এই সুড়ঙ্গের মধ্যেই মশালধারীর আস্তানা এবং তার বা তাদের সঙ্গে হেবলের কোন সম্পর্ক আছে।

কথা বলতে গিয়ে চমকে উঠল মুসা, থেমে গেল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'বাপরে বাপ! যে ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়, সুড়ঙ্গের একমাথা থেকে আরেক মাথায় চলে যাবে আওয়াজ!'

'সেজন্যেই কথা বলা উচিত না এখানে,' কিশোর বলল। আবার পা বাড়াল সামনে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

কিছুদূর এগোনোর পর দেখা গেল ওরা যেটা ধরে এগোচ্ছে সেই মূল সুড়ঙ্গ থেকে আরেকটা সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে। ওটাতে আলো নেই। টর্চ জ্বালল কিশোর।

সামনে কয়েক গজ এগোনোর পরই থমকে দাঁড়াল।

'খাইছে!' পেছন থেকে বলে উঠল মুসা। 'এ কি! সব তো চোরাই মাল মনে হচ্ছে!'

কিশোরের নজর সামনের দিকে। সুড়ঙ্গটা কতদূর গিয়ে শেষ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি বাক্স সাজানো। স্টোররুম বানানো হয়েছে সুড়ঙ্গের এই অংশটাকে। লেবেল দেখে বোঝা যাচ্ছে বাক্সগুলোতে কি আছে। চোরাই মাল, সন্দেহ নেই। নইলে বাক্সভর্তি এ সব জিনিস এই মাটির নিচে এনে লুকিয়ে রাখা হবে কেন?

'এই যে দেখো আরও প্রমাণ,' কিশোর বলল। নিচু হয়ে তুলে নিল একটা ডালের মত জিনিস, ডালডার গ্রীনহাউসের পাশে যে রকম পেয়েছিল। মাথার কাছে গর্ত। 'আমি এখন শিওর, এগুলো মশাল। এই গর্তে কোন ধরনের দাহ্য পদার্থ ঠেসে ভরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, যা মশালের মত জ্বলতে থাকে।'

'কিন্তু এর মধ্যে ডালডা আসছেন কোনখানে?' রবিনের প্রশ্ন। 'চোরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে, না নেই?'

প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কিশোর। বলল, 'সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় কি আছে দেখা দরকার।'

মুসা বলল, 'যদি কারও সামনে পড়ে যাই?'

'যখন পড়ি তখন দেখব...'

ওর কথা শেষ না হতেই মূল সুড়ঙ্গে পদশব্দ শোনা গেল। আলো নিভিয়ে দিল কিশোর। উঁকি দিয়ে দেখল, এদিকেই আসছে লোকটা। হাতে কি একটা জিনিস।

মুসার মনে হলো, মেশিন গান!

রবিন ভয় পাচ্ছে, লোকটা স্টোররুমে ঢুকবে না তো?

আসছে লোকটা। মুহূর্তের জন্যে থামছে না কিংবা গতি কমাচ্ছে না। হাঁটার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় এ জায়গা ওর অতি পরিচিত।

এগিয়ে এসে গোয়েন্দারা যেখানে লুকিয়ে আছে সেদিকে তাকাল সে।

তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গমুখের কাছ থেকে সরে এল ওরা। বাক্সগুলো এমন করে সাজানো, মাঝখানে কোন ফাঁক নেই যে তার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর কোন উপায় না দেখে বাক্সের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। টর্চ না জ্বাললে লোকটা ওদের দেখতে পাবে না।

ঢুকল না লোকটা। মূল সুড়ঙ্গ ধরে চলে গেল।

হাঁপ ছাড়ল তিন গোয়েন্দা।

'আরেকবার ধরা পড়তে পড়তে বাঁচলাম,' রবিন বলল।

'বার বার এ ভাবে বাঁচব না,' মুসা বলল। 'এ রকম চলতে থাকলে এক সময় না এক সময় ধরা পড়বই। তাড়াতাড়ি যা দেখার দেখে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।'

'ওর হাতের জিনিসটা দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখেছি, মেশিন গান।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না। দেখতে ওরকমই লেগেছে বটে। ওটা ড্রিল মেশিন।'

'কাকতাড়ুয়াটার মধ্যে যে জিনিস দেখেছি!'

'হ্যাঁ। ওইটাও হতে পারে...'

'আবার আসছে!'

সুড়ঙ্গের মধ্যে আবার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মুসা গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এল ড্রিল মেশিন হাতে যে লোকটা এসেছিল, সে ফিরে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। হাতে মেশিনটা নেই। বোধহয় ওটা দিয়েই ঢুকেছিল। কাদের দিয়ে এল? কি কাজ করছে ওরা?

জবাব মিলল একটু পরই। লোকটা চলে যাওয়ার পর দুজন মানুষের গলা শোনা গেল। কথা বলতে বলতে আসছে।

প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে লোকগুলো। বদ্ধ সুড়ঙ্গে দূর থেকেও ওদের কথা স্পষ্ট শোনা গেল।

একজন বলছে, 'ভাল জিনিস পেয়ে গেলাম।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'লোহা খুঁড়তে যারা এসেছিল তারা এগুলো নিল না কেন? লোহার চেয়ে তো এ জিনিস অনেক দামী।'

'হয়তো জানতই না এর দাম। আমেরিকার বিদ্রোহ হয়েছে সে কি আজকের কথা। তখন সাধারণ মানুষ কোবালাসটিয়ামের কথাই জানত না, এটা দিয়ে কি হয় সে তো দূরের কথা।'

'তারমানে বড়লোক হয়ে গেলাম আমরা,' হাসল প্রথমজন। 'চুরির ব্যবসা ছেড়ে দিতে পারব। প্রথম অবশ্য বিশ্বাস করিনি এই খনিতে এ জিনিস আছে।'

সুড়ঙ্গমুখের সামনে দিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল লোকগুলো। ঠেলাগাড়িতে বোঝাই করা জিনিসগুলো দেখতে নীলচে রঙের পাথরের টুকরোর মত।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর রবিন বলল, 'তারমানে খনিটাতে এখনও মাল আছে।'

'আছে, তবে লোহা নয়,' কিশোর বলল, 'অন্য জিনিস। শুনলে না কোবালাসটিয়ামের কথা বলল। সেগুলোই খুঁড়ে তুলছে ওরা। চলো দেখি, দেখে আসি কোনখানে কাজ করছে শ্রমিকরা।'

মূল সুড়ঙ্গ ধরে এগোল ওরা। দেখা পেল শ্রমিকদের। ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র করছে। ছেনি বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কাটছে পাথরের চাঙড়। ঠুকঠুক শব্দ হচ্ছে। এই শব্দই শুনতে পেয়েছিল গোয়েন্দারা।

বেশি কাছে যাওয়ার সাহস হলো না ওদের। যা দেখার দেখেছে। পেছন থেকে কেউ চলে আসার আগেই কেটে পড়তে হবে।

দেয়ালের গায়ে আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ আবিষ্কার করল মুসা। এটাও

আগেরটার মত অন্ধকার। ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। টর্চ জ্বেলে এগোতে শুরু করল।

কিছুদূর এগোনোর পর বলে উঠল রবিন, 'দেখো, মশাল!'

আগে যে মশাল দেখেছিল ওরা, ওরকমই দেখতে কয়েক ডজন মশাল স্তূপ করে রাখা আছে এক জায়গায়।

সতেরো

এগিয়ে চলল ওরা। সামনে সুড়ঙ্গ আর শেষ হতে চায় না। পাথুরে দেয়ালের গা খসখসে। বহুদিন আগে খোঁড়া হয়েছিল এই সুড়ঙ্গ। এঁকেবেঁকে, ঘুরে-পেঁচিয়ে চলে গেছে। মেঝেতে পুরু হয়ে জমেছে বালি আর পাথরের টুকরো। বালিতে জুতোর তাজা ছাপ পড়ে আছে।

কিশোর বলল, 'ব্যবহার হয় এই সুড়ঙ্গটাও।'

'হয়,' টর্চের আলোয় ভাল করে দেখে মুসা বলল, 'তবে একজন মানুষ যাওয়া-আসা করে এটা দিয়ে। দেখছ, সবগুলো ছাপ একই জুতোর?'

আরও সামনে এগোল ওরা। দেয়ালের এখানে ওখানে ছিদ্র দেখতে পেল। ওগুলো অবাক করল ওদের। এ ভাবে সারি দিয়ে ছিদ্র করেছে কে? কেন?

আরও কিছুদূর এগোতে এর জবাব মিলল। দেয়ালের গায়ে ওরকম একটা ছিদ্রে তেরছা করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা মশাল।

'অনেক আগে,' রবিন বলল, 'এই খনিটা যখন খোলা ছিল, তখন দেয়ালে ওই মশাল গেঁথে আলোর ব্যবস্থা করা হত। এ জন্যেই এত মশাল পড়ে আছে সুড়ঙ্গের মধ্যে।'

'গ্রীনহাউসের ভেতরে মশালটা কোত্থেকে গেল তাও অনুমান করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'আমি কি ভাবছি, জানো? এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ডালডার ল্যাবরেটরিতে যাওয়া যায়।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'তা কি করে সম্ভব?'

'এতে সম্ভব-অসম্ভবের কি দেখলে? সুড়ঙ্গ মাটির নিচে যে কোন দিক দিয়ে যেতে পারে। ডালডার বাড়ির নিচ দিয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'আমারও কিন্তু সেরকমই মনে হচ্ছে,' কিশোরের সঙ্গে একমত হয়ে বলল রবিন, 'গ্রীনহাউসের নিচ দিয়েই গেছে সুড়ঙ্গটা। আরও একটা ব্যাপার, ডালডার বাড়ি থেকে হেবলের কটেজ বেশি দূরে নয়।'

এগিয়ে চলল ওরা। সুড়ঙ্গ ধরে গ্রীনহাউসে যাওয়া যায়—এই সম্ভাবনাটা উত্তেজিত করে তুলেছে ওদের। আজ অনেক প্রশ্নের সমাধান করে দিতে পারে এই সুড়ঙ্গ। কিশোরের ধারণা—এমনও হতে পারে, গ্রীনহাউসে বার্গলার

অ্যালার্ম আর অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে চোর ঢোকে এই সুড়ঙ্গপথেই। যেহেতু ঢোকা কিংবা বেরোনোর জন্যে দরজা খোলা লাগে না, তাই অ্যালার্মও বাজে না।

'কিন্তু মশালধারীদের সঙ্গে মথচোরের কি সম্পর্ক?' প্রশ্ন করল রবিন।

'এ প্রশ্নের জবাব পেলে তো সব রহস্যেরই সমাধান হয়ে যায়। তবে জানতে পারব শিগগিরই।'

সামনে আরও অমসৃণ হয়ে এল সুড়ঙ্গের মেঝে। খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে আছে। একটু অসাবধান হলেই তাতে হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে।

অবশেষে শেষ হলো সুড়ঙ্গ। পথের মাথায় নতুন কোন সুড়ঙ্গ নেই, নেই কোন গুহা কিংবা মাইন শ্যাফট। সরু হতে হতে শেষ হয়ে গেছে অনেকটা সাপের লেজের মত—তবে ডগাটার বেড় কয়েক ফুট।

'অবাক কাণ্ড!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ধুলোতে তাজা পায়ের ছাপ পড়ে আছে, তারমানে কেউ একজন নিশ্চয় যাওয়া-আসা করেছে। কোথায় গেল সে?'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। সামনে যেখানে সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে, সেটার দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তিত ভঙ্গিতে।

অনেকবার অনেক ধরনের সুড়ঙ্গে ঢুকেছে ওরা। অনেক কারসাজি করা থাকতে দেখেছে। পাশ কেটে এগিয়ে গেল মুসা। কাছে থেকে খুঁজতে শুরু করল। অনেক পাথর পড়ে আছে। একটা পাথর কিছুটা অস্বাভাবিক লাগল ওর কাছে। মনে হলো অন্য পাথরগুলোর চেয়ে এটা কিছু পরিষ্কার। বার বার হাত লাগলে অমন হতে পারে। পাথরটা ধরে সরাতে গেল। অমনি অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। ঘড়ঘড় করে সরে গেল সুড়ঙ্গের শেষ মাথার একটা পাথরের দরজা।

হাসিমুখে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল মুসা। 'কি বুঝলে?'

'দারুণ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রবিন।

অন্যপাশে চলে এল ওরা। দরজা খোলার হাতল আবিষ্কার করল এ পাশেও। প্রাচীনকালে হয় খনির শ্রমিকরা নয়তো দস্যুরা তৈরি করেছিল ওই পাথরের দরজা, অনুমান করল কিশোর। শেষটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ওরকম গুপ্ত দরজা তৈরি করার কোন কারণ নেই খনির শ্রমিকদের।

সামনে কয়েক ফুট দূরে আরেকটা ভারী কাঠের দরজা দেখা গেল। কি রহস্য লুকিয়ে আছে ওপাশে? এগিয়ে গিয়ে নবে হাত রাখল কিশোর। মোচড় দিতে যাবে এই সময় শব্দ হলো ওপাশে, মনে হলো, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে কেউ। নিচে নামল। এগিয়ে আসতে শুরু করল কাঠের দরজার দিকে।

'সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ো! জলদি!' বলে উঠল কিশোর।

পেছন ফিরে দৌড় দিল ওরা। পাথরের দরজার এ পাশে এসেই আবার দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।

পুরোপুরি বন্ধ হয়নি দরজাটা। ওরা খোলার পর কোনভাবে একটা পাথর পড়ে গিয়েছিল মাঝখানে। সেটা ঠেকিয়ে দিয়েছে পাল্লাটাকে, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সেই ফাঁক দিয়ে কাঠের দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

খুলছে না দরজা। অন্যপাশে খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে।

পাথরের দরজাটা আবার খুলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। ওপাশ থেকে দরজা খোলার শব্দ হলেই দেবে দৌড়।

নবের ফুটোয় চোখ রাখল। স্থির হয়ে গেল। ওপাশে একটা ছোট ঘর। স্টোররুম। নানা ধরনের নানা আকারের বাক্স, কাঁচ আর মাটির তৈরি জার পড়ে আছে। ছাত থেকে ঝুলছে একটা বাল্ব। বৈদ্যুতিক আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বুড়ো বিজ্ঞানীকে। আনমনে বিড়বিড় করছেন ডালডা। হাতে একটা বড় কাঁচের জারে ভর্তি মাটি।

পাত্রটা নামিয়ে রেখে আবার এগোলেন কাঠের সিঁড়ির দিকে। ওপরে চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন আর মুসা। ওদেরকে সব জানাল।

রবিন বলল, 'ওপাশে গিয়ে দেখবে নাকি কি করছেন?'

'দেখব,' আবার নবটা ধরল কিশোর। মোচড় দেয়ার আগে দ্বিধা করল একবার। যদি শব্দ হয়ে যায়? শব্দ শুনে দেখতে আসেন ডালডা, কে দরজা খুলছে? দূর, যা হয় হবে!—ভেবে নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল সে।

স্টোররুমে ঢুকল তিনজনে। এখানে দেখার কিছু নেই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা।

সিঁড়ির মাথায় একটা চিলেকোঠার মত ঘর, সিঁড়িঘর ওটা। তার ওপাশে দরজা। পুরানো পাল্লা, ফুটো হয়ে আছে কয়েক জায়গায়। কাঠের জোড়াগুলোও ফাঁক হয়ে গেছে। মেরামত করানোর কথা বোধহয় মনে হয়নি ডালডার, কিংবা প্রয়োজন মনে করেননি।

এগিয়ে গিয়ে সেসব ফুটোতে চোখ রাখল তিন গোয়েন্দা। ওপাশে বিশাল এক ল্যাবরেটরি। ডালডাকে দেখা গেল একটা কাঁচের টেস্ট টিউব নিয়ে গবেষণায় মগ্ন। একটা স্টোভের ওপর কালো একটা মাটির পাত্রে কি যেন ফুটছে। সেটা থেকে টিউবে তরলটা তুলে নিয়েছেন তিনি। গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছেন সেটার দিকে। নেড়েচেড়ে দেখছেন।

তিনজনের কারোরই বুঝতে অসুবিধে হলো না এই গবেষণার সঙ্গে রেশমপোকার কোন সম্পর্ক নেই।

দেখে সন্তুষ্ট হলেন মনে হলো। আপনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে টিউবটা নামিয়ে রেখে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন।

অবাক হয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। আলমারির তাকে অন্তত এক ডজন লাঠি দেখতে পেল, যে জিনিস খানিক আগে সুড়ঙ্গের মধ্যে দেখে এসেছে, যে জিনিস একটা কুড়িয়ে পেয়েছিল ওরা গ্রীনহাউসের পাশে।

একটা লাঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন কালো পাত্রটার সামনে। ডুবিয়ে দিলেন লাঠির গর্তওয়ালা মাথাটা। তুলে আনতে দেখা গেল আঠা আঠা এক ধরনের তরল লেগে আছে মাথায়। বাতাসের সংস্পর্শে আসতে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেল জিনিসটা। আঙুল দিয়ে চেপে দেখলেন ভালমত শক্ত হয়েছে কিনা। তারপর ধরলেন টেবিলে রাখা বার্নারের আগুনে।

দপ করে জ্বলে উঠল লাঠির মাথায় লাগানো জিনিসটা। উজ্জ্বল সাদা আলো সৃষ্টি করে জ্বলতে লাগল। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন তিনি। চিৎকার করতে লাগলেন একা একাই, 'হয়েছে, হয়ে গেছে! এতদিন পর সফল হলাম! আহ্, কি আলো! কোথায় লাগে ব্যাটারিওয়ালা টর্চ!'

লাঠিটা দেয়ালের একটা গর্তে বসিয়ে দিলেন তিনি। ঘরের সমস্ত বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে দিলেন। কোনই অসুবিধে হলো না তাতে। ঘরের ওই পাশটাকে আলোকিত করে রাখার জন্যে একটা মশালই যথেষ্ট।

নতুন ধরনের একটা জ্বালানি আবিষ্কার করেছেন ডালডা। এই সাফল্য খনির কাজে একটা বিরাট সুবিধা দেবে। কিশোর বুঝল, ওদের বাড়িতে গিয়ে এই গবেষণার কথাই বলতে গিয়েও বলেননি তিনি। চেপে গিয়েছিলেন, কারণ তখনও কাজটায় সফল হতে পারেননি।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বিজ্ঞানীকে নতুন কিছু আর করতে দেখল না গোয়েন্দারা। মশাল নিয়েই ব্যস্ত তিনি।

এই সময় ওপর থেকে ডাক শোনা গেল। বিরক্ত হয়ে ল্যাবরেটরির একধারে একটা সিঁড়ির দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে গোয়েন্দারাও দেখল, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাট ডগলাস। 'একটু দেখে যান তো, স্যার। পোকাগুলোকে কোথায় রাখব বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আরও কিছু তুঁত গাছ লাগাতে হবে আমাদের।'

'সে তো আমি কদিন থেকেই বলছি। লাগবে তো জানিই।'

একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছে সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন ডালডা।

আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর কিশোর বলল, 'আর থেকে লাভ নেই। চলো, যাই।'

মুসা বলল, 'আবার ওই সুড়ঙ্গ পেরোব? যদি ধরা পড়ি? চলো না এদিক দিয়েই বেরিয়ে যাই।'

'ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে কোনদিক দিয়ে যেতে হবে জানি না। যদি বার্গলার অ্যালার্মের খপ্পরে পড়ি? নাহ্, সুড়ঙ্গ দিয়েই বেরোব, যে পথে এসেছি।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পাথরের দরজাটা লাগিয়ে দিল আবার। ফিরে চলল সুড়ঙ্গপথ ধরে।

আঠারো

নীরবে এগিয়ে চলেছে ওরা।

হঠাৎ নাকমুখ কুঁচকে মুসা বলল, 'উঁহ্! গন্ধ কিসের!'

হালকা একটা পচা গন্ধ। যতই সামনে এগোল বাড়তে লাগল।

'গুহার মধ্যে খাটাশ ঢুকল নাকি?' আবার বলল মুসা। 'কি সাংঘাতিক গন্ধরে বাবা! আল্লাহ্ই জানে ওটার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ব নাকি!'

আরও কয়েক গজ এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাঁড়াও! এক পাও এগিয়ো না আর!'

'কি হলো?' হেসে ফেলল রবিন, 'মুসার খাটাশকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

আবার পা বাড়াতে যাচ্ছিল রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরে টান মেরে সরিয়ে আনল কিশোর। 'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি! পালাতে হবে এখান থেকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব!'

'এমন করছ কেন?' মুসা বলল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'জলদি দৌড় দাও!' যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ছুটতে শুরু করল কিশোর।

কিছুই না বুঝে তার পেছনে ছুটল রবিন আর মুসা।

ছুটতে ছুটতে রবিন বলছে, 'এত ভয় পাচ্ছ কেন? খাটাশকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাঘ নয় যে খেয়ে ফেলবে।'

'আরে খাটাশকে ভয় পাচ্ছে কে?' সুড়ঙ্গের অনেকখানি ভেতরে সরে আসার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'গন্ধটা কোন জন্তুর নয়, কৃত্রিম, মানুষের ছড়ানো। কোথাও পড়েছি, এ ভাবে গন্ধ ছড়িয়ে মাটির নিচে খনির শ্রমিকদের সাবধান করা হয়। বোঝানো হয়, গন্ধ থেকে সরে থাকো, বিপদ আছে। মাটির নিচে ড্রিল মেশিন আর অন্যান্য শব্দে অ্যালার্ম বেল বাজালেও শুনতে পায় না ওরা, তাই নাকটাকেই ব্যবহার করে।'

মুসা বলল, 'ভাল ব্যবস্থা। এ জিনিস কারও নাক এড়াবে না। কিন্তু কিসের অ্যালার্ম? বিপদটা কি?'

যেন তার কথার জবাব দিতেই ভারী একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো পেছনে। 'খাইছে! পাহাড়টা ধসিয়ে দিচ্ছে নাকি?'

'থেমো না,' বলল কিশোর, 'ছুটতে থাকো।'

রবিন ভাবছে, ভাগ্যিস এ ভাবে সাবধান করার কথাটা জানা ছিল কিশোরের, নইলে মরতে হত ওদের।

পাথরের দরজাটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওটা খুলে ঢুকে গেল ডালডার স্টোররুমে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গবেষণাগারের চিলেকোঠায়।

ঠেলা দিল মুসা।

খুলল না পাল্লা। ভেতর থেকে লাগানো।

দৌড়ে আসার ফলে ঘামছে তিনজনেই। কিশোর আর রবিনের দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে নীরবে মাথা নাড়ল মুসা।

'কি করব?' উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল রবিন। 'বেরোব কিভাবে?'

তিনজনে মিলে ঠেলঠেলি করে দেখল, দরজা খুলল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'ডিনামাইট ফাটানো বন্ধ হয়েছে। সুড়ঙ্গ দিয়েই ফিরে যেতে পারব। বসো একটু, জিরিয়ে নিই।'

আবার সুড়ঙ্গে ফিরে এসে কিছুদূর এগোতে একটা পরিবর্তন টের পেল ওরা। দুর্গন্ধ আর নেই তেমন, সেই সঙ্গে আরও একটা জিনিস অনুপস্থিত—বাতাস। এর আগে যতবার যাতায়াত করেছে হালকা বাতাসের একটা স্রোত ছিল, অনুভব করেছে। তারমানে বাতাস বইছিল সুড়ঙ্গের মধ্যে। এখন সেটা নেই।

সন্দেহ হলো রবিনের, 'ঘটনাটা কি?'

জবাব পেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখটা মাটি আর পাথর ধসে বন্ধ হয়ে আছে। বাতাসে ধুলো উড়ছে। দম নেয়াই কষ্টকর। ওটার কাছাকাছি কোনখানে ডিনামাইট ফাটানো হয়েছে। মূল সড়ঙ্গে ঢোকা যাবে না আর। যে পথে ঢুকেছিল ওরা, অর্থাৎ হেবলের কটেজের ট্র্যাপ ডোর দিয়ে আর বেরোনো সম্ভব নয়। বেরোনোর একটাই পথ এখন—ডালডার ল্যাবরেটরি দিয়ে।

সুড়ঙ্গে বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ। অক্সিজেনও আর থাকবে না বেশিক্ষণ। বাঁচতে হলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বেরিয়ে যেতে হবে এখন এখান থেকে।

'ফাঁদে পড়লাম আমরা!' ককিয়ে উঠল মুসা। 'ইস্, পানি দরকার! বুকটা ফেটে যাচ্ছে!'

'বাইরে না বেরোলে আর পানি পাওয়া যাবে না।' তাগাদা দিল কিশোর. 'চলো চলো।'

'কি করে বেরোবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'দরকার হলে চিলেকোঠার দরজা ভাঙব। খোলার আর তো কোন উপায় নেই।'

'বেরোতে না পারলে কেউ খুঁজতেও আসবে না আমাদের। কেউই জানে না আমরা এখানে আটকা পড়েছি।'

'আমার মাথা ঘুরছে,' কাশতে আরম্ভ করল মুসা।

'আমারও! জলদি চলো! এখানে থাকলে অক্সিজেনের অভাবেই মরব!' হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো অক্সিজেন ফুরানোর কথা নয়!' রবিন বলল।

কথাটা মাথায় আসতেই রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর, আফ্রিকান লিলি! ওটার পরাগের গন্ধ ছড়ানো হয়নি তো বাতাসে? তাই হবে। ওয়াকার ফার্মের ল্যাবরেটরি থেকে ফুলের রেণু ভর্তি শিশি চুরি যাওয়ার কথা

মনে পড়ল। পচা মাংসের দুর্গন্ধ। সর্বনাশ! সুড়ঙ্গে বাতাস চলাচল বন্ধ। বদ্ধ বাতাসকে বিষাক্ত করে ফেলেছে নিশ্চয় ওই পরাগ।

ছুটতে শুরু করল কিশোর। 'বাঁচতে চাইলে জলদি পালাও!'

'কেন, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই এখন। আগে এই মরণ-ফাঁদ থেকে বেরোতে হবে!'

আবার চিলেকোঠায় উঠে এল ওরা। এখানে বাতাসের অবস্থা সুড়ঙ্গের মত অতটা খারাপ নয়। ল্যাবরেটরির দিক থেকে পাল্লার ফাঁকফোকর দিয়ে অক্সিজেন আসছে।

ওপরে উঠেই ধপ করে বসে পড়ল রবিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'উফ্, গলাটা একেবারে কাঠ হয়ে গেছে! পানি দরকার।'

'জিরানোর জন্যে তিরিশ সেকেন্ড সময় পাবে,' বলল কিশোর। 'তারপর দরজা ভাঙার চেষ্টা করতে হবে।'

'শব্দ শুনে যদি ম্যাট এসে হাজির হয়?'

'এলে আসবে। বাইরে তো বের করে নিয়ে যাবে আমাদের। তারপর যা হবার হবে। ডালডাকে বোঝাতে পারব কেন নেমেছি আমরা এখানে।'

আধমিনিট পর উঠে দাঁড়াল তিনজনে। দরজার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল পাল্লায়।

ধুড়ুম ধুড়ুম করে বিকট শব্দ হতে লাগল বদ্ধ জায়গায়।

দমল না ওরা। থামলও না। ভাগ্যিস পাল্লাটা পুরানো। বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না ওটা। মড়মড় করে কাঠ ভেঙে কব্জা থেকে ছুটে গেল। ভেতরে ছিটকে পড়ল পাল্লাটা।

হুড়মুড় করে ল্যাবরেটরির ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে। কেয়ার করল না মুসা। সোজা ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে রওনা হলো।

পেছনে চলল অন্য দুজন। দরজা ভাঙার শব্দ হয়েছে প্রচুর। কেউ দেখতে আসতে পারে, সেজন্যে সতর্ক রইল।

কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওদের। নিরাপদে উঠে এল ওপরের একটা ঘরে। টর্চের আলোয় চেয়ার-টেবিল আর ফাইল দেখে বোঝা গেল ওটা অফিসঘর।

বাইরে এখনও রাত। অন্ধকার। অফিসে কোন আলো জ্বলছে না। ওরাও জ্বালল না। আলো দেখলেই দেখতে আসবে প্রহরী, কে জ্বেলেছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। কাউকে চোখে পড়ল না। ফিসফিস করে বলল, 'কাউকে তো দেখছি না। বেরিয়ে দেব নাকি দৌড়?'

কিন্তু দৌড় দেয়া গেল না। দরজা বন্ধ।

একধারে আরেকটা দরজা দেখা গেল। ছিটকানি লাগানো। ছিটকানি খুলে টান দিতেই খুলে গেল। কিশোর দেখল, ওটা দিয়ে একটা গ্রীনহাউসে ঢোকা যায়।

ঢুকে পড়ল ওরা। গ্রীনহাউস থেকে বেরোনোর দরজার দিকে এগোল।

এই দরজায় তালা লাগানো নেই। কেন তালা নেই, সেটা একটিবারও ভাবল না মুসা, কিশোর বাধা দেয়ার আগেই ঠেলা দিয়ে বসল। পাল্লা ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল। কানফাটা শব্দে পুরো বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেন বাজতে লাগল ঝনঝন শব্দে।

মুহূর্তের জন্যে থমকাল কিশোর। পরক্ষণেই প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাইরের আঙিনায়। গেটের দিকে ছুটল। পিছু নিল মুসা আর রবিন। টপাটপ আলো জ্বলে উঠল কয়েকটা ঘরে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলো। চোর! চোর! ধরো! ধরো!—বলে চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ। ডালডা।

গেটের দিকে গেল না আর কিশোর। মোড় নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে ছুটল। কেউ সামনে পড়ার আগেই মাঠ পেরিয়ে, বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। থামল না। সরু রাস্তাটা ধরে ছুটতে লাগল।

বাড়ির ভেতরে চেঁচামেচি করছে, কিন্তু বাইরে এল না কেউ। চোরকে বাইরে খোঁজার কথা ভাবছে না বোধহয়। অ্যালার্ম বেল বাজা বন্ধ হলো। অফ করে দেয়া হয়েছে সুইচ। আরও অনেক আলো জ্বলে উঠল গ্রীনহাউসের ভেতর। তবে গোয়েন্দারা ততক্ষণে নিরাপদ, সরে চলে এসেছে অনেকখানি।

উনিশ

মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা। গ্রীনহাউস থেকে সরে এসে একটা ট্যাপ থেকে পানি খেয়ে নিয়েছে। এখন চলেছে হেবলের কটেজে, ও কি করে দেখার জন্যে। সে-ই যে সব কিছুর হোতা, সেটা জানা হয়ে গেছে। ওদের নিচেই এখন কোনখানে চলেছে মাটি খোঁড়া, খনিতে কাজ করছে অনেক শ্রমিক। গাঁয়ের লোকে কল্পনাও করছে না এত পুরানো, বাতিল খনিতে আবার নতুন করে কাজ চলছে। খুব চালাকি করে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে হেবল আর তার দল, কাউকে কিছু সন্দেহ করতে দেয়নি।

কটেজের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। বাড়িটা অন্ধকার। মনে হচ্ছে না ভেতরে কেউ আছে।

হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখা গেল। পর পর দুবার।

'সঙ্কেত দিচ্ছে নাকি?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'মনে হচ্ছে,' আবার আলো জ্বলে কিনা দেখছে কিশোর। 'সাবধানে ঢুকতে হবে। এ সময় আর কোন বিপদে পড়তে চাই না।'

'পুলিশকে জানালে হত না?'

'জানাব। দেখে যাই, কি করছে হেবলরা।'

বেড়ার ধারে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। সেগুলোর আড়ালে আড়ালে গেটের

দিকে এগোল তিনজনে। গেটের কাছে এসে আঙিনায় ঢুকতে যাবে এই সময় দরজা খোলার শব্দ হলো। কটেজ থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক।

লোকটা বেরোতে একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। পরনে মাথাঢাকা আলখেল্লা। নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল। তার পেছনে বেরোল আরেকজন। অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ।

লোকগুলো আরেকটু কাছে যেতেই দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কে, পল?'

হেবলের গলা চিনতে পারল গোয়েন্দারা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল প্রথম লোকটা, 'আমার সঙ্গে ককারও আছে।'

'গুড। আমার সিগন্যাল দেখেছ?'

'দেখেছি। গোলমাল হয়েছে নাকি কিছু?' জানতে চাইল দ্বিতীয় লোকটা।

'এখনও হয়নি, তবে হওয়ার আশঙ্কা করছি। এসো, ভেতরে এসো, সব বলছি।'

ভেতরে চলে গেল তিনজনে। দরজাটা লাগিয়ে দিল।

ওরা কি বলে শোনার জন্যে পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। আগে রয়েছে কিশোর। যেই সে বেরিয়েছে পাশের আরেকটা ঝোপ থেকে দুটো মূর্তি নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে চেপে ধরল ওকে। কথা বলে উঠল পরিচিত একটা কণ্ঠ, 'ধরেছি এক ব্যাটাকে!'

কিশোর বলল, 'ডন, তুমি! আরে ছাড়ো ছাড়ো, আমি কিশোর!'

মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গেল যেন ডন। অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা? আমি ভাবলাম বুঝি…তা কি জন্যে এসেছ?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন।'

ঝোপ থেকে বেরোল মুসা আর রবিন। পাশের ঝোপ থেকে বেরোল আরও একজন। তাকে চিনতে পারল রবিন, ডনের বন্ধু হ্যারিস, ডনের অনুরোধে সেদিন রাতে যাকে আনতে মিডভেলে গিয়েছিল সে আর কিশোর।

একে অন্যের কথা শোনার জন্যে কটেজের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে গেল ওরা।

ডন জানাল, রেডকে যেদিন ঘুম পাড়িয়ে চুরি করা হয়েছে, সেদিন থেকেই ভীষণ খেপে গেছে সে। চোখ রেখেছে যাদের সন্দেহ হয় তাদের ওপর, বিশেষ করে আয়ানের ওপর। লক্ষ করেছে হেবলের সঙ্গে আয়ানের সম্পর্ক খুব গভীর। তার ধারণা, কিছু একটা করছে ওরা। তাই এসেছে কটেজের ওপর নজর রাখতে।

কিশোর জানাল, কি করে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে ওরা। কি কি ঘটছে ওখানে, সংক্ষেপে জানাল।

মাথা দুলিয়ে ডন বলল, 'হুঁ, তার, ডিনামাইট, ড্রিল মেশিন এ সব জিনিস চুরির একটা ব্যাখ্যা তাহলে পাওয়া গেল। খনি খোঁড়ার জন্যে ওসব নিয়ে যায়

ব্যাটারা। কিছু কিছু জিনিস বিশেষ অনুমতি ছাড়া দোকানে গিয়ে কিনতে পারবে না, এই যেমন ডিনামাইট। এগুলো কিনতে সরকারি অনুমতি লাগে। কেন দরকার লিখিতভাবে জানাতে হয়। খনিটা রয়েছে অন্যের সম্পত্তিতে, ওরা খুঁড়ছে চুরি করে, বেআইনী ভাবে, সরকারকে কিছু জানাতে পারবে না। তাই ঝামেলায় না গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব চুরি করে নিচ্ছে। নিশ্চয় টাকার লোভ দেখিয়ে কিংবা খনির শেয়ার দেয়ার কথা বলে আয়ানকে হাত করেছে হেবল।'

'স্টোর রুমে মাল বোঝাই অন্য বাক্সগুলো যে দেখে এলাম, সেগুলোর কি ব্যাখ্যা?' মুসার প্রশ্ন।

কিশোর জবাব দিল, 'ওগুলো চোরাই মাল। মনে নেই, দুই শ্রমিক ঠেলাগাড়ি ঠেলে আনার সময় কি বলেছিল—চুরির ব্যবসা আর করতে হবে না আমাদের? আমার ধারণা, একটা চোরের দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে হেবল, কিংবা সে নিজেই দলটার সর্দার। নানা জায়গা থেকে জিনিস চুরি করে এনে সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে খনিটা আবিষ্কার করেছে। ডন ঠিকই বলেছে, খনির কাজ করার জন্যেই ওদের গুদাম থেকে জিনিস চুরি করছিল ওরা। মাটির নিচে সুড়ঙ্গ আছে, এটাও কোনভাবে জেনেছে হেবল, তাই কাজের সুবিধের জন্যে মিসেস বেনসনের কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নিয়েছে।'

'এখুনি পুলিশকে জানানো দরকার,' হ্যারিস বলল। 'খনির ভেতরে ঢুকে হাতেনাতে ধরুক।'

'তার আগে আয়ানকে ধরে খানিকটা ধোলাই দিয়ে নিলে হত না?' রাগ যায়নি রেডের।

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মুসা বলল, 'কেন্ট ব্যাটাকেও কিছুটা নরম করা দরকার।'

কিশোর বলল, 'দলে ওরা অনেক। সামনাসামনি গিয়ে হামলা চালালে আমরা ওদের সঙ্গে পারব না। কিছু করতে হলে কৌশলে করতে হবে। তবে আমার মনে হয় রহস্যটার যখন সমাধান হয়েই গেছে, অহেতুক আর রিস্কের মধ্যে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে পুলিশকে খবর দেয়াই ভাল।'

'তো কি করতে বলো?' ডনের প্রশ্ন।

'এক কাজ করো, হ্যারিসকে নিয়ে তুমি থানায় চলে যাও। পুলিশ নিয়ে এসো। আমরা এখানে থেকে ততক্ষণ পাহারা দেব। কেউ বেরোয় কিনা দেখব। রেড থাকুক। দরকার পড়লে আমাদের সাহায্য করবে।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। তর্ক করল না ডন। হ্যারিসকে নিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল।

কটেজের কাছে এসে একটা ঝোপ দেখিয়ে তাতে মুসা, রবিন আর রেডকে লুকাতে বলল কিশোর।

'তুমি কি করবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমি আড়ি পেতে শুনে আসি ওরা কি আলোচনা করছে।'

কিন্তু দুই কদমও এগোতে পারল না কিশোর, তার আগেই খুলে গেল কটেজের দরজা। আলখেল্লা পরা লোক দুজন বেরিয়ে এল। ওদের চোখে পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি এসে ঝোপে ঢুকে পড়ল সে।

লোকগুলোর পেছনে বেরোল হেবল। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'যা যা বললাম মনে থাকবে তো? সব ঠিকঠাক মত হওয়া চাই, ভুল যেন না হয়। সবাইকে আসতে বলবে। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মশাল জ্বেলে সঙ্কেত দেবে। সৈকতে নৌকা রেখে আসতে বলবে। কাজ সেরে আবার নৌকায় করেই ফেরত যাবে ওরা…'

'আর বলতে হবে না,' পল বলল, 'মনে থাকবে। ও হ্যাঁ, ট্রাকটা কোনখানে?'

'মিসেস বেনসনের বাড়ির কাছে একটা বড় ঝোপ আছে না গাছপালায় ঘেরা, তার মধ্যে।'

'ঠিক আছে, সব মাল ঠিকমতই পাচার হবে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। তবে আরও কিছুদিন সময় পেলে ভাল হত…'

'উপায় নেই। ওই বিচ্ছুগুলো বড় বেশি পিছে লেগেছে। ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। সাংঘাতিক চালাক। পুলিশ কিনারা করতে পারেনি এমন সব কেসের সমাধান করে ফেলেছে। একবার যাদের পেছনে ওরা লাগে, ধ্বংস না করে দিয়ে ছাড়ে না। সব পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে আমাদের। যতখানি পারা যায়, নিয়ে পালাতে হবে, জানাজানি হয়ে যাওয়ার আগেই…'

অন্ধকারে মুচকি হাসল কিশোর। বুঝল, ওদের কথাই বলছে হেবল।

'বুঝলাম,' হাত তুলল পল। 'চলি। গুড-বাই।'

'সাবধানে থাকবে। কোন ভুল যেন না হয়। এত কষ্ট করে শেষ মুহূর্তে সব নষ্ট করতে চাই না।'

'নষ্ট হবে না।'

ককারকে নিয়ে গেটের দিকে এগোল জিম।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'বেরিয়ে চেপে ধরব নাকি দুটোকে?'

'না,' মানা করল কিশোর, 'ওদের আটকে ফেললে পুরো দলটাকে ধরা যাবে না। ওরা গিয়ে সঙ্কেত দিক, বাকিগুলোও আসুক। নিশ্চয় কোনখানে বসে সঙ্কেতের অপেক্ষায় পাহাড়ের দিকে এখন তাকিয়ে আছে দলের কেউ। মশালের আলো দেখলেই গিয়ে সবাইকে খবর দেবে, নৌকা নিয়ে চলে আসবে। ওই সময় ধরতে হবে ওদের। আশা করি ততক্ষণে পুলিশ চলে আসবে।'

জিম আর ককার বেরিয়ে গেল।

ঝোপে বসে পাহারা দিতে লাগল গোয়েন্দারা। কারও চোখ কটেজের দিকে, কারও পাহাড়ে।

ঘটছে না কিছু।

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেল মুসা। বলল, 'আমাদের আসল কেসের সমাধানই হয়নি এখনও, যে কাজ করতে এখানে এলাম। মথ চুরির সঙ্গে এ সব চোরের কি সম্পর্ক?'

'সবার না হলেও একজনের সম্পর্ক তো অবশ্যই আছে,' কিশোর বলল।

'বুঝলাম না।'

'আমার ধারণা, মথ চুরি করছে কেন্ট।'

অবাক হয়ে মুসা আর রবিন একসঙ্গে বলে উঠল, 'কেন্ট!'

এ সব কথা কিছুই জানে না রেড, চুপ করে রইল।

আবার বলল কিশোর, 'হ্যাঁ, কেন্ট। প্রথম থেকেই ওর ওপর সন্দেহ ছিল আমার, সেটা জোরাল হলো ফোরম্যান বেনের কাছে ওর কথা শুনে—পোকামাকড়, পতঙ্গ, এ সবের ব্যাপারেও কেন্টের আগ্রহ আছে। আজকে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে ঘুরে আসার পর নিশ্চিত হয়েছি, কেন্টই মথ চুরি করছে। হেবলের সঙ্গে তার খাতির আছে, কটেজের ট্র্যাপ ডোর দিয়ে সুড়ঙ্গে নামতে তার কোন অসুবিধে হয় না। সুড়ঙ্গ দিয়ে চলে যায় মিস্টার ডালডার ল্যাবরেটরিতে, সেখান থেকে গ্রীনহাউসে ঢুকে মথ চুরি করে নিয়ে ফিরে আসাটা সহজ কাজ। সুড়ঙ্গে যে পায়ের ছাপ দেখেছি, ওটা ওরই জুতোর, বাজি রেখে বলতে পারি। সুড়ঙ্গের মাথার গোপন দরজাটার কথা জানেন না মিস্টার ডালডা, তা হলে উনিও বুঝে ফেলতেন কি করে মথ চুরি যাচ্ছে।'

'তারমানে,' কিশোরের কথা শুনে রবিনও নিশ্চিত হয়ে গেছে কেন্টই মথ-চোর, 'ওই ডালটা সে-ই ফেলে এসেছিল গ্রীনহাউসে, আমরা যেটা পেয়ে মিস্টার ডালডাকে দিলাম? সব বুঝেছি। ওই মশাল হাতেই সুড়ঙ্গে চলাফেরা করত কেন্ট। আমার মনে হয় মথ চুরি করতে গিয়ে কোন কারণে তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর সময় মশাল ফেলেই পালিয়েছিল সে। তাই ওটা পড়ে ছিল গ্রীনহাউসের ভেতরে।'

'তোমরা বলতে চাইছ,' মুসা বলল, 'ওয়াকার ফার্মের ল্যাবরেটরি থেকে আফ্রিকান লিলির পরাগের শিশিও সে-ই সরিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'ওরই কাজ। চুরি করে তুলে দিয়েছে ওর বন্ধু হেবলকে।'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না, মথ চুরি কেন করে হেবল? কি লাভ?'

'কারণ সেই একটাই—মিস্টার ডালডার মতই তারও রেশমপোকায় আকর্ষণ। আমার বিশ্বাস, কোনখানে গোপন একটা গ্রীনহাউস তৈরি করেছে সেও, যেখানে নিয়ে গিয়ে রাখে পোকাগুলোকে...'

'কত রকমের পাগল যে আছে দুনিয়ায়, পোকা নিয়েও খামচাখামচি! আরেকটা প্রশ্ন, এর মধ্যে ম্যাট ডগলাস আসছে কোত্থেকে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল কিশোর, 'সেটাই বুঝতে পারছি না। ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে...'

কনুই দিয়ে ওর গায়ে গুঁতো মারল রবিন। ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি হলো?'

হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই যে আলো! পাহাড়ের মাথায় সঙ্কেত দিচ্ছে জিম আর ককার!'

ঠিক এই সময় হাইওয়েতে গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। পুলিশও এসে গেছে।

বিশ

পরদিন বিকেলে মিসেস বেনসনের বাড়িতে চায়ের আসর বসল। অনেকেই এসেছে—মিস্টার ডালডা, তাঁর ফোরম্যান ম্যাট ডগলাস, তিন গোয়েন্দার বন্ধু ডন ব্রেনটন, হ্যারিস ফার্গুসন, রেড জোনাথন। অনেক লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, তাই মিসেস বেনসনকে সাহায্য করছে রবিন আর মুসা। কিশোর সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বসার ঘরে এনে বসিয়েছে।

আলোচনার মূল বিষয়, খনি রহস্য।

হেবল আর তার দলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কেন্টকেও ধরেছে। কিশোরের ধারণাই সত্যি হয়েছে, কেন্টই মথ চুরি করত। ওর কাছ থেকে সব কথা আদায় করেছে পুলিশ। তার কথামত বনের ভেতরে তার গ্রীনহাউসটাও খুঁজে বের করেছে। চুরি করা সমস্ত মথ, পোকা আর গুটি নিয়ে এসে ফিরিয়ে দিয়েছে মিস্টার ডালডাকে।

এত প্রশংসা করেছেন তিনি তিন গোয়েন্দার, হেসে এক সময় বলেই ফেলেছে মুসা, 'আর করবেন না, স্যার। এমনিতেই ঢোল বানিয়ে ফেলেছেন। আর করলে ফেটে যাব।'

তার পরেও থামেননি তিনি।

এখন আবার মথের কথা উঠতে মুসা বলল, 'সব রহস্যেরই তো সমাধান হলো, একটা প্রশ্নের জবাব এখনও বাকি। এ সবের সঙ্গে ম্যাট ডগলাসের রহস্যময় আচরণের কি সম্পর্ক?'

মিটিমিটি হাসছেন ডালডা। বোঝা গেল, তিনি সব জেনে গেছেন। ম্যাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জবাবটা দিয়ে দাও ওদের।'

অহেতুক কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ম্যাট। দ্বিধা করতে লাগল। মনে হলো, লজ্জা পাচ্ছে বলতে। শেষে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বলল, 'ছোটবেলা থেকেই আমি গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত। শার্লক হোমস আর পোয়ারোর কাহিনী পড়ে পড়ে খালি গোয়েন্দা হওয়ার শখ হত। কোন রহস্য পেলেই সেটা সমাধানের চেষ্টা করতাম। মিস্টার ডালডার ফার্মে যখন মথ চুরি শুরু হলো, একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। তাঁকে না জানিয়ে তলে তলে শুরু করে দিলাম তদন্ত। রকি বীচে যখন গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে গেলেন তিনি, রাগ

লাগল খুব। মনে হতে লাগল আমি বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। অন্য কোন গোয়েন্দা এসে কেসের তদন্ত করবে, এটা সহ্য করতে পারলাম না। তাই টেলিফোনে ভয় দেখিয়ে তাঁকে হুমকি দিয়েছি, যাতে বাইরের গোয়েন্দা নিয়োগ না করেন। তোমরা আসতেই বুঝে গেলাম, তদন্ত করতে এসেছ। রকি বীচে খোঁজ করে বের করে ফেললাম তোমাদের পরিচয়। হুমকি দিয়ে চিঠি লিখলাম যাতে ভয় পেয়ে চলে যাও।' একটানা অনেক কথা বলে দম নেয়ার জন্যে থামল সে। তারপর নিরাশ ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু লাভ হলো না। কেসের সমাধান শেষ পর্যন্ত তোমরাই করলে!'

হাসি পেল মুসার। ম্যাট দুঃখ পাবে ভেবে হাসল না। বলল, 'একটা কথা বলবেন কি? গ্রীনহাউসের কাঁচ যেদিন ভাঙল, ওরকম ছুটে পালালেন কেন?'

হেসে উঠলেন ডালডা।

মুখ নিচু করে ফেলল ম্যাট।

হাসতে হাসতে ডালডা বললেন, 'সবই তো বললে, এটা আর বাকি থাকে কেন? বলে ফেলো?'

মুখ তুলল ম্যাট। লাল হয়ে গেছে। বলল, 'ভয় পেয়েছিলাম, প্রচণ্ড ভয়। চোরটাকে দেখেছিলাম আমি গ্রীনহাউসের ভেতর। মাথাঢাকা আলখেল্লা পরা ছিল বলে চিনতে পারিনি। কাঁচের গায়ে টোকা দিয়ে তাকে থামতে ইশারা করেছিলাম। হাতের মশাল দিয়ে আমাকে বাড়ি মারল সে। বাড়ি লাগল কাঁচে, ভেঙে গেল। আমি মুখ সরিয়ে না নিলে আমার মুখেই লাগত ভাঙা কাঁচ। ঝনঝন করে এমন শব্দ হলো, ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, মিস্টার ডালডা শুনে ফেলে দেখতে আসবেন, আমাকে চোর ভাববেন। তাই তাড়াতাড়ি পালালাম। ছুটে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম।'

শখের গোয়েন্দার দুর্গতির কাহিনী শুনে হাসি আর চাপতে পারল না মুসা। তার সঙ্গে রবিন আর কিশোরও হেসে উঠল।

ওদের হাসিকে আর পরোয়া করল না ম্যাট, বলল, 'মিস্টার ডালডা তখন ল্যাবরেটরিতে ছিলেন বলে কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পাননি।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মাঠের মধ্যে সেদিন রাতে সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? তদন্ত করতেই নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাট। 'হ্যাঁ। তবে মাঠে নেমেছি বাধ্য হয়ে। পাহাড়ে আলোর সঙ্কেত দেখে বেরিয়েছিলাম। রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম আমি, এই সময় গাড়ির হেডলাইট দেখলাম। ভাবলাম, কে না কে আছে গাড়িতে, তোমরাও থাকতে পারো, দেখলে সন্দেহ করবে; তাই চট করে গিয়ে লুকালাম খেতের মধ্যে। কিন্তু ঠিকই তোমাদের চোখে পড়ে গেলাম। নেমে দেখতে এলে তোমরা। এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। এমন কি দেখেছিলে তোমরা যে খেতের মধ্যে ঢুকলে?'

'সাইকেলের পেছনের গ্লাস রিফ্লেক্টর,' জবাব দিল মুসা। 'হেডলাইটের আলো পড়ে ঝিক করে উঠেছিল।'

'শুধু এই! আর কিছু না?' অবাক হলো ম্যাট।

'না।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ফোরম্যান। 'নাহ্, আমাকে দিয়ে গোয়েন্দাগিরি হবে না কোনদিন! এতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বুদ্ধি আর সাহস আমার নেই...'

বাধা দিয়ে ডালডা বললেন, 'বরং যেটা তুমি ভাল পারো—মথের পরিচর্যা, সেটাই করা উচিত।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। এখন থেকে শুধু তা-ই করব।'

জাল নোট

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারি করছে তিন গোয়েন্দা।

'গোয়েন্দাগিরিটা তাহলে ভালমতই ধরলেন রাশেদ আংকেল,' রবিন বলল। 'কেসটা কি?'

'যে ভাবে ছুটে চলে গেল লস অ্যাঞ্জেলেসে,' কশোর ব লল, 'তাতে তো মনে হলো বেশ জরুরী কিছু। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বোঝা যাবে।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখল রবিন। 'ট্রেন লেট।'

'গলা শুকিয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'শুকনো মুখে হাঁটতে ভাল লাগছে না। দাঁড়াও, চকলেট কিনে আনি।'

স্টলের দিকে চলে গেল সে।

পাশের প্লাটফর্মে গর্জন করতে করতে ঢুকল একটা ট্রেন। ব্রেক কষায় ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তিশালী চাকার সঙ্গে লাইনের ঘর্ষণের ফলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটল। থামল ট্রেন।

সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর, 'দেখো, ওঠার মত একজন যাত্রীও নেই। আজকাল ট্রেনে তেমন আর চড়ে না মানুষ।'

'এত সুন্দর বাস আর প্লেন থাকতে কে যায় ট্রেনের ঘটাং ঘটাং সহ্য করতে,' রবিনও তাকিয়ে আছে ট্রেনটার দিকে।

'তবে যাই বলো, ট্রেনে চড়ারও মজা আছে।'

'আছে, হাতে যদি সময় থাকে। আর জরুরী কাজে না বেরিয়ে বেড়াতে বেরোও।'

চলতে আরম্ভ করেছে ট্রেন, এই সময় স্টলের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এল একজন লোক। দৌড় দিল ট্রেনের দিকে। সামনে দিয়ে কামরাগুলো সরে যাচ্ছে। শেষ কামরাটা আসতে মরিয়া হয়ে লাফ দিল সে। একটা স্টলের আড়ালে চলে যাওয়ায় উঠতে পারল কিনা দেখা গেল না।

বগির দরজায় লোকটাকে খুঁজছে রবিনের চোখ। 'পাগল নাকি! এ ভাবে রিস্ক নেয়!'

'কে রিস্ক নিল?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা। দুজনে ঘুরে তাকাতেই দুটো চকলেট বাড়িয়ে দিল, 'নাও।' নিজে একটা চিবুচ্ছে।

'একটা লোক। ট্রেনে ওঠার জন্যে এমন দৌড় দিল··· মুসার হাত থেকে চকলেট নিল রবিন।

'লাফ দিয়ে শেষ বগিতে উঠল যে ওই লোকটা তো? আমার কাছ থেকে

বিশ ডলারের ভাঙতি নিল। আমি দিতে দিতে ট্রেন ছেড়ে দিল। টাকাগুলো মুঠো ভরে নিয়েই দিল দৌড়, গুণে দেখারও সময় পেল না।'

'জানল কি করে তোমার কাছে টাকা আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চকলেট কিনে টাকা দেয়ার জন্যে মানিব্যাগ বের করেছিলাম।'

'বাপরে! অত টাকা নিয়ে বেরিয়েছ কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'ও, বলা হয়নি তোমাদের, কাজ করিয়ে যত টাকা দিয়েছে মা, সব জমিয়ে রেখেছি। ভাবছি, যাওয়ার পথে হ্যামারসনের সায়েন্টিফিক স্টোরটা ঘুরে যাব।'

হাসল কিশোর। 'নতুন আবার কোন্ হবি ধরলে?'

কিছুদিন পর পরই একটা করে নতুন হবি ধরে মুসা। সেটা একঘেয়ে হয়ে গেলে কয়েকদিন চুপ থাকে, তারপর আবার অন্যকিছু নিয়ে মেতে ওঠে।

'এটাকে ঠিক হবি বলা যাবে না,' জবাব দিল মুসা, 'কাজ। একটা টুইন-লেন্স হাই-পাওয়ারড মাইক্রোস্কোপ কিনব। সঙ্গে ইলুমিনেটরও আছে।'

'মাইক্রোস্কোপ!' কপাল কুঁচকে গেল রবিনের। 'এ জিনিস দিয়ে কি করবে? অঙ্কের ফর্মুলাগুলো বড় করে দেখে মুখস্থ করবে, যাতে ভুলে না যাও?'

হেসে ফেলল কিশোর। অঙ্ক একেবারেই পারে না মুসা। করতে বসলেই বকা খায় টীচারের কাছে।

'দেখো, ইয়ার্কি নয়,' প্লাটফর্মে পড়ে থাকা একটা পাথর লাথি মেরে সরাল মুসা। 'আমি ঠিক করেছি, অঙ্কের ধারে কাছে যাব না আর, বায়োলজি পড়ব। নেচারালিস্ট হব।'

হাসতে লাগল রবিন, 'তোমার অফিসের সাইনবোর্ডটা আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি—মুসা আমান, বিগ-গেম নেচারালিস্ট...'

'ওই যে, গাড়ি আসছে,' কিশোর বলল।

গাড়ি এসে দাঁড়াল প্লাটফর্মে। কম্পার্টমেন্টগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল ওরা। কোনটাতেই দেখা গেল না রাশেদ পাশাকে।

মিনিটখানেক থেমে আবার ছেড়ে দিল ট্রেন। রাশেদ পাশা নামলেন না।

'আংকেল মনে হয় কোন কারণে রয়ে গিয়েছেন,' রবিন বলল, 'চারটের ট্রেনে আসবেন।'

ঘড়ি দেখল মুসা, 'অনেক সময় আছে। চলো, আমার মাইক্রোস্কোপটা নিয়ে আসি।'

স্টেশনের বাইরে রাখা মুসার জেলপিতে এসে উঠল ওরা। পেট্রল গজের দিকে তাকিয়ে রবিন দেখল, কাঁটাটা স্থির হয়ে আছে Empty-র ঘরে। 'তেল তো নেই। যাব কি করে?'

'তেল আছে। গজটা মেরামত করতে হবে,' গাড়ি স্টার্ট দিল মুসা।

শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় ঢুকল ওরা। যানবাহনের ভিড় বেশি। স্টোরের সামনে পার্কিং স্পেসটা ভর্তি হয়ে আছে। কিছুদূরে, রাস্তার অন্যপাশে একটা খালি জায়গা দেখে গাড়ি রাখল সে।

গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে এগোনোর সময় রবিন বলল, 'আশা করতে পারি, আগামী বছর নাগাদ তুমি বিজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছ...'

ওর কথা শেষ হলো না। রাস্তার মোড় থেকে সাইকেলে করে তীব্র গতিতে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। সামনে পড়ল বিরাট একটা স্যালুন গাড়ি, জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে সাবধান করল ছেলেটাকে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ছেলেটা। ধাক্কা লাগে লাগে, শেষ মুহূর্তে ঘুরিয়ে দিল সাইকেলের হ্যান্ডেল। সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে মোড়ের কাছে চলে গেল স্যালুনটা। মাতাল হয়ে গেছে যেন, রাস্তায় থাকতে পারছে না। গুঁতো খেল গিয়ে ওপাশের দেয়ালে। বিশ্রী একটা ধাতব শব্দ তুলে দুমড়ে গেল নাকটা।

হই-হই করে উঠল দু'চারজন পথচারী।

মোড়ের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন, 'খেপা নাকি ড্রাইভারটা!'

ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা।

ছেলেটাকে ধরে তুলল রবিন আর কিশোর। দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দিল যাতে হেলান দিতে পারে। সাইকেলটা তুলে সোজা করে রাখল মুসা।

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল কিশোর, 'ব্যথা পেয়েছ?'

হাঁটু আর কনুই ছড়ে গেছে ছেলেটার। সেসব জায়গায় হাত বোলাতে বোলাতে বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস। সেই তুলনায় বেশি লম্বা। বড় বড় বাদামী চোখ। 'না, তেমন ব্যথা পাইনি। থ্যাংক ইউ।'

লোক জমে গেল চারপাশে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল মধ্যবয়েসী একজন লোক। ছাই হয়ে গেছে চেহারা। কাঁপা গলায় বলল, 'ব্রেক ফেল করল...কিভাবে যে কি ঘটে গেল বুঝতেই পারলাম না!'

'ভাগ্য ভাল আপনার, ছেলেটার কিছু হয়নি,' গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর।

লোকজন সরিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল একজন পুলিশ অফিসার। তিন গোয়েন্দাকে চেনে। 'কি হয়েছে, কিশোর?'

কাঁপা গলায় কৈফিয়ত দিতে আরম্ভ করল স্যালুনের ড্রাইভার।

তার কথায় কান না দিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল অফিসার, 'কি হয়েছে? ব্যথা পেয়েছে ও?'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'না, সামান্য ছড়ে গেছে।'

অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে স্যালুনের ড্রাইভার। পকেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বের করে ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত। নাও, ওষুধের খরচ।'

রাস্তায় গাড়ি জমে গেছে। একসঙ্গে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে সবাই। ভিড়ের জন্যে এগোতে পারছে না। চিৎকার করে, হুইসেল বাজিয়ে ওদের সরাতে ব্যস্ত হলো অফিসার। মধ্যবয়েসী লোকটার অনুরোধে রবিন গেল একটা টো-ট্রাকের জন্যে ফোন করতে, স্যালুনটাকে গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে।

দুই

ভিড় কমে গেল। টো-ট্রাক এসে স্যালুনটাকে নিয়ে গেল। ছেলেটাও যাবার জন্যে উঠল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, 'হায় হায়, আমার খাম!'

এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করল মুসা আর রবিন। মুসার চোখে পড়ল, লম্বা একটা ম্যানিলা এনভেলপ রাস্তার একধারে পড়ে রয়েছে। তুলে আনল গিয়ে। ছেলেটাকে দেখাল, 'এটা?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম, গেল বুঝি হারিয়ে।'

ভারী খামটা এগিয়ে দিল মুসা।

ঠিকানাটার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে

বারনি মেল, জনসন বিল্ডিং।

বাঁ পাশে নিচের দিকের কোণে লেখা:

ব্যক্তিগত।

হেসে খামটা হাতে নিল ছেলেটা। সাইকেলে চড়ল। 'অনেক করলে, ধন্যবাদ। আমার নাম টিম ফ্রিস্ক।'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা। কিশোর জানতে চাইল, 'রকি বীচেই বাড়ি?'

'না,' মাথা নাড়ল টিম, 'গরমের ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। খরচ চালানোর জন্যে পার্ট-টাইম চাকরি নিয়েছি একটা।'

'কোথায়?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল টিম, 'শহরের বাইরে।'

কিশোরের মনে হলো, ঠিকানা বলতে চায় না ছেলেটা। কৌতূহল চেপে রেখে সাইকেলটা দেখতে লাগল। আমেরিকায় তৈরি নয়, হ্যান্ডেল দেখেই বোঝা যায়। হাতলের দুই পাশ অনেক বেশি উঁচু, দেখতে অনেকটা U-র মত।

'বেশ সুন্দর কিন্তু সাইকেলটা,' বলল কিশোর। 'কোন দেশী?'

'বেলজিয়ামে তৈরি। খুব হালকা, চলেও ভাল। যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।' ওদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ দিয়ে প্যাডেলে চাপ দিল টিম।

সে চলে যাওয়ার পর কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কোথায় কাজ করে বলল না কেন?'

'আমারও অবাক লাগছে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, 'অনেক দেরি করিয়ে দিল। চলো, যাই, আমার মাইক্রোস্কোপের দোকানে।'

আবার স্টোরের দিকে এগোল ওরা।

কয়েক কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়াল রবিন। মুসার হাত চেপে ধরল, 'ওই দেখো, কে!'

মুখটা বাঁকা করে ফেলল মুসা, 'খাইছে! শুঁটকি! ও এখানে কি করছে?'

কিশোরও দেখেছে ছেলেটাকে। ওদেরই বয়েসী, কিন্তু অনেক লম্বা, একেবারেই রোগা, টিংটিঙে তালপাতার সেপাই। ওদের চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল ওরফে শুঁটকি টেরি। 'কারও পিছু নিয়েছে মনে হয় শুঁটকিটা। হাবভাব দেখো না, একেবারে জেমস বন্ড।'

'চলো তো দেখি কার পেছনে লাগল,' পা বাড়াতে গেল রবিন।

ওর হাত টেনে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও। সামনে যাওয়ার দরকার নেই, আড়ালে থেকে দেখা যাক।'

লম্বা, সুবেশী এক লোককে অনুসরণ করছে টেরি। হাতে একটা সুটকেস। বাইরে কোনখানে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মনে হয় লোকটা।

বড় বড় পা ফেলে লোকটার আগে চলে গেল টেরি। একটা দোকানের উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের জিনিস দেখার ভান করল। উদ্দেশ্য, তার পেছন দিয়ে পার হয়ে যাক লোকটা। আনাড়ি কাজ করছে সে, কোনদিকে তাকিয়ে আছে সেটাও লক্ষ করছে না। করলে দেখতে পেত, দোকানটা শূন্য, মালপত্র কিছু নেই। ব্যাপারটা লোকটার নজরে পড়লে যে সন্দেহ করে বসতে পারে সে, সেই পরোয়াও করছে না।

পার হয়ে গেল লোকটা। আবার পিছু পিছু কয়েক পা গেল টেরি। তারপর গায়ের জ্যাকেট খুলে হাতে নিয়ে, পকেট থেকে একটা সানগ্লাস বের করে পরল।

হেসে ফেলল মুসা, 'বাহ্, এক্কেবারে জেমস বন্ডের সাগরেদ। ব্যাটা ছাগল। ধরা পড়বে তো এখুনি।'

'পড়ুক না,' হাসতে লাগল রবিন, 'মজাটা দেখি।'

কিশোরের নজর লোকটার দিকে। আনমনে বিড়বিড় করল, 'ওর পিছু নিয়েছে কেন শুঁটকি?'

'দেখো আবার, ছিনতাই করার তালে আছে নাকি। লোকটার সুটকেসে টাকা-পয়সা থাকতে পারে।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

ঝট করে একটা দোকানের দরজার আড়ালে চলে গেল টেরি। আস্তে করে মুখের একপাশ বের করে এক চোখ দিয়ে তাকাল, লুকোচুরি খেলার সময় বাচ্চা ছেলে যেমন ভঙ্গিতে তাকায়। একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। টেরির আচরণে অবাক হয়েছে লোকটা। পিছু নিয়েছে কেন বুঝতে পারল না বোধহয়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে হাঁটতে শুরু করল।

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিল টেরি। ব্লকের শেষ মাথায় গিয়ে পাশের একটা দোকানে ঢুকে পড়ল লোকটা। কোন রকম দ্বিধা না করে

টেরিও ঢুকে পড়ল।

'চলো চলো, দেখি কি করে! এই দৃশ্য পয়সা দিলেও পাব না,' দৌড়াতে শুরু করল মুসা।

কিশোর আর রবিনও ছুটল। দোকানের কাছে এসে দেখল, বড় একটা লাল বেলুনের আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে চোখ রাখছে টেরি। লোকটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টুথপেস্ট কিনছে। পাশে মাটিতে নামিয়ে রেখেছে সুটকেসটা। পেস্ট কিনে, সুটকেস তুলে নিয়ে দাম দেয়ার জন্যে ক্যাশিয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টাকা বের করে দিল।

হঠাৎ বেলুনটার আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল টেরি। তার কনুই লেগে একপাশে কাত হয়ে গেল একজন ক্রেতা। সামলে নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল টেরিকে, ততক্ষণে সরে গেছে টেরি। সোজা গিয়ে লম্বা লোকটার হাত চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, 'মিয়া, চলো আমার সঙ্গে, থানায়!'

এমন ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল লোকটা, যেন টেরি একটা পাগল। ক্যাশিয়ার মহিলাও একই দৃষ্টিতে তাকাল। টেরি আর লোকটাকে ঘিরে ফেলল কয়েকজন ক্রেতা।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

দোকানে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

ঝাড়া মেরে টেরির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল লোকটা। কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল, 'গাঁজা খেয়েছ নাকি!'

'কি খেয়েছি সেটা থানায় গেলেই বুঝতে পারবে,' আবার লোকটার হাত চেপে ধরল টেরি। ক্যাশিয়ারকে বলল, 'যে নোটটা দিয়েছে ও, ভাল করে দেখুন।'

অবাক হলেও নোটটা তুলে নিয়ে দেখল মহিলা। কিছু বুঝতে পারল না।

হাত বাড়াল টেরি, 'দিন।'

অনেকটা বিমূঢ় ভঙ্গিতে নোটটা টেরির হাতে তুলে দিল মহিলা।

কাছে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। টেরির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাকাল নোটটার দিকে। পাঁচ ডলারের নোট।

তোতলাতে শুরু করল টেরি, 'পাঁ-পাঁ-পাঁচ...' লোকটার হাত ছেড়ে দিল। বোকা হয়ে গেছে যেন। 'স-স-সরি...আমি...ভু-ভু...' ওর কলার চেপে ধরতে পারে লোকটা, এই ভয়ে আচমকা দৌড় মারল দরজার দিকে টেরি।

তিন গোয়েন্দাও ছুটল তার পেছনে।

দরজার বাইরে এসে ঘিরে ফেলল ওকে। কাঁধ চেপে ধরে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ওকে সন্দেহ করেছিলে কেন? কেসটা কি?'

হাঁপাতে লাগল টেরি, 'দেখো, ছাড়ো আমাকে! ভাল হবে না বলছি!'

'খারাপটা কার হয় দেখতে পাবে এখনই। রবিন, ডাকো তো ভদ্রলোককে। বলো, ছিনতাইকারী ধরেছি!'

ভয়ে ভয়ে দোকানের দিকে তাকাল টেরি। আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, 'ছাড়ো আমাকে!' ঝটকা দিয়ে নিচু হয়ে মুসার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে

দৌড় মারল।

মুসাকে ধরে ফেলল কিশোর, 'থাক, মরুকগে! আর যাওয়ার দরকার নেই।'

'কিন্তু কোন সন্দেহে লোকটাকে ধরল ও?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটা জানা যাবে, এমন কিছু জরুরী নয় এখন,' সায়েন্টিফিক স্টোরটা দেখিয়ে বলল, 'চলো।'

'বার বার বাধা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'আজ আর মাইক্রোস্কোপ কেনা হবে না।'

'বাধাটা তো মজারই,' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। 'ঠিকই বলেছ, শুঁটকির এই দুরবস্থা দেখার মজা পয়সা দিলেও পাওয়া যেত না।'

তিন

মুসাকে দেখে কাউন্টারের ওপাশে এসে দাঁড়ালেন স্টোরের মালিক মিস্টার গ্রেগরি। থলথলে মোটা শরীর। হাসিখুশি মানুষ। মাথায় খাড়া খাড়া সাদা চুল। 'মাইক্রোস্কোপ নিতে এসেছ?'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। নেচে উঠল সাদা চুল।

'এরা আমার বন্ধু, মিস্টার গ্রেগরি,' পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, 'রবিন···কিশোর।'

'তিন গোয়েন্দা, অ্যাঁ? খুশি হলাম,' কাউন্টারের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিস্টার গ্রেগরি। হাত মেলানো শেষ হলে মুসার দিকে তাকালেন, 'এক মিনিট। আমি মাইক্রোস্কোপটা নিয়ে আসি।'

'দাঁড়ান। টাকা নিয়ে যান। একবারে মেমো কেটে আনবেন।'

মানিব্যাগ বের করে ভেতরের সমস্ত টাকা কাউন্টারে রাখল মুসা। দশ আর বিশ টাকার নোটগুলো সাজিয়ে নিল প্রথমে। একবার গুণে বাড়িয়ে দিল, 'গুণে নিন।'

টাকা নিয়ে ভেতরের অফিসে চলে গেলেন মিস্টার গ্রেগরি।

অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দোকানের শো-কেসে সাজানো নানা রকম সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টসের ওপর দৃষ্টি ঘুরছে কিশোরের।

পাঁচ মিনিট কাটল। অস্থির হয়ে উঠল মুসা। 'কি ব্যাপার? এত দেরি করছেন কেন? বিক্রি করে ফেলেছেন নাকি জিনিসটা?'

ফিরে এলেন মিস্টার গ্রেগরি। চোখে উত্তেজনা।

হাতে বাক্স না দেখে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, মাইক্রোস্কোপ নেই? শেষ হয়ে গেছে?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার গ্রেগরি। নেচে উঠল চুল। বিশ ডলারের একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখো, এটা জাল। তুমি দিয়েছ।'

'খাইছে! জাল! তা কি করে হয়? আজ সকালেই তো ব্যাংক থেকে তুললাম।'

মিস্টার গ্রেগরির হাতের নোটটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন।

'সরি, মুসা, তুমি হয়তো জানো না, ইদানীং জাল নোট ছড়িয়ে পড়েছে বাজারে। কয়েক দিন আগে পুলিশ এসেছিল। সাবধান করে দিয়ে বলে গেল বিশ ডলারের নোটের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে। নইলে ধরতে পারতাম না। বুঝলাম না, ব্যাংকের ক্লার্ক চিনল না কেন এটা।'

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। 'মুসা, স্টেশনে একটা লোককে ভাংতি দিয়ে যেটা নিয়েছিলে, সেটা না তো?'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'জাল নোট দিয়ে ওকে ঠকিয়ে গেছে লোকটা।'

ভুরু কোঁচকাল মুসা, 'জেনেশুনে দিয়েছে বলতে চাইছ?'

'সেরকমই তো লাগছে,' কিশোর বলল। 'যে ভাবে দৌড়ে পালাল।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল রবিন। 'আমরা একজন লোককে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠতে দেখেছি। মাঝারি উচ্চতা, গাট্টাগোট্টা।'

'ওই লোকটাই,' মুসা বলল।

'আমরা দূর থেকে দেখেছি,' কিশোর বলল। 'তুমি আর কিছু দেখেছ ওর মধ্যে, যা দেখে সনাক্ত করা যায় ওকে?'

এক সেকেন্ড ভাবল মুসা। 'লোকটার নাক খুব চোখা। সানগ্লাস, স্লাউচ হ্যাট পরা। এই তো, আর কিছু দেখিনি।' জালনোটটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হয়ে গেল সে। রাগ দেখা দিল চোখে। 'তখন যদি খালি বুঝতাম…'

'কি আর করবে, ব্যাড লাক,' সহানুভূতির সুরে বললেন মিস্টার গ্রেগরি। 'মাইক্রোস্কোপটা নিয়ে যাও। পরে টাকা দিয়ে যেয়ো।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, বাকি নেব না।'

'আরে নাও, লজ্জার কি আছে। তুমি তো টাকা এনেইছিলে। উপকার করতে গিয়ে ঠকে গেছ। নিয়ে যাও। যখন পারো, টাকা দিয়ে যেয়ো।'

'না, থাক আপনার কাছেই। বাবার কাছ থেকে ধার নিতে পারলে আজ বিকেলেই নিয়ে যাব মাইক্রোস্কোপটা।'

'ঠিক আছে, তোমার যেমন মর্জি।'

দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরোতে যাবে মুসা, হাত তুলল কিশোর, 'দাঁড়াও। এক মিনিট। মিস্টার গ্রেগরি, জালনোটটা কি করবেন?'

'পুলিশকে দেব।'

'আমাদের দিয়ে দিন। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে পৌঁছে দেব।'

মুসার দিকে তাকালেন মিস্টার গ্রেগরি। দেবেন কিনা, দ্বিধা করছেন।

মাথা কাত করল মুসা, 'দিতে পারেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাদের খাতির আছে। আপনার আর কষ্ট করে যাওয়া লাগবে না।'

'না, কষ্ট না, ফোন করলেই চলে আসত থানা থেকে কেউ…ঠিক আছে,

নাও,' নোটটা কিশোরকে দিয়ে দিলেন দোকানদার।

বাইরে বেরিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কেন নিলে? ভালমত পরীক্ষা করার জন্যে?'

'হ্যাঁ,' নোটটা পকেটে রেখে দিল কিশোর।

ঘড়ি দেখল মুসা। 'চারটে বাজতে অনেক দেরি। বাড়ি যাব?'

'যাও।'

'চলো, আমাদের বাড়িতেই যাই। দুপুরে ওখানেই খাবে।'

'চলো।'

বাড়ি ফিরে গাড়িটা গ্যারেজের বাইরে রেখে রবিন আর কিশোরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। রান্নাঘরে কাজ করছেন মিসেস আমান। মুখ তুলে তাকালেন, 'মাইক্রোস্কোপ আনলি না?'

'না। গোলমাল হয়ে গেছে,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'মা, বাবা কোথায়?'

'মাছ ধরতে গেছে, বনের মধ্যে ডোবাটায়।'

কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, 'যাবে নাকি?'

'চলো।'

'মা, রান্না হয়েছে?'

'এই হয়ে এল। তোর বাবাকে বলিস চলে আসতে।'

অনেক বড় পুরানো একটা খামারবাড়ি কিনেছেন মিস্টার আমান। আশেপাশে বন, পাহাড়, নদী-নালা, ডোবা, মাঠ, সবই আছে। সোজা বনের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

মুসাদের সীমানার বাইরে বেশ অনেকটা দূরে পুরানো একটা পরিত্যক্ত ময়দার কলের পাশে বড় একটা বিল্ডিং দেখিয়ে কিশোর বলল, 'বাহ্, বানিয়ে ফেলল দেখি। এত তাড়াতাড়ি!'

'হ্যাঁ, কাজও শুরু করে দিয়েছে কারখানায়,' মুসা বলল। 'বাবার কাছে শুনলাম, ওয়ারনার করপোরেশন নামে একটা কোম্পানি জায়গাটা কিনে কারখানা বসিয়েছে। স্পেস মিসাইলের পার্টস বানায় ওরা।'

'মিলটাকেও তারমানে ভাঙবে।'

'নাও ভাঙতে পারে। ভাঙলে আমার খুব খারাপ লাগবে। ঐতিহাসিক জায়গা। ইনডিয়ানদের এলাকা ছিল এক সময়। ওখানে থাকত ওরা, কত কত লড়াই করেছে, শিকার করেছে। আজ কোথায় গেল! এমনি করে কালের আড়ালে হারিয়ে যায় সব, থাকে শুধু স্মৃতি। মিলটা বোধহয় ভাঙবে না ওরা, কারণ হুইলটা মেরামত করে নিয়েছে। আগের মতই ঘোরে ওটা। কোয়ার্টারেরও জানালা দরজা মেরামত করে দেয়ালে রঙ লাগিয়ে নিয়েছে। মিলের শ্রমিকরা বাস করবে মনে হয়।'

'কিন্তু হুইল মেরামত করল কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'এ জিনিস দিয়ে তো আর এখন গম ভাঙাবে না কেউ।'

'ভাঙতে হয়তো ওদেরও খারাপ লাগছে। পুরানো স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে চায়।'

'গিয়ে দেখতে হয় একদিন,' কিশোর বলল। 'পুরানো আমলের জিনিস দেখতে ভাল লাগে আমার।'

'আমারও,' রবিন বলল, 'দেখার সময় মনে হয়, লাফ দিয়ে বহু শত বছর আগে চলে গেছি।'

'আমি ভাবছি, একটা চাকরি চাইতে যাব কিনা ওদের কাছে,' মুসা বলল। 'বিশটা ডলার তো ঠকিয়ে গেল। বাবার কাছ থেকে নিই আর যার কাছে থেকেই নিই, টাকাটা শোধ করতে হবে তো।'

'দেবে ওরা চাকরি?'

'কেন দেবে না? নিশ্চয় অনেক শ্রমিক দরকার হয় ওদের।'

এগিয়ে চলল তিনজনে। বনে ঢুকতে কানে এল পানি বওয়ার কুলকুল শব্দ।

'দারুণ জায়গা!' মুসা বলল।

হাসল রবিন, 'রোজই তো একই কথা বলো।'

'জায়গাটা আসলেই দারুণ! বলব না তো কি।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা সরু পাহাড়ী নদীর পাড়ে চলে এল ওরা। নদী থেকে নালা বেরিয়ে গিয়ে একটা বড় গর্তে পড়ে ডোবার সৃষ্টি করেছে। তার পাড়ে বসে মাছ ধরছেন মিস্টার আমান।

ডাক দিতে যাবে মুসা, এই সময় ছিপ ধরে টান মারলেন তিনি। বাঁকা হয়ে গেল ছিপের মাথা, সুতো টানটান। পানিতে তুমুল তোলপাড়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়ল মুসার ওপর। 'ধরেছি ব্যাটাকে! অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাচ্ছে!'

হুইলে কড়কড় শব্দ তুলে সুতো টেনে নিয়ে চলেছে বিশাল মাছটা। নালাটার দিকে যাচ্ছে। বেরিয়ে যেতে চায় নদীতে।

কিন্তু নালার মুখের কাছে যাওয়ার পর হুইলের চাবি আটকে দিয়ে সুতো ছাড়া বন্ধ করে দিলেন মিস্টার আমান। টান লেগে আরও বেঁকে গেল ছিপের মাথা।

নিচের দিকে না তাকিয়ে দৌড় দিতে গিয়ে পিচ্ছিল শ্যাওলায় পা দিয়ে বসল মুসা। সড়াৎ করে আছাড় খেল। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল ঢাল বেয়ে। রবিন আর কিশোর ধরে না ফেললে গড়িয়ে পড়ে যেত পানিতে।

কাদা আর শ্যাওলায় মাখামাখি হয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছড়ে যাওয়া কনুই ডলতে ডলতে বলল, 'থ্যাংক ইউ!'

অনেক কায়দা-কসরৎ করে মাছটাকে টেনে তুললেন মিস্টার আমান। মুখ থেকে বড়শি খুলতে খুলতে আপন মনেই বললেন, 'পেকে গেছে একেবারে। কদিন ধরেই চেষ্টা করছি, খায়, খায় না, ঠোকর দিয়েও দেয় না, এমন করে। আজকে ধরা পড়ল।'

'ছেড়ে দেবে নাকি?' মাছটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

হাসলেন মিস্টার আমান। 'তুই কি বলিস?'

'আমি আর কি বলব। রোজই তো দুটো-চারটে ধরো আর ছাড়ো।

এটাই তোমার মজা।'

'না খেতে পারলে অহেতুক মাছগুলোকে মেরে লাভ কি?'

'এটাকে ছাড়া উচিত হবে না। খেয়ে ফেলব। খুব তেল হবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে,' জালের ব্যাগে মাছটা ভরতে আরম্ভ করল মুসা।

ফেরার পথে বাবাকে জাল নোটটার কথা বলল সে। চিন্তিত ভঙ্গিতে মিস্টার আমান বললেন, 'তুইও ঠকলি!'

'কেন, তুমিও পেয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ। একটা নোট আমার হাতেও পড়েছে। জাল যে চিনতেই পারিনি। পেট্রল নিতে গিয়ে ধরা পড়ল। ম্যানেজারের হাতে অন্তত তিনটে ওরকম নোট পড়েছে, সেজন্যেই চিনে ফেলল।'

'বিশ ডলারের নোট নেয়াই মুশকিল হয়ে গেল দেখি,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, এখন থেকে দেখেশুনে নিয়ো।'

'বিশ ডলারের নোটই নেব না আর,' মুসা বলল। 'তাহলেই ঠকতে হবে না।'

'বলা যায় না, অন্য নোটও জাল থাকতে পারে। সেজন্যে এখন থেকে কারও কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় ভাল করে দেখে নেয়াটাই উচিত হবে, যত টাকার নোটই হোক।'

চার

খেয়েদেয়ে আবার বেরোল ওরা। চলে এল শহরের বাণিজ্যিক এলাকায়। মিস্টার গ্রেগরিকে টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে তারপর যাবে স্টেশনে।

গাড়ি রেখে দোকানের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল মুসা, হাত খামচে ধরল কিশোরের, 'খাইছে!'

'কি হলো?'

'ওই দেখো, সেই লোকটা···যে আমাকে বিশ ডলারের নোটটা দিয়েছিল!'

'ধরছ না কেন!' বলে উঠল রবিন, 'জিজ্ঞেস করা দরকার, কেন জাল টাকা দিল।'

বিকেলের ভিড়। বাজার করতে এসেছে অনেক লোক। তাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে দৌড় দিল তিনজনে। লোকটার চোখে পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে মাঝে মাঝেই মাথা নিচু করে ফেলছে।

মোড়ের কাছে ট্রাফিক পোস্টের কাছে এসে দাঁড়িয়ে যেতে হলো। লাল আলো জ্বলেছে সিগনালে। পথচারীদের রাস্তা পেরোনো বন্ধ, এখন গাড়ি চলবে। প্রায় গায়ে গায়ে লেগে এগোচ্ছে গাড়িগুলো। একটু ফাঁকফোকর নেই যে তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওরা।

'উহ্,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল রবিন, 'আলো জ্বলার আর সময় পেল না!'

আলো যেন আর নিভতে চায় না। যখন লাল নিভে সবুজ জ্বলল, রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিনজনে, দেরি হয়ে গেছে তখন। নেই লোকটা।

পরের দুটো ব্লক উর্ধ্বশ্বাসে পেরিয়ে এল ওরা। প্রতিটি কোণ, গলি-ঘুপচিতে চোখ বোলাল, লোকটাকে দেখল না।

দাঁড়িয়ে গেল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'লাভ হলো না কিছু!'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের, 'একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, জেনেশুনেই তোমাকে জাল নোটটা দিয়েছিল লোকটা। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পালিয়েছিল। কিন্তু চলে যাওয়ার দুই ঘণ্টা পরেই আবার রকি বীচে ফিরে আসাটা অদ্ভুত।'

'হয়তো তখন বেশিদূরে যায়নি,' রবিন বলল, 'পরের শহর হেনরিভিলে গিয়েই নেমে গেছে। সেখান থেকে ফিরে আসতে সময় লাগে না।'

বাকি টাকা দেয়ার জন্যে হ্যামারসনস সায়েন্টিফিক স্টোরে ফিরে চলল ওরা।

'তুমি ঠিকই বলেছ,' রবিনের সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'ওখানে যাবার আরও কারণ থাকতে পারে—পকেটের বাকি নোটগুলো পাচার করে এসেছে। কিংবা ওখান থেকে নতুন নোটও আনতে পারে।'

'তোমার ধারণা,' মুসা বলল, 'হেনরিভিলে আছে ওদের জাল নোট বানানোর কারখানা?'

'থাকতে পারে, জানি না। তবে রকি বীচের বাজারে আরও জাল নোট না ছড়ালেই আমি খুশি হব।'

'তোমার খুশিতে তো আর চলবে না ওরা। তবে বেশি নোট বাজারে চলে এলে ব্যাপারটা সবার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।'

'কার কার কাছে জালনোট পাওয়া যায় সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে এখন থেকে,' রবিন বলল।

মিস্টার গ্রেগরিকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে মাইক্রোস্কোপটা নিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। বাক্সটা গাড়িতে রেখে কিশোরের দিকে ফিরল, 'কোনদিকে যাব?'

'থানায় যাও।'

ইয়ান ফ্লেচারকে অফিসে পাওয়া গেল। চেয়ারে বসেছিলেন তিনি, ওদের ঢুকতে দেখে সামনে ঝুঁকলেন, 'মনে হয় কোন খবর আছে?'

জাল নোটটা বের করে দিল কিশোর। 'এটা দেখুন।'

'জাল?' নোটটা হাতে নিলেন ক্যাপ্টেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মুসাকে ঠকিয়েছে একটা লোক। আর কেউ রিপোর্ট করেছে?'

'করেছে। বিশ ডলারের নোটের ব্যাপারে সিক্রেট সার্ভিস আমাদের সতর্ক করার পর অন্তত এক ডজন অভিযোগ পেয়েছি। যারা রিপোর্ট করতে এসেছে, সবাইকে বলে দিয়েছি খবরটা যাতে বাইরে না ছড়ায়।'

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'জালিয়াতদের ফাঁদে ফেলার জন্যে। পুলিশ নজর রাখছে না ভাবলে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবে ওরা, সাবধান হবে না, এই সুযোগে ওদের ধরার চেষ্টা করব।'

চেয়ারে বসল তিন গোয়েন্দা। যে লোকটা মুসাকে ঠকিয়েছে, তার চেহারার বর্ণনা দিল। ফাইল দেখলেন ক্যাপ্টেন। সন্দেহভাজনদের তালিকায় এরকম একজন লোকের কথা লেখা আছে।

'যতগুলোর কথা জেনেছি, এটাই সবচেয়ে চালাক। একেকবার একেক পোশাক পরে, জাল নোট শোভ করার সময় এক কাপড় দুবার পরে না।'

'শোভ?' বুঝতে পারল না মুসা।

'পেশাদার জালিয়াত যারা জাল টাকা চালান করে তাদের বলে শোভার, পাসারও বলা হয়।' নোটটা দুই আঙুলে টিপে ধরে ডলে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'বানিয়েছে খুব ভাল। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে।'

হাসল মুসা। 'সেই জিনিসও রেডি আছে।' বাক্স খুলে যন্ত্রটা বের করে দিল সে। 'আজকেই কিনলাম। কেনার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল।'

মাইক্রোস্কোপটা ঠিকঠাক করে ফোকাস করতে মিনিটখানেক লাগল। নোটটা ভাল করে দেখে মুখ তুললেন। 'হুঁ, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, সুতোটা পর্যন্ত, খালি চোখে কিছু ধরা যাবে না। তবে পুরো নিখুঁত যে করতে পারেনি, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়। দেখো, ছবিতে হালকা ধূসর রঙ, সুতোতেও গোলমাল রয়েছে।'

এক এক করে দেখল তিন গোয়েন্দা। মাথা দুলিয়ে কিশোর বলল, 'হুঁ, বুঝলাম। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখাতেই মিস্টার গ্রেগরি বুঝেছেন, নোটটা জাল।'

মাইক্রোস্কোপের আলো নিভিয়ে, ক্লিপ খুলে নোটটা বের করে আনলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের দিকে ঠেলে দিয়ে, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে আরেকটা বিশ ডলারের নোট বের করে দিলেন। 'আসল আর নকলের পার্থক্য বোঝো। কাগজেও তফাৎ আছে। আসলটার চেয়ে নকলটার কাগজ পুরু আর খসখসে।'

এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি। ওপাশের কথা শুনে রিসিভার রেখে দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকালেন, 'আমাকে এখুনি জরুরী কাজে বেরোতে হবে। নোটটা এনে ভাল করেছ। জাল নোটের ব্যাপারে আরও কোন সূত্র বা খোঁজ যদি পাও, আমাকে জানাবে। এই নোটটা আমি সিক্রেট সার্ভিসকে দিয়ে দেব। লোকটার কথাও বলব।'

অফিস থেকে বেরোনোর সময় রবিন বলল, 'কিশোর, শুঁটকিও জাল নোটের খোঁজ পেয়ে যায়নি তো? পাঁচ ডলারের নোট দেখে ও হতাশ হয়েছিল, মনে আছে?'

'আছে। আমি আগেই ভেবেছি কথাটা। এমন হতে পারে, লোকটার কাছে বিশ ডলারের জাল নোট দেখেই পিছু নিয়েছিল। লোকটা ওকে পিছু নিতে দেখে বুঝে ফেলে ওর উদ্দেশ্য, তাই দোকানে ঢুকে অন্য নোট দিয়েছে.'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ট্রেন আসার সময় হয়েছে। চলো, যাই। আর দেরি করা যায় না।'

পাঁচ

ওরাও স্টেশনে ঢুকল, চারটের ট্রেনও এসে দাঁড়াল প্লাটফর্মে।

পেছনের বগি থেকে রাশেদ পাশাকে নামতে দেখল মুসা। 'ওই যে, এসে গেছেন।'

এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

তিনিও দেখতে পেয়েছেন ওদের। এগিয়ে এলেন।

'সকালের গাড়িতে এলে না কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'কাজ শেষ হয়নি,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।

ফেরার পথে গাড়িতে জাল নোটের খবর চাচাকে জানাল কিশোর, সাবধান করার জন্যে। সরাসরি তাকাল চাচার দিকে, 'তুমি ঠকোনি তো?'

পকেটে হাত দিলেন রাশেদ পাশা। মানিব্যাগ বের করে তিনটে বিশ ডলারের নোট বের করলেন। ভাল করে দেখে বললেন, 'মনে তো হয় না। এগুলো আসল।'

কিশোর আর রাশেদ পাশাকে ইয়ার্ডে নামিয়ে দিল মুসা। রবিন বসে রইল গাড়িতে। ড্রাইভিং সীটের জানালা দিয়ে মুখ বের করে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কাল কি কাজ আমাদের?'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'এখনও জানি না। ওয়ারনার মিলে সত্যি যাবে নাকি চাকরি করতে?'

'যাব। টাকা দরকার।'

নামটা শুনে কান খাড়া হয়ে গেল রাশেদ পাশার। 'কি মিল বললি?'

'ওয়ারনার মিল। মুসাদের বাড়ির কাছে একটা পুরানো ময়দার কল আছে। চারপাশে বিরাট জায়গা। সেখানে কারখানা বসিয়েছে ওয়ারনার করপোরেশন নামে একটা কোম্পানি। স্পেস মিসাইলের পার্টস বানায় ওরা। মুসা সেখানে চাকরি করতে যেতে চায়।'

'ভালই তো। চাকরি পেয়েও যেতে পারে। পয়সা আছে ওদের।'

'তুমিও নাম শুনেছ নাকি?'

'শুধু নামই নয়, ওখানকার কয়েকজন অফিসারকেও চিনি।'

একবার ভাবল মুসা, রাশেদ পাশাকে বলে অফিসারদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে, যাতে চাকরি চাইতে সুবিধে হয়। কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। নিজের কাজ নিজে করা ভাল। একেবারে অপারগ হলে তখন অন্যের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। কিশোরের দিকে তাকাল, 'কাল আর কোন কাজ না থাকলে চলো পিকনিকে যাই। সকালে চাকরির জন্যে দরখাস্ত

দিয়ে বেরিয়ে পড়ব। চলে যাব নদীর ধারে। কিছু বিশেষ পাথর জোগাড় করতে হবে।'

হাসল কিশোর, 'গবেষণার জন্যে? কাল থেকেই শুরু করে দিতে চাও। ঠিক আছে, তাই করা যাবে। যাব কাল।'

রাতে খাবার টেবিলে বসে জাল নোট নিয়ে চাচার সঙ্গে অনেক আলোচনা করল কিশোর। রাশেদ পাশা বললেন, তিনি শুনেছেন, জালিয়াতদের চক্রটা নাকি বেশ জোরাল। ওদের ধরার অনেক চেষ্টা করছে সিক্রেট সার্ভিস, পেরে উঠছে না।

নিজের কেসটা সম্পর্কে কিছু বললেন না তিনি। কিশোরও শোনার জন্যে চাপাচাপি করল না। গোয়েন্দাদের অনেক গোপন ব্যাপার থাকে। নিজে থেকে না বললে জানতে চাওয়াটা ঠিক নয়। সে নিজেও অনেক সময় অনেক কথা চেপে রাখে, সময় না হলে সহকারীদেরকেও বলে না।

সেদিন মাঝরাতে একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। বাইরে কেউ নড়াচড়া করছে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে ছুটে গেল সে। অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ নেই। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না ওর। হঠাৎ দেখল, রাশেদ পাশার ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিসের দরজা থেকে সরে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'অ্যাই, কে তুমি! কি করছ?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল লোকটা কিশোরের দোতলার জানালার দিকে। পরক্ষণে লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে দৌড় দিল বাগানের মাঝের পথ ধরে। পথের শেষ মাথায় রাখা একটা সাইকেলে চেপে বসল।

দরজার দিকে ছুটল কিশোর। এককে লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নিচে নেমে এল। ঝটকা দিয়ে সদর দরজা খুলে দৌড় দিল অফিসের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে লোকটা। গেটের বাইরে বেরিয়ে কোন সাইকেল আরোহীকে চোখে পড়ল না ওর।

চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে সবার। বেরিয়ে এসেছেন চাচা-চাচী। দরজা খুলে উঁকি দিচ্ছে দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, বোরিস।

কিশোর ফিরে আসতেই ঘরের বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী, 'কি হয়েছে?'

'চোর ঢুকেছিল।'

রাশেদ পাশার চোখ পড়ল ডাকবাক্সটার দিকে। সাদা একটা খামের অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। সন্ধ্যার পর বাক্স খুলেছেন তিনি, তখন কোন চিঠি ছিল না। কৌতূহল হলো। এগিয়ে গিয়ে বের করলেন খামটা। ঠিকানায় তাঁর নাম লেখা।

খাম ছিঁড়ে একটুকরো কাগজ বের করলেন তিনি। লেখা পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'ওই চোরটাই রেখে গেছে!'

'কি লিখেছে?' জানতে চাইলেন মেরিচাচী।

দেখার জন্যে এগিয়ে এল কিশোর। চাচার হাতে ধরা কাগজটার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে পড়ল, 'রাশেদ পাশা, তদন্ত বন্ধ করো। নইলে বিপদ নেমে আসবে তোমার পরিবারের ওপর।'

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মেরিচাচী, 'আমি জানতাম, এমনই কিছু ঘটবে! এতদিন ছেলেগুলো করত, এখন বুড়োটাও ধরেছে। গোয়েন্দাগিরি না ছাই! সবাইকে খুন না করিয়ে আর শান্তি হবে না।'

পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল বোরিস। কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল সবার মুখের দিকে।

চাচীকে শান্ত করার জন্যে হাতের কাগজটা নেড়ে রাশেদ পাশা বললেন, 'নিশ্চয় কোন পাগলের কাজ। নইলে রাত দুপুরে এমন চিঠি রেখে যায় নাকি।'

বিন্দুমাত্র শান্ত হলেন না মেরিচাচী, অস্বস্তি গেল না তাঁর।

কিশোর বলল, 'দেখি, কোন সূত্র ফেলে গেল কিনা।'

একটা টর্চ নিয়ে খুঁজতে বেরোল সে। আরেকটা টর্চ হাতে রাশেদ পাশাও নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে বোরিস। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গজগজ করতে থাকলেন মেরিচাচী।

জিনিসটা খুঁজে পেল বোরিস। একটা ঝোপের ধারে যেখানে সাইকেলটা রাখা ছিল, সেখানে পড়ে আছে একটা প্যাডেল। সাইকেল থেকে খুলে পড়ে গেছে।

বোরিসের কাছ থেকে সেটা নিয়ে দেখতে দেখতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'এক প্যাডেলেই চালিয়ে চলে গেছে!'

ফিরে এসে রান্নাঘরের টেবিলে বসল কিশোর আর রাশেদ পাশা। এরকম একটা ঘটনার পর এত তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে ইচ্ছে করল না। চাচাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে শুতে চলে গেলেন মেরিচাচী। কিশোর কিছু খেল না।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনে কাগজটা ভাল করে দেখতে লাগল সে। তাতে পাউডার ছিটিয়ে দেখল আঙুলের ছাপ আছে কিনা। খানিক পর মুখ তুলে চাচাকে বলল, 'কিছুই নেই। নিশ্চয় দস্তানা পরে কাগজটা ধরেছিল। কাগজের ওয়াটার মার্কটাও নেই। আস্ত পাতা নয় এটা, ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। যে টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করা হয়েছে সেটা পেলে কাজ হত...'

ছয়

সকালে রবিনকে ফোন করল কিশোর। রাতে চোর আসার ঘটনা জানাল। চলে আসতে বলল ওকে।

রবিন এলে ওকে নিয়ে বেরোল কিশোর। রকি বীচের একটা বড় সাইকেলের দোকানে এসে প্যাডেলটা দেখিয়ে জানতে চাইল, জিনিসটা

কোন মডেলের সাইকেলের।

'এদেশী নয় এটা,' দোকানদার বলল, 'বেলজিয়ামে তৈরি। রকি বীচে এ ধরনের জিনিস বিক্রি হয় না কোন দোকানে।'

হতাশ হলো কিশোর। প্যাডেলটা পকেটে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় হয়, বলতে পারেন?'

'হেভেনমুরের দোকানে গিয়ে দেখতে পারো। ওরা সব ধরনের বিদেশী সাইকেলের পার্টস বিক্রি করে।'

'দোকানটা কোথায়?'

'হেনরিভিলে।'

দোকান থেকে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'বেশ কাকতালীয় ব্যাপার তো! বছরে একটা দেখি না, অথচ গত দুদিনে দুটো বেলজিয়াম সাইকেলের দেখা পেয়ে গেলাম।'

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'হেনরিভিলে যাব?'

'যাও। সূত্র যখন পাওয়া গেছে একটা, খোঁজ নিয়ে আসি। ওখান থেকে এসে মুসাদের বাড়িতে যাব।'

হেভেনমুরের দোকানে ঢুকে প্যাডেলটা দেখাতেই দোকানদার বলে উঠল, 'তোমার প্যাডেলও ভাঙল। নাহ্, জিনিসগুলো মনে হচ্ছে সুবিধের না। এজেন্টকে বলতে হবে। এইমাত্র আরেকজন এসে একই সাইকেলের প্যাডেল কিনে নিয়ে গেল।'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর; ফিরল দোকানদারের দিকে। 'লোকটা দেখতে কেমন?'

'ভিড় ছিল, চেহারা তো মনে করতে পারছি না, তবে লোক নয় ও, এটা মনে আছে। একটা ছেলে।'

আর কিছু জানাতে পারল না দোকানদার। এই সামান্য সূত্র দিয়ে চোর ধরা যাবে না, বুঝতে পারছে কিশোর।

দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

মুসাদের বাড়ির দিকে গাড়ি চালাল রবিন।

খামারবাড়িতে এসে দেখল, ওদের জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে মুসা। দেখে বলে উঠল, 'এত দেরি?'

'হেনরিভিলে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল রবিন।

'হেনরিভিলে!' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

কেন গিয়েছিল, জানানো হলো মুসাকে।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'চলো, আগে দরখাস্তটা দিয়ে আসি। তারপর নদীতে যাওয়া।'

পুরানো মিলটা পার হয়ে নতুন বিল্ডিংটার দিকে যেতে হয়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'বাহ্, সুন্দর করে ফেলেছে তো। আগের বার যখন এসেছিলাম, লম্বা লম্বা ঘাস ছিল সবখানে। সব পরিষ্কার করে ফেলেছে।'

পুরানো দিনের মতই ঘুরছে হুইল। একটা পুকুর থেকে নালা কেটে পানি এনে চাকার গায়ে পানি ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পানির তোড়েই ঘোরে বিশাল চাকাটা। নিচে বিরাট গর্ত, তাতেও পানি।

'দেখো,' পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা সরু নদীর ওপরের ছোট ব্রিজ দেখাল রবিন, 'কেমন ছবির মতন।'

মিলের উত্তরে তিনশো গজ দূরে তৈরি হয়েছে ওয়ারনার করপোরেশনের নতুন কারখানার পেছনের গেট। গেটটা বন্ধ।

'নতুন আর পুরানোর বৈষম্য দেখো,' বলল রবিন।

কাঁচা রাস্তা ছেড়ে গেটের দিকে যাওয়ার রাস্তায় উঠল ওরা।

হঠাৎ পাল্লা খুলে বেরিয়ে এল একজন পেশীবহুল লোক। পরনে গার্ডের ইউনিফর্ম। ওদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'একটা চাকরি চাইতে এসেছিলাম,' জবাব দিল মুসা।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছ?'

'না। ভুল হয়ে গেছে। ফোন করে আসা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, সময় এবং কষ্ট দুইই বাঁচত তাহলে। যদ্দূর জানি, পার্মানেন্ট চাকরি নেই, ছুটকা-ছাটকা কিছু কাজ বাদে।'

'এলামই যখন, পার্সোনেল ম্যানেজারের কাছে একটা দরখাস্ত রেখে আসি, কি বলেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল লোকটা। 'দাঁড়াও, আগে পার্সোনেল অফিসে ফোন করে জেনে নিই।'

ওদেরকে রেখে ভেতরে চলে গেল লোকটা।

চারপাশে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা। দক্ষিণে পাতাবাহারের ঝোপ ছাঁটছে একজন লোক। পরনে ওভারঅল। ধূসর হয়ে এসেছে চুল।

ঝোপের কিনারে পুরানো একটা পিপা পড়ে আছে। এক সময় ময়দা রাখা হত তাতে। এখন মাটি ভর্তি করে ফুলের টব বানানো হয়েছে। চারপাশে ঘাস গজিয়ে আছে।

গেট খুলে বেরিয়ে এল গার্ড। 'সরি, লোক দরকার নেই।'

হতাশ ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, 'আমি ভেবেছিলাম এতবড় কারখানা, কোন না কোন কাজ তো পাবই। ঠিক আছে, কি আর করা।' বন্ধুদের দিকে তাকাল, 'চলো, যাই।' গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

মিলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াল কিশোর। দক্ষিণের দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা বেলজিয়ামে তৈরি একটা সাইকেল। ভাল করে দেখার জন্যে প্রায় দৌড়ে এল ওটার কাছে। 'দেখো, টিমেরটার মতই।'

পকেট থেকে প্যাডেলটা বের করে মিলিয়ে দেখল সে। অবিকল এক জিনিস। সাইকেলের একটা প্যাডেল অন্যটার চেয়ে পুরানো। নতুন প্যাডেলটায় হাত দিয়ে নিজেকেই যেন বলল, 'দু'একদিনের মধ্যে বদলানো হয়েছে। এটা নিয়েই কাল রাতে ইয়ার্ডে যায়নি তো লোকটা!'

দেয়ালে গুঁতো খেয়ে টিমের সাইকেলের সামনের চাকাটা সামান্য দুমড়ে গিয়েছিল, মনে আছে ওর। এটার সামনের চাকার স্পোকগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল সে। ভাঙা কিংবা বাঁকা পাওয়া গেল না একটাও, তবে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না; বাঁকা স্পোক সোজা করে নেয়া যায় সহজেই, ভেঙে গেলে বদলে নেয়া যায়। সামনের মাডগার্ডে আঁচড় লেগে রঙ ছড়ে গিয়েছিল টিমেরটার, এটাতে নেই। রঙ করে নেয়াটা এমন কঠিন কিছু নয়। সুতরাং দুর্ঘটনার কোন স্বাক্ষর না থাকলেও এই সাইকেলটা টিমেরটা হতে বাধা নেই।

সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর। সঙ্গীদের বলতে গেল, 'এটা নিয়েই ইয়ার্ডে গিয়েছিল চোর...'

পেছন থেকে চমকে দিল একটা কণ্ঠ, 'কি দেখছ অমন করে?'

তাড়াতাড়ি হাতের প্যাডেলটা পকেটে ভরে ফেলে ফিরে তাকাল কিশোর। পাতাবাহারের ডাল ছাঁটছিল যে, সেই লোকটা।

কিশোর বলল, 'কাল টিম ফ্রিস্ক নামে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এ রকম একটা সাইকেল দেখেছি তার কাছে। বেলজিয়ান সাইকেল খুব একটা দেখি না তো এদিকে, তাই দেখছিলাম।'

একটা মুহূর্ত বিস্ময় ফুটে রইল লোকটার চোখে, তারপর হাসল। 'সাইকেলটা টিমেরই। সে এখানে কাজ করে। কাল নিশ্চয় প্রিন্টারে কপি দিতে যাওয়ার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কোথায় যাচ্ছিল বলেনি। কি কাজ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাও বলেনি।'

'ঠিকই করেছে, ওই রকমই নির্দেশ দেয়া আছে ওকে। টপ-সিক্রেট কাজ হয় এই কারখানায়। ওয়ারনারের কোন কথা বাইরের কারও কাছে ফাঁস করা মানা। করলে আর ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি যাবে। তা ছাড়া তার চাকরিটা টেম্পোরারি। যখন তখন বিদেয় করে দিতে পারে।'

'টিম আছে নাকি এখানে? দেখা করে যাই।'

'না। একটা জরুরী কাজে বাইরে পাঠানো হয়েছে। বাসে করে যাবে। ফিরতে দেরি হবে।'

কাজ করতে চলে গেল লোকটা।

মিলের দিকে তাকাল মুসা। দোতলার একটা জানালার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল দৃষ্টি। মনে হলো, চট করে সরে গেল একটা মুখ।

'খাইছে! টিম ফ্রিস্ককে দেখলাম মনে হলো!'

সাত

তিনজনেই তাকিয়ে আছে জানালাটার দিকে। কাউকে দেখা গেল না আর।

'ভুল দেখোনি তো?' রবিন বলল, 'রোদের কারসাজি, জানালার কাঁচে ছায়া নড়তে দেখেছ।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মুসা, 'ছায়া নয়, মানুষই দেখেছি!'

একটা সেকেন্ড মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর রওনা হলো ওভারঅল পরা লোকটার দিকে। ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি কি বাইরে গেছে টিম? এইমাত্র দোতলার জানালায় ওকে দেখলাম মনে হলো।'

'তো কি মিথ্যে বলছি?' রেগে উঠল লোকটা। 'তোমরা যদি ভুলভাল দেখো, চোখ দেখাওগে ডাক্তারকে।'

পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল মুসা, তাড়াতাড়ি তার কাঁধ চেপে ধরে থামাল কিশোর। লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাতেও কি কাজে পাঠানো হয় ওকে?'

'না। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ছুটি। সাইকেল এখানে রেখে হেঁটে বাড়ি চলে যায় সে।'

'এখানে কোথায় রাখে?'

'মিলের পেছনে একটা খোলা জায়গায় বাতিল জিনিসপত্র রাখা হয়, ওখানে।'

'তারমানে রাতে ইচ্ছে করলেই যে কেউ ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে,' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি বললে?'

'না, কিছু না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে সন্দেহ নিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর ঘড়ি দেখল। 'ওহ্, লাঞ্চের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তাড়াহুড়ো করে বিল্ডিঙের দিকে চলে গেল সে।

ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

'আরেকটা কথা ভাবছি,' হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর, 'দোকানে গিয়ে টিমই প্যাডেল কিনে আনেনি তো?'

'ওকে জিজ্ঞেস করলেই হয়,' রবিন বলল।

'পাব কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।

'আবার আসব এখানে,' কিশোর বলল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

মুসাদের বাড়ি ফিরে খাবারের প্যাকেট নিয়ে নিল ওরা। নদীর দিকে চলল। নদীর পাড়ে এসে বনের ধারে সুন্দর একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল।

'খামাকা বোঝা নিয়ে বসে থেকে লাভ কি, খাওয়া শুরু করে দিই,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'পেট খালি হয়ে গেছে।'

সম্মতি জানাল অন্য দুজন।

প্যাকেট খোলা হলো। খাবার বানিয়ে দিয়েছেন মুসার আম্মা: চিকেন স্যান্ডউইচ, পটেটো স্যালাড, চকলেট কেক। সেই সঙ্গে কোকা কোলা। হাসি ফুটল তিনজনের মুখে। নদীর তীরে গাছের ছায়া, ঝিরঝিরে বাতাস, পানিতে রৌদ্র-ছায়ার খেলা, তার সঙ্গে এই খাবার; আহ্, জমবে চমৎকার!

গরম লাগছে। খাওয়া শেষে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। 'এত গরম লাগছে কেন?'

'বেশি খেলে অমনই হয়,' হেসে বলল রবিন। 'কি হলো, শুয়ে পড়লে যে। পাথর কুড়াবে না?'

'খাওয়ার পর শোয়া দরকার, নাহলে হজম খারাপ হয়।'

'আমি তো জানতাম উল্টোটা,' কিশোর বলল, 'হজমের জন্যে পরিশ্রম দরকার।'

'যা হয় হোক,' চোখ মুদল মুসা, 'আমি এখন উঠতে পারব না।'

তবে পাঁচ মিনিটের বেশি শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না ওর, উঠে পড়ল। পাড়ের নিচে, পানির কিনারে একসারিতে থেকে পাথর কুড়াতে শুরু করল তিনজনে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ভাটির দিকে।

'কি খুঁজছ, বলো তো?' জানতে চাইল রবিন। 'পাথর যুগের নিদর্শন? প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্ম?'

'পেয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই এলাকাটা অনেক পুরানো, বাবার কাছে শুনেছি।'

নদীর বাঁক ঘুরে ছোট একটা খাঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। ছোট্ট একটা চর পড়ে আছে। পাথর বিছিয়ে আছে। গাছপালা ততটা ঘন নয়।

'সুন্দর জায়গা,' রবিন বলল, 'মুসা, আর কখনও এসেছ এখানে?'

'না। পানি দেখো! ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে না!'

'কে মানা করছে। নামো না গিয়ে,' বলল কিশোর।

টান দিয়ে গেঞ্জি খুলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। তাকিয়ে আছে বড় একটা পাথরের চাঙড়ের দিকে।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

'গুহা!'

মুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিশোর আর রবিনও তাকাল। চাঙড়ের পাশে পাহাড়ের গায়ে কালো একটা গুহামুখ। একটা বিশেষ জায়গায় না দাঁড়ালে পাথরটার জন্যে দেখা যায় না মুখটা।

কাছে থেকে দেখার জন্যে এগোল ওরা। ঢোকার আগে একবার ভেতরে উঁকি দিল মুসা।

গুহার ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে আছে দেয়ালগুলো।

'জীবাশ্ম খোঁজার আদর্শ জায়গা!' উত্তেজনায় কাঁপছে মুসার কণ্ঠ। 'চলো, আরও ভেতরে গিয়ে খুঁজি।'

সুড়ঙ্গের মত ভেতরে ঢুকে গেছে গুহার পেছনের অংশ। নিচু হয়ে গেছে ছাত। পকেট থেকে ছোট টর্চ বের করে আলো ফেলল কিশোর। ডানদিকের দেয়ালে অদ্ভুত একধরনের হলদে-সবুজ শ্যাওলা জন্মে আছে। হেসে বলল মুসাকে, 'নেচারালিস্ট হতে গেলে উদ্ভিদের গবেষণাও করতে হয়। এগুলো লিচেন, চমৎকার নমুনা। নেবে না?'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। মাথা ঝাঁকাল, 'দাঁড়াও, নিয়েই নিই। শুধু পাথর

নিয়ে গবেষণা করে মজা পাব না।'

গুহার আরও ভেতরে চলে এল ওরা। একজায়গায় পাথরের একটা স্তূপ হয়ে আছে। সেটার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, 'আলগা পাথর। সহজেই সরানো যায়। ভেতরে কি আছে দেখবে নাকি?'

কয়েকটা পাথর সরাতেই অবাক হলো ওরা, কালো আরেকটা ফোকর বেরিয়ে পড়েছে।

'আরি!' বলে উঠল মুসা, 'আরেকটা সুড়ঙ্গ!'

ভেতরে আলো ফেলল কিশোর। পেছনের দেয়াল দেখা গেল না। তারমানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। 'দেখব নাকি কোথায় গেছে?'

'চলো, দেখি।' পড়ে থাকা পাথরের স্তূপটা দেখাল মুসা, 'কিন্তু ঢুকতে হলে এগুলো সরাতে হবে।'

'আলগা পাথর,' রবিন বলল। 'আপনাআপনি এ ভাবে জমা হয়নি এখানে, কেউ এনে রেখেছে। কে রাখল? কেন?'

তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ।

পাথরগুলো সরিয়ে সুড়ঙ্গমুখটা পুরোপুরি বের করে ফেলল ওরা। সরু সুড়ঙ্গ। হামাগুড়ি দেয়া ছাড়া ঢোকা যাবে না। আগে ঢুকল কিশোর। মাঝখানে রবিন। পেছনে মুসা।

কিছুদূর এগোনোর পর সামনে আরও সরু হয়ে এল সুড়ঙ্গ। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল স্বাস্থ্য মুসার। বলল, 'আটকে যাচ্ছি তো। মনে হয় কোন জানোয়ারে খুঁড়েছে সুড়ঙ্গটা। এখান থেকে পাথরের নমুনা তুলে নিই, কি বলো?'

তার কথার জবাব দিল না কিশোর। সামনে আলো ফেলে কি যেন দেখছে। 'দেখো, দেয়াল কি রকম শক্ত। জানোয়ারের খোঁড়ার সাধ্য নেই, কাজটা করেছে মানুষে, বেলচা আর শাবল দিয়ে।'

'তোমার মাথার জন্যে দেখতে পাচ্ছি না তো,' রবিন বলল।

মাথা নিচু করল কিশোর। সরু সুড়ঙ্গে তার পিঠ আর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে কোনমতে দেয়ালগুলো দেখল রবিন। একমত হলো কিশোরের সঙ্গে।

আরেকটু এগোলো ওরা। আলো কমে আসছে টর্চের। পিকনিকে বেরিয়েছে ওরা, গুহায় ঢুকতে হবে কল্পনাও করেনি কিশোর, তাই নতুন ব্যাটারি ভরার কথা মনে ছিল না। ভেবেছে রাত হলে টর্চটার প্রয়োজন পড়তে পারে, ব্যাটারি যা আছে তাতেই চলবে।

সামনে দেখা গেল নতুন দৃশ্য। উঁচু হয়ে গেছে ছাত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে একজন মানুষ। কিছু কাঠের খুঁটি মেঝে আর ছাতের সঙ্গে লাগিয়ে ছাতটাকে ঠেকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে ধসে না পড়ে। আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'কে লাগাল ওগুলো? কবে?'

আরও কমে এল আলো। এখুনি না ফিরলে একেবারে ফুরিয়ে যাবে ব্যাটারি। অন্ধকারে বিপদ হতে পারে তখন।

আলো ছাড়া সামনে এগোনো যাবে না। বাধ্য হয়ে ফিরতে হলো ওদের।

আট

গুহার বাইরে বেরিয়ে মুসা বলল, 'কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে গেল নাকি?'

আকাশের দিকে হাত তুলল রবিন, 'সন্ধ্যা নয়, ঝড় আসছে। দেখো কি রকম কালো মেঘ।'

'খাইছে! বাড়ি ফিরতে পারব বলেও তো মনে হয় না।'

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে গ্রীষ্মের সূর্য। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ার গুড়ুগুড়ু শব্দ। বাতাস স্তব্ধ। ভাপসা গরম।

'বলেছিলাম না তখন, গরম লাগছে। বেশি খেয়েছি বলে ইয়ার্কি মারলে। আসলে তো ঝড় আসছিল বলে অমন লাগছিল। ওস্তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ো।'

'জো হুকুম, ব্যারোমিটার। তোমার কানের মত চামড়াও যে সেনসিটিভ, জানা ছিল না...'

বাধা দিল কিশোর, 'ভিজতে না চাইলে এখুনি রওনা দিতে হবে আমাদের। পিকনিক খতম...'

মুখের কথা শেষ হলো না ওর। পায়ের কাছে বালিতে এসে ঘ্যাচ করে বিঁধল একটা তীর। থিরথির করে কাঁপতে লাগল পালক লাগানো পুচ্ছটা। তীরের মাথায় গাঁথা ভাঁজ করা একটা কাগজ।

চমকে গেল ওরা তিনজন। সবার আগে সামলে নিল কিশোর। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে তীরটা তুলে কাগজটা খুলে নিল। তাতে লেখা:

বিপদে পড়বে, তিন গোয়েন্দা।
সাবধান।

যেদিক থেকে তীরটা এসেছে সেদিকে দৌড় দিল মুসা। পেছনে রবিন আর কিশোর। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লোকটার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। তীর ছুঁড়েই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

আরও কালো হয়ে গেছে আকাশ। এমন অন্ধকার, যেন রাত নামছে। এখন আর খুঁজে লাভ নেই, পাওয়া যাবে না লোকটাকে। খামারে রওনা হলো ওরা।

নদীর ধার দিয়ে ঘুরে না গিয়ে বনের ভেতরের শর্টকাট পথ ধরল। কিন্তু বনের ভেতর থেকে বেরোনোর আগেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো।

ভিজতে ভিজতে মুসাদের বাড়িতে ঢুকল ওরা। সোজা মুসার ঘরে চলে এল। কাপড়-চোপড় সব খুলে, পানি নিংড়ে শুকাতে দিয়ে মুসার শার্ট পরে

নিল কিশোর আর রবিন। কোমরে দুজনে দুটো তোয়ালে জড়ানো।
মুসা বলল, 'বোসো তোমরা, আমি চা নিয়ে আসি।'
এক প্লেট বড় বড় বিস্কুট আর চায়ের পট নিয়ে ফিরে এল সে।
কিশোর ততক্ষণে টেবিলে সেট করে ফেলেছে মাইক্রোস্কোপটা। ইলুমিনেটর জ্বেলে আলোটা এমন করে রাখল যাতে বেশি উজ্জ্বল না হয়। পকেট থেকে কাগজটা বের করে আগেই শুকোতে দিয়েছে টেবিল ল্যাম্পের নিচে। তীরটা থেকে কাদা আর পানি মুছে সেটা পরীক্ষা করল প্রথমে। যা ভেবেছিল, তাই; আঙুলের ছাপ পেল না।
এরপর কাগজটা টেনে নিল সে। লেন্সের নিচে ফেলে আগুপিছু করতে লাগল। আচমকা বলল, 'এই যে আছে, ওয়াটার মার্ক!'
মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য দুজনকে দেখার জায়গা করে দিল সে।
প্রথমে চোখ রাখল রবিন। 'একটা পাঁচকোণা তারা। এটা একটা মূল্যবান সূত্র হতে পারে, তাই না? কাগজটা কোত্থেকে এল খুঁজে বের করতে পারব আমরা।'
'তীরটা কোনখান থেকে কিনেছে তাও বের করা যাবে,' মুসা বলল। 'খেলার সরঞ্জাম বিক্রি করে যে সব স্টোরে, ওগুলোতে খোঁজ নিলেই হবে।'
'হ্যাঁ,' একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে কামড় বসাল কিশোর। 'তোমার তো আবার ওসব দোকানে বেশ জানাশোনা। ঝড়টা থামলে আজই বেরোব।'
মুখ তুলল রবিন। সরে গিয়ে জায়গা করে দিল মুসাকে, 'নাও, দেখো।'
যে ভাবে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল—মনে হয়েছিল তিনদিনেও ছাড়বে না, কিন্তু ঘণ্টা দুই তুমুল বর্ষণের পর থেমে গেল বৃষ্টি। মেঘও কাটল।
ফ্যানের বাতাসে কিশোর আর রবিনের জামাকাপড়গুলো অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। পরে বেরোনো যায়। রবিনের গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়ল ওরা।
পথে বড় একটা স্টেশনারি দোকান দেখে থামাতে বলল কিশোর। রবিনকে গাড়িতে বসতে বলে নেমে গিয়ে ঢুকল দোকানে। কাগজের ওয়াটার মার্কের বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল ওই কাগজ কারা সরবরাহ করে। দোকানদার জানাল, হেনরিভিলের মডার্ন পেপার কোম্পানি।
ফিরে এসে রবিনকে খবরটা জানাল কিশোর। সেদিন আর হেনরিভিলে যাওয়ার সময় নেই। অতএব তীরটার খোঁজ নিতে চলল।
কয়েকটা দোকানে নেমে গিয়ে খোঁজ করে এল মুসা। কিন্তু কোন দোকানদারই কোন তথ্য দিতে পারল না। তীরটা পুরানো। সুতরাং কে কিনেছে, সেটা জানাতে পারল না। মডেলটাও স্ট্যান্ডার্ড মডেল, কাস্টোমারকে অনেক দিন মনে রাখার মত জিনিস নয়, সব দোকানেই পাওয়া যায়।
আপাতত আর কিছু করার নেই। ইয়ার্ডে ফিরে এল ওরা।
সান্ধ্য পত্রিকা দিয়ে গেল হকার। সামনের পাতাতেই বেরিয়েছে একটা

বিশেষ খবর, মুসা আর কিশোরকে দেখাল রবিন। হোমারগেট ইলেকট্রনিকস প্ল্যান্টে বোমা বিস্ফোরণ।

'মাস দুই আগেও একবার বোমা ফেটেছিল ওখানে, মনে আছে?' বলল সে। 'পুলিশের ধারণা, স্যাবোটাজ করা হয়েছে।'

'এবং তারও আগে,' কিশোর বলল, 'ক্যালিফোর্নিয়ার একটা রকেট রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বোমা ফাটানো হয়েছিল। সেটাও স্যাবটাজ। অপরাধী ধরা পড়েনি।'

'কারা করছে এসব?' মুসার প্রশ্ন। 'একই দলের লোক না তো?'

'কেন করছে?'

'কেন আর? ক্ষতি করার জন্যে। কেউ একজন হয়তো চায় না, ওসব কারখানায় উৎপাদন চালু থাকুক।'

ওঅর্কশপে বসে কথা বলছে তিন গোয়েন্দা। বারান্দা থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, তোর টেলিফোন!'

বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'কার ফোন?' জানতে চাইল কিশোর।

'কি করে বলব?' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন মেরিচাচী। 'তোরা চাচা-ভাতিজা মিলে কি যে শুরু করলি…অদ্ভুত গলা লোকটার! হরিবল!'

তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরল কিশোর। 'হালো, আমি কিশোর পাশা,' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে কর্কশ স্বরে বলে উঠল লোকটা, 'আগুন নিয়ে খেলছ তোমরা। এখুনি হাত গুটিয়ে না নিলে হাত পুড়বে বলে দিলাম। তোমার চাচাকেও বলে দিয়ো, তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াতে।'

কেটে গেল লাইন।

কয়েকবার 'হালো, হালো' করল কিশোর, জবাব পেল না।

টেলিফোন রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল সে। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন। লোকটা কি বলেছে ওদেরকে জানাল কিশোর।

রাশেদ পাশা বাড়ি নেই। কিসের তদন্ত থেকে তাঁকে সরে দাঁড়াতে বলছে লোকগুলো, বুঝতে পারছে না কিশোর।

ঘণ্টাখানেক পর বাইরে থেকে ফিরলেন রাশেদ পাশা। টেলিফোনে হুমকি দেয়ার কথাটা তাঁকে বলল কিশোর।

শুনে মুচকি হাসলেন তিনি। 'গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে হুমকি-ধামকি ওরকম একটু আসবেই। ঘাবড়ে গেছিস নাকি?'

'নাহ্।'

'যে লোক হুমকি দিচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে আমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে ও। ভাল করে নজর রাখলে আমরাও ওকে চিনে ফেলতে পারব।'

দিনের বেলা গুহা থেকে বেরোনোর পর কি ঘটেছে, সেটাও চাচাকে জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আজ রাতে আবার যাব একবার ওখানে। দিনের বেলা পুরোপুরি দেখা হয়নি সুড়ঙ্গটা। অন্ধকারে আরও একটা সুবিধে হবে, যে আমাদের ওপর নজর রাখছে, রাত হয়ে গেছে ভেবে আর রাখবে না।

এই সুযোগে ওর চোখ এড়িয়ে কাজটা সেরে আসতে পারব আমরা।'

'তা ঠিক। সাবধানে যাস। তোর চাচীকে বলিস না কিছু।'

'মাথা খারাপ! তাহলে দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে। বেরোতেই দেবে না।'

নয়

বাড়িতে গেল না মুসা আর রবিন। বাসায় ফোন করে বলে দিল রাতে ফিরতে দেরি হবে। নাও ফিরতে পারে। ইয়ার্ডে কিশোরের সঙ্গে থাকবে।

খেয়েদেয়ে রাত দশটা নাগাদ বেরোবে ওরা, ঠিক করল। ওঅর্কশপে বসে কথা বলছে, এই সময় এসে হাজির হলো ওদের বন্ধু বিড ওয়াকার। ঢুকে বলল, 'যাক, ভালই হলো, তিনজনেই আছ।'

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল কিশোর। 'এ সময়ে?'

'আজ একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের সাপ্লাই ইয়ার্ডে, জানাতে এলাম তোমাদের।'

ওর বাবা মিস্টার ওয়াকার একজন কনট্রাক্টর, বিল্ডিঙের কাজ করেন। একটা কনস্ট্রাকশন সাপ্লাই ইয়ার্ডেরও মালিক। গরমের সময় স্কুল ছুটি থাকলে ওখানে কাজ করে বিড। তদারকি করে। বলল, 'আজ গিয়েছিলাম ব্যাংকে, সারা হপ্তার বিক্রির টাকা জমা দিতে। ক্লার্ক আবিষ্কার করল, একটা নোট জাল।'

'বিশ ডলারের?'

'তুমি জানলে কি করে?'

মুসাও যে ঠকেছে, বিডকে জানানো হলো।

'ধরতে পারলে ব্যাটার ঘাড় মটকে দিতাম আমি!' রাগ করে বলল বিড। 'টাকাটা বড় কথা না, ক্লার্কের কাছে রীতিমত অপমান হলাম। এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন জালিয়াতটা আমিই।'

'আমিও মটকাব!' বিডের সঙ্গে সুর মেলাল মুসা। 'আমিও কি কম লজ্জা পেয়েছি মিস্টার গ্রেগরির কাছে। নেহাত জানাশোনা ছিল, নইলে জালিয়াত ভেবে আমাকেই তুলে দিত পুলিশের হাতে।'

'টাকাটা কে দিয়েছে, কিছু আন্দাজ করতে পারো?' জানতে চাইল কিশোর।

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল বিড। 'আমাদের বেশির ভাগ কাস্টোমারই চেনা। বিশেষ করে আমাদের ইয়ার্ডম্যান লয়েড যারা মাল কিনতে আসে সবাইকেই চেনে। ওকে টাকাটার কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, দিন তিনেক আগে ইয়ার্ড বন্ধ করে দিচ্ছে সে, এই সময় ঢুকল একটা ট্রাক। সবুজ রঙের, রঙ মলিন হয়ে গেছে। ট্রাকের গায়ে কোম্পানির নাম ছিল না।

লয়েডের ধারণা, নাম অবশ্যই লেখা ছিল, রঙ করে সেটা মুছে ফেলা হয়েছে।'

ট্রাকে যে সব লোক ছিল, তাদের চেহারা মনে আছে?'

ট্রাকের ড্রাইভার লয়েডের অচেনা। পাশে বসা ছিল একটা ছেলে, তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস। পুরানো ইঁট আর তক্তা কিনল কতগুলো। টাকা গুণে দিল ছেলেটা, কয়েক ধরনের নোট, তার মধ্যে ছিল একটা বিশ ডলার। লয়েডের ধারণা, জাল নোট ওই ছেলেটাই দিয়েছে।'

'ড্রাইভার দেখতে কেমন?'

'ও নামেনি। হুইলের আড়ালে এমন ভাবে বসে ছিল, চেহারা দেখতে পায়নি লয়েড। তখন ইয়ার্ড বন্ধ করার সময়, তাড়াহুড়া। খেয়াল করে দেখার সময়ও ছিল না। মাল কেনার পর ছেলেটাকে টাকা বের করে দিল ড্রাইভার, সে দিল লয়েডকে।'

'অবাক লাগছে আমার,' রবিন বলল। 'ধরলাম, ড্রাইভারই ছেলেটাকে দিয়ে বিশ ডলারের নোটটা চালান করেছে। কিন্তু কথা হলো, সামান্য একটা বিশ ডলারের নোটের জন্যে এত ঝামেলা করতে গেল কেন সে?'

কিশোরও ধরল কথাটা, 'হ্যাঁ, ঠিক। তাছাড়া, পুরানো ইঁট আর তক্তা দিয়েই বা কি করবে ওরা?' বিডের দিকে তাকাল সে, 'ছেলেটাকে তো ভাল করেই দেখেছে লয়েড। সে দেখতে কেমন? কি বলেছে?'

'লম্বা, রোগা-পাতলা। গায়ে স্ট্রাইপ কাপড়ের শার্ট ছিল।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। টিম ফ্রিস্ককে সন্দেহ করছে তিনজনেই।

'বোঝা যাচ্ছে ওয়ারনার করপোরেশনের নতুন কারখানায় কাজ করে লোকটা,' বলল সে, 'কিন্তু অতবড় একটা আধুনিক কোম্পানি ওই প্রায়-বাতিল জিনিস দিয়ে কি করবে? তাছাড়া বিল পাঠানোর কথা না বলে নগদ টাকায়ই বা দিল কেন?'

'আরও আছে,' বলল রবিন, 'ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামল না কেন? মাল তোলায় সাহায্য করা, তদারকি করার কথা তো তারই। এর একটাই জবাব হতে পারে, সে আসলে আড়ালে থাকতেই চেয়েছিল, যাতে কেউ তার চেহারা না দেখে ফেলে।'

ট্রাকের নম্বর দেখার কথাও মনে হয়নি লয়েডের,' বিড বলল। 'হবেই বা কেন? কাস্টোমারের গাড়ির নম্বর কেই বা দেখতে যায়।'

ট্রাকের গায়ের নাম মুছে ফেলা ছাড়া গাড়িটাতে অস্বাভাবিক আর .কান কিছু ছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পেছনে একটা সাইকেল ছিল। মাল তোলার সময় ওটা একধারে সরাতে হয়েছে।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। টিমেরও সাইকেল আছে।

'আব্বার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বিড বলল। 'এই জালিয়াতির একটা তদন্ত করতে অনুরোধ করেছে তোমাদের। জানোই তো আব্বার স্বভাব, বিশ

ডলার তার কাছে কিছু না, কিন্তু কোন ব্যাপারে ঠকে গেলে খেপে অস্থির হয়ে যায়। তাই হয়েছে এখন। লয়েডও রেগে আছে।'

'ঠিক আছে, দেখব কি করতে পারি,' কিশোর বলল। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। এমনও হতে পারে, ইচ্ছে করে নোটটা লয়েডকে দেয়নি লোকটা, ভুলে হাত ফসকে চলে গেছে।'

'টিমকে জিজ্ঞেস করা দরকার,' রবিন বলল।

'টিম কে?' জানতে চাইল লয়েড।

তাকে জানানো হলো, কি করে ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছে তিন গোয়েন্দার।

'ও,' উঠে দাঁড়াল বিড, 'যাই আজ। সাহায্যের দরকার হলে আমাকে খবর দিয়ো।'

'দেব,' কিশোর বলল।

বেরিয়ে গেল বিড।

দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে উঠল তিন গোয়েন্দা। রওনা হলো গুহার উদ্দেশে।

মুসাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতে কিশোর বলল, 'বাড়িতে ঢোকার দরকার নেই। গাড়ি নিয়ে যতদূর যাওয়া যায়, যাও। বাকিটা হেঁটে যাব।'

বনের প্রান্তে গাড়ি রেখে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। গুহার কাছে পৌছল। ভেতরে ঢুকে দেখল, সুড়ঙ্গে পানি ঢুকেছে।

'বৃষ্টির পানি। কি ভাবে ঢুকল কে জানে,' কিশোর বলল। 'মাটি না শুকালে ঢোকা যাবে না।'

'কি করবে এখন?' মুসার প্রশ্ন।

'চলো, মিলের কাছটায় ঘুরে আসি। দেখি, রাতের বেলা কেমন লাগে।'

গুহা থেকে বেরিয়ে এগোনোর সময় হঠাৎ ডানে মোড় নিল কিশোর।

'ওদিকে যাচ্ছ কেন?'

'ওদিক থেকেই তো তখন তীরটা ছোঁড়া হয়েছিল। দেখি কোন সূত্র ফেলে গেল কিনা তীরন্দাজ।'

টর্চের কাঁচে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে কিশোর, যাতে আলোটা দূর থেকে দেখা না যায়। গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে চলল ওরা, ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে ওপর দিকে উঠছে। গাছের পাতায় সড়সড় করে বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি গাছের গোড়া, পাথরের কানাচ দেখতে দেখতে চলেছে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। বনের কিনারে পৌছে গেল। মিলের অবয়বটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুরানো হুইলের ক্যাঁচকোঁচ, গোঁ গোঁ, ঘড়ঘড় শোনা যাচ্ছে।

থমকে দাঁড়াল কিশোর।

তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল মুসা। 'কি হলো?'

নিচু হয়ে একটা জিনিস তুলে নিল কিশোর। 'ফিঙ্গার গার্ড। তীর ছোঁড়ার

সময় তীরন্দাজরা ব্যবহার করে।'

'এটা কি কোন সূত্র মনে হচ্ছে?' চামড়ার তৈরি বিচিত্র জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

'অবশ্যই। আঙুলের ছাপ থাকতে পারে এতে,' সাবধানে ফিঙ্গার গার্ডটা পকেটে রেখে দিল কিশোর।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে সামনের খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে মিলের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ওখান থেকে দেখা গেল, গেটহাউসটা অন্ধকার। নির্জন।

'ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সব,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। হঠাৎ রবিন বলল, 'শুনছ? হুইলটা ঘুরছে না আর!'

'রাতের জন্যে ঘোরা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে হয়তো। চলো তো, ওপাশে গিয়ে দেখি।'

সবে উত্তর কোণটা পেরিয়েছে ওরা, আবার চালু হয়ে গেল হুইল, ক্যাঁচকোঁচ, ঘড়ঘড় শুরু হলো।

'আমার মনে হয়,' মুসা বলল, 'যান্ত্রিক গোলযোগ আছে হুইলটায়। অনেক দিন অচল হয়ে পড়ে ছিল তো। জেনারেটরের সাহায্যে চালানো হচ্ছে এখন, চাপ পড়ছে জেনারেটরে, থেকে থেকে আটকে যাচ্ছে।'

'মিলের কারও সঙ্গে কথা বলতে পারলে জানা যেত,' বলল রবিন। 'হুইলের কাছে টেকনিশিয়ান থাকতে পারে।'

কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে গেটের কাছে আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা।

আবার বন্ধ হয়ে গেল হুইল!

রাতের আকাশের পটভূমিতে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে অনড় হয়ে থাকা হুইলটাকে।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' বিড়বিড় করল রবিন।

গেটহাউসের দরজায় টোকা দিল কিশোর।

সাড়া নেই।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার টোকা দিল। আগের চেয়ে জোরে। এবারও যখন সাড়া মিলল না জোরে জোরে থাবা দিতে লাগল সে। নীরবতার মধ্যে বিকট হয়ে কানে বাজল সে শব্দ। কিন্তু তবু কেউ জবাব দিল না।

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন, 'কুম্ভকর্ণের ঘুম লোকটার। তোমার দোস্ত।'

'আমার দোস্ত না, আমার ওস্তাদ। দরজায় এত জোরে চাপড় মারলে আমিও জেগে যেতাম।'

'আজ আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কাল আসব। চলো, যাই। এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে সুড়ঙ্গের মাটি।'

বনের কাছাকাছি আসতে নদীর কিনারে গাছপালার মধ্যে ধুড়ুস করে পড়ল কি যেন। দেখার জন্যে দৌড় দিল গোয়েন্দারা। কোন জায়গায় শব্দটা হয়েছে অনুমান করে সেখানে এসে দাঁড়াল।

টর্চ জ্বালল কিশোর। কিছু দেখতে পেল না।

'কোন জানোয়ার হবে,' মুসা বলল।

পেছনে খসখস আওয়াজ হলো। দেখার জন্যে ঘুরতে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খেলো মুসা। জ্ঞান হারানোর আগে অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেল, তার পাশে দাঁড়ানো রবিনও ব্যথায় 'আঁউ' করে উঠল।

দশ

চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেল না মুসা। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে যেন শরীর। এবড়োখেবড়ো শক্ত কোথাও চিত হয়ে পড়ে আছে। কোথায় আছে দেখার জন্যে মাথা তুলতে যেতেই তীব্র ব্যথা করে উঠল মাথার পেছনটা। অস্ফুট একটা শব্দ করে আবার মাথা নামিয়ে ফেলল।

পাশে রবিনের গোঙানি শোনা গেল। তারও হুঁশ ফিরেছে।

ব্যথা অগ্রাহ্য করে আব র মাথা তুলল মুসা। দেখল, তার এক পাশে রবিন, আরেক পাশে কিশোর একই ভঙ্গিতে চিত হয়ে পড়ে আছে। চলমান কোন কিছুতে রয়েছে ওরা, বুঝতে পারল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কেন? ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করে নিয়ে, চোখ মিটমিট করে দৃষ্টিও পরিষ্কার করে নেয়ার পর বুঝল, ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে চলেছে ওরা। ভেসে চলেছে। গাছের কাণ্ড বেঁধে তৈরি করা একটা ভেলাতে করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের। কোন সন্দেহ নেই, স্রোতের টানে ভাটির দিকে চলেছে। এখনই নামতে না পারলে সাগরে গিয়ে পড়বে।

রবিনকে ঠেলা দিল মুসা, 'রবিন, এই রবিন?'

'উঁ!'

'ওঠো। নামতে হবে আমাদের?'

'কোথায়?' উঠে বসার চেষ্টা করল রবিন।

'ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের। স্রোতের টান কম থাকতেই নেমে পড়তে হবে।'

কুয়াশার জন্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তীর থেকে কতদূরে আছে, আন্দাজ করতে পারছে না। হাত বাড়িয়ে আঁজলায় করে পানি তুলে নিয়ে কিশোরের চোখেমুখে ছিটা দিল মুসা। কিছুক্ষণ পর গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

কোমরে ঝোলানো টর্চটা খুলে নিল মুসা। কিশোরের মুখে ফেলল। চোখ মিটমিট করতে লাগল কিশোর।

তীরের দিকে আলো ফেলল মুসা। পাড়ের কিনার দিয়ে যাচ্ছে। নামার

এটাই সুযোগ। কিশোরের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'জলদি ওঠো, আমাদের নামতে হবে!'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে উঠে বসল কিশোর। তীরের দিকে তাকিয়ে সজাগ হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে গিয়ে আহত জায়গায় টান পড়ায় ব্যথা করে উঠল। আবার গুঙিয়ে উঠল সে।

'দেরি করা যাবে না,' তাগাদা দিল মুসা। 'স্রোতের টান বেড়ে গেলে বিপদে পড়ে যাব।'

রবিনকে আগে নেমে যেতে বলল সে।

ঝাঁপ দিল রবিন। তবে সাঁতরানোর প্রয়োজন পড়ল না। পানি খুব কম ওখানে, মাত্র কোমর পানি। হেঁটে তীরে উঠে গেল সে।

প্রায় একই সঙ্গে পানিতে নামল কিশোর আর মুসা। কিশোর টলছে। একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে ওকে ডাঙায় তুলে নিয়ে এল মুসা।

তীরে বসে হাঁপাতে লাগল তিনজনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ভেলাটা চলে যাচ্ছে ভাটির দিকে।

'পিটিয়ে আমাদের বেহুঁশ করে,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল রবিন, 'ভেলায় করে ভাসিয়ে দিয়েছে সাগরে পড়ে মরার জন্যে। কিন্তু পেল কোথায় ভেলাটা?'

'অভাব নেই,' জবাব দিল মুসা। 'ভেলা বানিয়ে নদীতে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে লোকে, বসে মাছ ধরার জন্যে। ওরকম একটা খুলে নিয়ে তাতে করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'লোকগুলো কে?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন!'

'আমাদের যারা হুমকি দিয়েছিল, তাদের কেউ হবে,' দুর্বল কণ্ঠে বলল কিশোর। 'মুসা, বাড়ি থেকে কতদূরে আছি আমরা?'

'মাইল তিনেক হবে।'

'হুঁ!' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'ওঠো। বসে থাকলে ঠাণ্ডায় জমে গিয়েই মরব! গুহায় ঢোকার বারোটা তো বাজল। কোনমতে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি এখন।'

টানা ঘুম দিয়ে অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল কিশোরের। অস্পষ্ট একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো এখন রাতের ঘটনাগুলোকে। ব্যথা নিরোধক ট্যাবলেট খেয়ে শুয়েছিল রাতে। মাথার পেছনে সামান্য দপদপ করছে এখন শুধু। অসহ্য, তীব্র ব্যথাটা আর নেই।

বিছানা থেকে নেমে, হাতমুখ ধুয়ে নিচে নামল।

মেরিচাচী তাঁর অফিসে ব্যস্ত।

একগাদা প্রশ্নের জবাব আর কৈফিয়ত দেয়ার ভয়ে তাঁর সামনে গেল না কিশোর। নিজেই ডিমভাজা করে, চা বানিয়ে নিয়ে. নাস্তা সেরে রান্নাঘর

থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে। রবিনকে ফোন করে চলে আসতে বলল ইয়ার্ডে।

তারপর করল মুসাকে।

উত্তেজিত হয়ে মুসা বলল, 'জানো, কি ঘটেছে? সকালে নাস্তা খাওয়ার পর তোমাকে ফোন করলাম। আন্টি বললেন, ঘুমাচ্ছ। জাগাতে মানা করলাম। কি করব কি করব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো, ওয়ারনার করপোরেশনের নতুন কারখানায় একটা ফোন করেই দেখা যাক না, কি বলে। অবাক কাণ্ড! পারসোনেল অফিসে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, চাকরি আছে কিনা। বলল, আছে। করার ইচ্ছে থাকলে যেন চলে যাই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পারসোনেল ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, আগে দরখাস্ত করেছি কিনা। বললাম, না। গতকাল যে চাকরির খোঁজে গিয়েছিলাম, বললাম সে কথা। গেটের গার্ড ফোন করে খোঁজ নিয়েছিল, ম্যানেজার চাকরি নেই বলে দিয়েছে, সেটাও বললাম। ম্যানেজার বলল, ওরকম কোন কথা হয়েছিল কিনা মনে করতে পারছে না। হতে পারে, সে ধরেনি, অন্য কেউ ধরেছিল ফোনটা, গার্ডকে ভুল তথ্য দিয়েছিল।'

'চাকরি করতে যাচ্ছ তাহলে?'

'যাব,' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে মুসা। 'সবচেয়ে ভাল হত, যদি ল্যাবরেটরিতে একটা কাজ পেতাম।'

'অত আশা কোরো না। টপ-সিক্রেট জিনিস বানায় ওরা। তোমার মত নতুন একটা পার্ট-টাইমারকে অত ভেতরে ঢোকাবে বলে মনে হয় না।'

'দেখা যাক, কি করে! তোমার কি খবর? কি জন্যে ফোন করেছ?'

'এমনি। কাজ না থাকলে চলে আসতে বলতাম। রবিনকেও বলেছি।'

'এখন তো পারব না। কারখানায় যাচ্ছি। ম্যানেজার দেখা করতে বলেছে। ইন্টারভিউ নেবে। পাস করলে চাকরি হবে।'

'যাও তাহলে। কি হয় না হয়, জানিয়ো। গুড লাক।'

রিসিভার রেখে দিল কিশোর। আগের রাতে বনের মধ্যে পাওয়া তীরন্দাজের ফিঙ্গার গার্ডটা বের করে দেখতে বসল আঙুলের ছাপ আছে কিনা।

কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগল না।

এই সময় এল রবিন। ওঅর্কশপের দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, 'কি করছ?'

ফিঙ্গার গার্ডটা দেখাল কিশোর, 'আঙুলের ছাপ খুঁজছি।'

'পাওয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'গেছে। ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে নিয়ে যাব। ছাপটা কার, পুলিশ রেকর্ডে আছে কিনা দেখতে হবে।'

'এখনই যাবে?'

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো। ক্যাপ্টেনকে এটা দিয়ে, হেনরিভিলে যাব মডার্ন পেপার কোম্পানিতে খোঁজ নিতে।'

এগারো

থানায় পৌঁছে চীফকে সমস্ত ঘটনা জানাল দুজনে।

শোনার পর মাথা দুলিয়ে ফ্লেচার বললেন, 'হুঁ, লোকগুলো বিপজ্জনক। সাবধানে থাকবে।' টেবিলে রাখা ফিঙ্গার গার্ডটা দেখালেন, 'আমি এর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছি। কিছু জানতে পারলে, জানাব।'

থানা থেকে বেরিয়ে হেনরিভিলে রওনা হলো ওরা। কাগজের কোম্পানিটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল। তার নাম স্যামসন। হাসিমুখে স্বাগত জানাল গোয়েন্দাদের। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'না, আশেপাশের কোন রিটেল শপেই কাগজ বিক্রি করি না আমরা। আমাদের কাস্টোমার হলো বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো। এই যে দেখো, লিস্ট।'

নামের একটা ছাপা তালিকা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল ম্যানেজার।

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল কিশোর। রবিনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। হতাশ হলো দুজনেই। একটা বিশেষ নাম দেখতে পেল না তালিকায়, যেটা ওরা দেখবে আশা করেছিল। ওয়ারনার কোম্পানি লিমিটেড আছে, কিন্তু ওয়ারনার করপোরেশন নেই।

কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে, হ্যানসনকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বেরোতে যাবে ওরা, এ সময় ডাকল ম্যানেজার, 'খানিক আগে আরও একজন এসেছিল কোম্পানির লিস্ট দেখতে। তোমরাও এলে। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। স্যামসনের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা তার নাম বলেছে? দেখতে কেমন?'

'হ্যাঁ। রাশেদ পাশা। বড় গোঁফ আছে। তোমার নাম কি?'

'কিশোর পাশা?'

অবাক হলো ম্যানেজার। 'তোমার কিছু হন নাকি উনি?'

'আমার চাচা।'

'আশ্চর্য! চাচা-ভাতিজা দুজনেই হাজির! কিসের খোঁজ করছ তোমরা, বলো তো?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। হুমকি দিয়ে চিঠি লেখা হয়েছে আমাদের, আপনাদের তৈরি কাগজে, ওয়াটার মার্কে তারকা আঁকা।'

ম্যানেজারকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে, তাকে হাঁ করিয়ে রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে চলে এল দুই গোয়েন্দা।

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল রবিন।

'বাড়ি চলো। চাচার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

ইয়ার্ডে এসে পাশা ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিসেই পাওয়া গেল রাশেদ পাশাকে। দরজাটা আধখোলা। কিশোরের কানে এল, তিনি বলছেন, '...সেই একই রকম এইট-অ্যান্ড-ওয়ান প্যাটার্ন। হ্যাঁ, এখুনি আসছি আমি।...গুড বাই।'

রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে দেখতে পেলেন। 'কিছু বলবি?'

ভেতরে ঢুকল কিশোর। পেছনে রবিন।

'সকালে মডার্ন পেপার কোম্পানির অফিসে গিয়েছিলে তুমি, চাচা,' কিশোর বলল।

মুচকি হাসলেন রাশেদ পাশা। 'আমার পিছু নিয়েছিলি নাকি তোরা?'

'না। সেলস ম্যানেজার স্যামসনের কাছে শুনে এলাম। কেন, গিয়েছিলে, চাচা? হুমকি দিয়ে লেখা কাগজটার ব্যাপারে কিছু জানতে?'

'অনেকটা সেই রকমই। একটা সন্দেহ করেছিলাম, তাই সূত্র খুঁজতে গিয়েছিলাম। পেয়েও গেছি। তবে কোনখানে নিয়ে যাবে ওটা, বুঝতে পারছি না।'

'তোমার গোপন কেসের ব্যাপারে কিছু?'

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। উঠে দাঁড়ালেন। 'একটা জরুরী কাজে এখুনি বেরোতে হবে আমাকে। আর কিছু বলবি?'

মাথা নাড়ল কিশোর। বুঝল, গোপন কেসটার ব্যাপারে এখনও কিছু বলতে চান না চাচা।

বাইরে বেরিয়ে রবিনকে বলল, 'বললে ভাল হত। সাহায্য করতে পারতাম।'

'কেসটা নিশ্চয় বিপজ্জনক। আমরা বিপদে পড়তে পারি, এই ভয়ে বলছেন না।'

'চাচা বলল, হেনরিভিলে গিয়ে একটা সূত্র পেয়েছে, সেটা কি হতে পারে বলো তো?'

শূন্য দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। নীরবে মাথা নাড়ল।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ওঅর্কশপের দিকে এগোল কিশোর। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ, জ্বলজ্বল করে উঠল চোখ। 'রবিন, বুঝে গেছি সূত্রটা কি!'

রবিনও দাঁড়িয়ে গেল, 'কি?'

'ওয়ারনার কোম্পানি লিমিটেড!'

'মানে!'

'চাচাকে উত্তেজিত দেখলে না? এটাই বুঝেছে!'

'কোনটা বুঝেছে?' বোকার মত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন।

'স্যামসন যে তালিকাটা দেখিয়েছে আমাদের, তাতে ওয়ারনার নামটা আছে, যদিও করপোরেশনের জায়গায় কোম্পানি লেখা। অনেক ধরনের

সিস্টার কোম্পানি থাকতে পারে ওয়ারনারদের, ওয়ারনার কোম্পানি লিমিটেডটাও ওদেরই।'

'কিন্তু তাতে কি?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'দুইয়ে দুইয়ে যোগ করো, চার পেয়ে যাবে। যতবার ওয়ারনারদের নতুন কারখানাটার কাছে গিয়েছি আমরা, একটা না একটা কিছু ঘটেছে। ওখান থেকে আসার পর তীর ছুঁড়ে মেসেজ পাঠিয়ে হুমকি দেয়া হয়েছে আমাদের; রাতে ঘুরে আসার পর বনের মধ্যে পিটিয়ে বেহুঁশ করে আমাদের ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওখানকার কোন কর্মচারী অকাজগুলো করেছে? ওয়ারনার কোম্পানির নামে মডার্ন পেপার থেকে আসে তারকা ছাপ মারা কাগজ, ওয়ারনারদের অন্যান্য অফিসে সাপ্লাই দেয়া হয়। সেই কাগজ থেকে কাগজ নিয়ে তাতে হুমকি দিয়ে নোট লিখেছে। কিন্তু কে?'

'সেইটাই রহস্য। আমাদের হুমকি দিচ্ছে, সেটা চাচার জন্যেও হয়তো হুমকি। তাহলে ধরে নিতে হবে, আমাদের জাল নোটের কেসের সঙ্গে চাচার টপ-সিক্রেট কেসটার কোন সম্পর্ক আছে।

'ভেবে দেখো, আরও সূত্র আছে। ওয়ারনার মিলে টিমের সাইকেলটা দেখে এসেছি আমরা। রাতে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়। যে কেউ ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে রাতের বেলা। আমাদের ইয়ার্ডে চলে আসাটা কোন কঠিন কাজ নয়।'

'তোমার কি মনে হয়, রাশেদ আংকেল ওয়ারনার করপোরেশনের কোন রহস্যের তদন্ত করছেন?'

'করতে পারে। গোপন যন্ত্রপাতি তৈরি করছে কোম্পানিটা। স্পেস মিসাইলের ব্যাপারে কোন ঘাপলা থাকতে পারে। সেটারই তদন্ত করছে হয়তো চাচা।'

গেটের বাইরে ইঞ্জিনের বিকট শব্দ শোনা গেল। দ্রুত কাছে চলে এল শব্দটা। কে আসছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোর আর রবিনের। গেটের দিকে তাকিয়ে রইল।

গেট দিয়ে ঢুকল মুসার জেলপি।

ভেতরে এসে থামল। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে হাসিমুখে নেমে এল মুসা। দূর থেকেই চিৎকার করে বলল, 'চাকরি হয়ে গেছে!'

'ল্যাবরেটরিতে?' জানতে চাইল রবিন।

'না, কারখানার ক্যাফেটেরিয়ায়। খাবারের তদারকি করতে হবে আমাকে।'

হেসে ফেলল রবিন, 'তাহলে আর পায় কে তোমাকে। অর্ধেক খাবারই তোমার পেটে যাবে, সেগুলোর হিসেব রাখবে কে?'

'আমিই রাখব,' কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। 'আরও সিরিয়াস খবর আছে,' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল সে।

হাত বাড়াল কিশোর, 'কি?'

'পড়েই দেখো।'

কাগজটা দেখেই চিনে ফেলল কিশোর, সেই একই জিনিস, তারকা ছাপ মারা। না খুলেও বুঝতে পারল, আবার হুমকি দেয়া হয়েছে। ভাঁজ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলে?'

'আমার গাড়ির সীটে। গাড়ি নিয়ে কারখানায় গিয়েছিলাম। ইন্টারভিউ দিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি পড়ে আছে।'

পড়ল কিশোর। রবিনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। কাগজটায় লেখা:

তোমার দোস্তদের সাবধান করে দিয়ো
যাতে আমাদের কাজে নাক না গলায়।
তুমিও সাবধানে থেকো। বেশি
বাড়াবাড়ি করলে মরবে।

নিচে কোন সইটই নেই।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মুসা, 'কার কাজ বলো তো? নিশ্চয় সেই ব্যাটা তীরন্দাজ!'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'গাড়িটা কোথায় রেখে গিয়েছিলে?'

'মিলের গেটের কাছে। গার্ড বলল, ওখানে গাড়ি রেখে যেতে। ওকে যখন বললাম, পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যেতে বলেছে, মুখের অবস্থা যা হয়েছিল যদি দেখতে।'

বারো

'তাহলে তোমার ধারণা,' মুসা বলল, 'ওয়ারনার মিলের কোন কর্মচারী নোট জালিয়াতিতে জড়িত?'

ওঅর্কশপে বসে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। সবুজ গাড়িতে করে বিডদের ইয়ার্ড থেকে মাল কিনতে গিয়ে জাল নোট দিয়ে এসেছে যে ছেলেটা, সে টিম ফ্রিস্ক, তাতেও কোন সন্দেহ নেই আর এখন আমার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল তিনজনেই। অবশেষে রবিন জানতে চাইল, 'কি করতে চাও তাহলে এখন?'

'সেইটাই ভাবছি। রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওয়ারনার মিলে। সেখানেই গিয়ে তদন্ত চালাতে হবে আমাদের। দাঁড়াও, তার আগে এই কাগজটা দেখে ফেলি, আঙুলের ছাপ আছে কিনা।'

'পাবে?'

'মনে হয় না। তবুও, দেখি।'

কয়েক মিনিট পর মুখ তুলে মাথা নাড়ল কিশোর, 'নেই। চলো,

ওয়ারনার মিলে যাই।'

মিলের সীমানার বাইরে কাঁচা রাস্তায় গাড়ি রাখল মুসা।

হাত তুলে রবিন বলল, 'ওই যে, ঘাস কাটছে টিম।'

গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোল তিনজনে।

শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকাল টিম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর হাত থেকে কাঁচিটা ফেলে দিয়ে ঘুরে দৌড় মারল পাহাড় থেকে নেমে আসা খরস্রোতা নদীটার দিকে, যেটার ওপরে ছোট ব্রিজ তৈরি হয়েছে।

'অ্যাই, শোনো, শোনো!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল টিম। থামল না। সরু নদীটার কাছে চলে গেছে। হোঁচট খেলো একটা পাথরে। তাল সামলাতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে উল্টে গিয়ে পড়ল পানিতে।

দৌড়ে এল তিন গোয়েন্দা।

তীব্র স্রোত নদীতে। তাতে হাবুডুবু খাচ্ছে টিম। ভাল সাঁতার জানে না ছেলেটা। হাত-পা ছুঁড়ে কোনমতে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। আরও ভাটিতে চলে গেলে, স্রোতের বেগ আরও বাড়বে, তখন আর ভেসে থাকতে পারবে না, ডুবে মরবে নিশ্চিত।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পানিতে। তর তর করে পানি কেটে সাঁতরে চলে গেল টিমের কাছে। দুই বগলের নিচে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে টেনে ধরল, মাথাটা খাড়া করে রাখতে বলল পানির ওপরে।

স্রোতের মধ্যে একটা বোঝা টেনে আনতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো তাকে। তবে নিরাপদেই কিনারে পৌঁছল। টিমকে ডাঙায় টেনে তুলতে মুসাকে সাহায্য করল কিশোর আর রবিন।

মাটিতে চিত করে শুইয়ে দিয়ে টিমের পেটে চাপ দিতে লাগল মুসা। গলগল করে বমি করে ফেলল টিম, পানি বেরিয়ে এল পেট থেকে। চোখ বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল।

ওকে সামলে নেয়ার সময় দিল ওরা।

খানিক পর চোখ মেলে দুর্বল কণ্ঠে টিম বলল, 'ধন্যবাদ। আমার জীবন বাঁচালে তোমরা!'

'ও কিছু না,' হেসে বলল মুসা। 'ভাল লাগছে এখন?'

শুয়ে থেকেই মাথা ঝাঁকাল টিম।

'দোষটা তো তোমারই,' কিশোর বলল, 'দৌড় মারলে কেন?'

জবাব দিতে দ্বিধা করল টিম। 'মিস্টার লফার—গেটের গার্ড বলল তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও। কথা বলতে মানা করে দিয়েছে সে আমাকে। বলেছে, বাইরের লোকের সঙ্গে ওয়ারনার মিলের কর্মচারীদের কথা বলা নিষেধ। ম্যানেজার জানলে চাকরি যাবে।'

'কিন্তু তোমাকে তো আমাদের কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।

জবাব জানা খুব জরুরী। কি করা যায়, বলো তো?'

'কি জানতে চাও?'

'রাতে তোমার সাইকেলটা নিয়ে কি কেউ বেরোয়? আমাদের বাড়িতে সেদিন একটা চিঠি রেখে আসতে গিয়েছিল।'

'চিঠি! কই, আমি তো কিছু জানি না!'

'হেনরিভিলের সাইকেল পার্টসের দোকান থেকে একটা প্যাডেল কিনেছিলে তুমি?'

অবাক হলো টিম, 'হ্যাঁ! তোমরা জানলে কি করে! কাল সকালে সাইকেল আনতে গিয়ে দেখি একটা প্যাডেল নেই, ভেঙে কোথায় পড়ে গেছে। বুঝলাম, আমাকে না জানিয়ে কেউ সাইকেলটা ব্যবহার করেছে। মিস্টার লফারকে জানালাম। আমাকে বলল, হেনরিভিলে গিয়ে প্যাডেল কিনে নিয়ে আসতে। অফিসের কাজে সাইকেল জরুরী দরকার।'

মিলের মধ্যে কারও কাছে তীর-ধনুক দেখেছ নাকি?— প্রশ্নটা মুখে এসে গিয়েছিল কিশোরের, লফারকে আসতে দেখে চেপে যেতে হলো।

কাছে এসে দাঁড়াল লফার। 'কি হয়েছে?'

অসাবধানে যে পানিতে পড়ে গিয়েছিল টিম, এ কথা গার্ডকে জানাল কিশোর।

ছেলেটার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিল লফার। তারপর টিমকে শুকনো কাপড় বদলে আসার জন্যে মিলের ভেতরে পাঠিয়ে দিল।

লফারকে দু'একটা প্রশ্ন করা যায় কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় গেটের কাছে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, একটা ট্রাক আসছে। সবুজ রঙ। মলিন হয়ে গেছে।

গেট খুলে দেয়ার জন্যে দৌড় দিল লফার। তাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পেল না কিশোর।

কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'দেখো, ট্রাকটার গায়ে নাম নেই! বিড এটার কথাই বলেছিল!'

গেটের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

ততক্ষণে আবার চলতে আরম্ভ করল ট্রাক, ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওটাকে ভাল করে দেখার আগেই চলে গেল একটা বিল্ডিঙের আড়ালে।

বিড়বিড় করল রবিন, 'এখন যে ট্রাক চালাচ্ছে, সে-ই লয়েডকে জাল নোট দিয়ে আসেনি তো?'

ড্রাইভারকেও ভালমত দেখতে পায়নি ওরা। হুইলের ওপর ঝুঁকে বসেছে। মাথার ক্যাপটা অনেক বেশি টেনে দিয়েছে কপালের ওপর।

'এটাই সে ট্রাকটা হলে,' কিশোর বলল, 'ওয়ারনার কোম্পানির কারও সঙ্গে জালিয়াতদের যে সম্পর্ক আছে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।'

গেটের পাল্লা লাগিয়ে দিল লফার।

তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ট্রাকটা কি ওয়ারনার কোম্পানির?'

'না।'

'কার?'

মাথা নেড়ে গার্ড বলল, 'সরি. এসব তথ্য জানাতে পারব না আমি তোমাদের। যাই, আমার কাজ আছে।'

গার্ডহাউসে গিয়ে ঢুকল সে।

'আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে,' মুসা বলল।

'টিমের সঙ্গে কথা বলা হলো না,' আনমনে বলল কিশোর। 'এক কাজ করা যাক, আমি আর রবিন চলে যাই গুহাটা দেখতে। সুড়ঙ্গের মধ্যে কি আছে না জানা পর্যন্ত মনের খুঁতখুঁতি যাচ্ছে না...'

'টিম না বেরোনো পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থাকি এখানে,' মুসা বলল। 'যেহেতু আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি, আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতেও পারে।'

'ঠিক। থাকো।'

'কিন্তু এই ভেজা কাপড়ে কতক্ষণ?'

'কাপড়গুলো খুলে চিপে নাও না। গা মুছে নিতে পারো। গাড়িতে তোয়ালে আছে না?'

'আছে।'

'তাহলে আর অসুবিধে কি। তুমি থাকো তাহলে। আমরা যাই।'

তেরো

রবিনকে নিয়ে রওনা হলো কিশোর। কিন্তু ওরা গুহার কাছে পৌঁছার আগেই দৌড়ে এল মুসা। বলল, 'টিম বেরিয়ে এসেছিল। ধরলাম তাকে। বলল, জরুরী কাজ আছে। একটা খাম ডেলিভারি দিতে যাবে শহরতলির জনসন বিল্ডিঙে। সাইকেল নিয়ে গেল। ভাবলাম, তোমাদের জানানো দরকার।'

'তাই নাকি!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। 'চলো চলো, ওর পিছু নিই।'

দৌড়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল তিনজনে। রকি বীচে যাওয়ার মেইন রোড ধরে গাড়ি চালাল মুসা, আশা করল পথে দেখা পাবে টিমের।

কিন্তু পেল না।

'অন্য কোন পথে গেছে,' রবিন বলল।

জনসন বিল্ডিঙে আসার পথে কোথাও টিমের দেখা মিলল না। বাড়িটার সামনের পার্কিং স্পেস ভর্তি, একটা গাড়ি ঢোকানোরও জায়গা নেই। রাস্তার ধারে কোথাও পার্ক করা যাবে না। অগত্যা কিশোর আর রবিনকে নামিয়ে দিয়ে মুসা বলল, 'তোমরা যাও। আমি বার বার পুরো ব্লকটা ঘিরে চক্কর দিতে

থাকব।'

বিল্ডিঙের বাইরে টিমের সাইকেলটা দেখা গেল না।

বাড়ির লবিতে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। পাঁচটা বাজে। এলিভেটর বোঝাই করে নেমে আসছে অফিসের কর্মচারীরা। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটল দুজনে। কিন্তু কোথাও চোখে পড়ল না টিমকে।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল রবিনের, 'আচ্ছা, কিশোর, বারনি মেলের কাছে চিঠি দিতে আসেনি তো টিম? সেদিন রাস্তা থেকে যে খামটা তোলা হয়েছিল, তাতে এই নাম লেখা দেখেছি। হয়তো ওই ভদ্রলোকের অফিসেই বসে আছে এখন টিম।'

বিল্ডিং ডিরেক্টরিতে দ্রুত চোখ বোলাল দুজনে। বারনি মেলের নাম দেখতে পেল না। এলিভেটর অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এ নামে কেউ এই বিল্ডিঙে আছে বলে তার জানা নেই।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'লাল শার্ট পরা লম্বা একটা ছেলেকে কয়েক মিনিট আগে ঢুকতে দেখেছেন?'

'দেখেছি। পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগে। ছেলেটা এসে ওই কোণে দাঁড়িয়ে থাকা,' হাত তুলে লবির একটা কোণ দেখাল অপারেটর, 'একজন লোকের হাতে একটা খাম দিল। খামটা নিয়ে লোকটাও বেরিয়ে গেল, ছেলেটাও।'

'ওই লোকের নাম বারনি মেল?'

'হতে পারে। আমি জানি না। চিনিও না লোকটাকে।'

তাড়াহুড়া করে বাইরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই জেলপিটাকে আসতে দেখল। ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। ওদের দেখে গতি বাড়িয়ে দিল মুসা।

গাড়িটা এসে থামতে উঠে পড়ল রবিন আর কিশোর।

'মিলে ফিরে যাও,' মুসাকে বলল কিশোর। 'জলদি। দেখা যাক, ফেরার পথে টিমকে ধরা যায় কিনা।'

'ওকে পাওনি?'

'না।'

'ভাগ্যিস স্যান্ডউইচগুলো কিনে নিয়েছিলাম,' পাশের সীটে ফেলে রাখা প্যাকেটটা দেখাল মুসা। 'আমার মনে হচ্ছিল, আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'ভাল করেছ,' হাসল রবিন।

ফেরার পথেও টিমকে দেখতে পেল না ওরা। মিলের কাছাকাছি রাস্তায় একটা বাঁক আছে। সেটার মুখে আসতেই ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল একটা সবুজ ট্রাক। সাইড দিল না।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। একই সঙ্গে বন বন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাঁয়ে কেটে রাস্তার একধারে সরিয়ে নিয়ে এল গাড়ি। অল্পের জন্যে মুখোমুখি গুঁতো লাগল না দুটো গাড়ির। বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন তুলে

ছুটে চলে গেল ট্রাকটা।

'সেই ট্রাকটাই,' পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে রবিন। 'তবে এবার লাইসেন্স নম্বর পড়ে ফেলেছি।'

'ড্রাইভারের চেহারা এবারও দেখিনি,' কিশোরও তাকিয়ে আছে ট্রাকটার দিকে। 'মুসা, পিছু নাও ওটার।'

গাড়ি ঘোরাল মুসা। অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল যতটা যায়। বিকট গর্জন তুলে ছুটতে শুরু করল জেলপি। 'মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে ব্যাটা। ওকে অ্যারেস্ট করানো দরকার।'

ট্রাকের ড্রাইভারও মনে হয় বুঝে ফেলেছে অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। গতি বাড়িয়ে দিল সে। ওটার সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেয়ে গেল মুসা।

হঠাৎ বুম্‌ম্ করে এক বিকট শব্দ। কেঁপে উঠল জেলপি।

মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল রবিন, 'আই দেখো দেখো, বোমা ফাটিয়েছে!'

ওয়ারনার মিলের ওদিকের আকাশে গাঢ় ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

আবার হলো বিস্ফোরণের শব্দ।

'কারখানাটা উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে নাকি!' বলল রবিন।

বিস্ফোরণের শব্দ আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ করে দিল ওদের। এমন জোরে ব্রেক কষল মুসা, পেছনের সীটে বসা কিশোর আর রবিনের মনে হলো আরেকটু হলেই উড়ে গিয়ে পড়ত সামনের সীটে।

'আরে, আস্তে, আস্তে! করো কি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

ট্রাকটাকে অনুসরণ করার কথা ভুলে গেল তিনজনেই। ওয়ারনার মিলে কি ঘটেছে সেটা দেখা এখন জরুরী।

আবার গাড়ি ঘোরাল মুসা।

আরও কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। টান টান হয়ে সামনে ঝুঁকে বসেছে ওরা। ওয়ারনার মিলের ভেতরে কি ঘটেছে দেখার জন্যে অস্থির।

গেটের কাছাকাছি আসতে চোখে পড়ল, উত্তর-পূর্ব কোণের একটা নিঃসঙ্গ বিল্ডিঙে আগুন জ্বলছে। ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে।

'মনে হয় ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগেছে,' অনুমান করল কিশোর। 'গাড়ি রাখো।'

গাড়ি থামতে না থামতে দুপাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল কিশোর আর রবিন। ভাল করে তাকাল বাড়িটার দিকে। বিস্ফোরণের আঘাতে প্রায় সবগুলো জানালার কাঁচ ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। প্রতিটি ফোকর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

মুসাও নেমে এল। ওদের চোখের সামনে বিল্ডিঙের পশ্চিম প্রান্তের ছাতটা দেবে গিয়ে অনেক বড় একটা গর্ত হয়ে গেল। বাতাস ঢুকতে লাগল সে পথে। নতুন করে অক্সিজেন পেয়ে দ্বিগুণ তেজে ফুঁসে উঠল আবার আগুন।

'ভাগ্যিস ছুটি হয়ে গেছে,' বড় বড় চোখে বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে থেকে

বলল মুসা। 'নইলে কতজন যে মরত আর জখম হত, আল্লাহই জানে!'

'এখনও ভেতরে কেউ আছে কিনা কে জানে,' রবিন বলল।

সাইরেনের চিৎকার শোনা গেল। মাটি কাঁপিয়ে মিলের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল দমকলের ভারী গাড়িগুলো। পুলিশের গাড়িও রয়েছে ওগুলোর সঙ্গে। একটা গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। তাঁর দিকে ছুটে গেল ছেলেরা।

'তোমরা এখানে কি করছ?'

'তদন্ত করতে এসেছিলাম,' জবাব দিল কিশোর।

গেট খুলে দিল গার্ড। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল দমকলের গাড়ি। পুলিশ অফিসাররাও ভেতরে ঢুকল। কয়েকজন ছুটে আসা কৌতূহলী দর্শকদের ঠেকাতে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তিন গোয়েন্দাও ঢুকে পড়ল ভেতরে। বাধা দেয়ার সুযোগই পেল না গার্ড।

দেখতে দেখতে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল দমকল বাহিনীর দক্ষ ফায়ার ফাইটাররা। কয়েকজন ভেতরে চলে গেল কেউ আটকা পড়েছে কিনা দেখার জন্যে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ওদের দিকে এগিয়ে এলেন ফায়ার চীফ। গম্ভীর হয়ে ফ্লেচারকে জানালেন, 'আগুন লাগাটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। লাগানো হয়েছে; স্যাবটাজ। দু'মাস আগে হোমারগেটে যা ঘটেছিল, ঠিক একই ঘটনা।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, ফিসফিস করে বলল, 'স্যাবটাজ!'

একটা কথা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল কিশোরের মনে। তাড়াতাড়ি একপাশে টেনে নিল দুই সহকারীকে। উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ফোন করার সময় চাচা কি বলেছিল, মনে আছে! সেই একই রকম এইট-অ্যান্ড-ওয়ান প্যাটার্ন! এখুনি আসছি আমি!'

হাঁ করে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন। বুঝতে পারল না।

'দুই মাস মানে আট সপ্তাহ!' বলে যাচ্ছে কিশোর। 'নিশ্চয় স্যাবটারদের টাইম শিডিউলের কথা বলেছে চাচা। সেই হিসেবে আজকে ওয়ারনার মিলে বিস্ফোরণ ঘটার কথা ছিল।'

আঁতকে উঠল রবিন, 'কি বলছ! তবে কি রাশেদ আংকেল এখানেই এসেছিলেন? ল্যাবরেটরির ভেতরে নেই তো এখন?'

'খাইছে! তাহলে তো আমাদেরও ঢুকে দেখা উচিত, এক্ষুণি!' সোজা ল্যাবরেটরির দিকে পা বাড়াল মুসা।

ডাক দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কোথায় যাচ্ছ?'

সন্দেহের কথাটা তাঁকে জানাল কিশোর।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিন্তু তোমরা গিয়ে কি করবে? মিস্টার পাশা ভেতরে

থাকলে ফায়ার ফাইটাররাই খুঁজে বের করে আনবে। এ সব কাজে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ওরা। তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আরও বোমা পাতা থাকতে পারে। শিওর না হয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি না আমি তোমাদের। বরং বাড়ি চলে যাও। গিয়ে দেখো, তোমার চাচা ফিরেছেন কিনা। আর এখানে থেকে থাকলে, আমি তো আছিই। যা করার করব। ফোনের কাছে থেকো। খবর পাবে।'

চোদ্দ

ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। ক্যাপ্টেনের চাপাচাপিতে থাকতে পারল না। রাত হয়ে গেছে। তারা জ্বলা আকাশের পটভূমিতে পোড়া, কালো বিল্ডিংটাকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে এখন। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

মুসার গাড়িতে করে ইয়ার্ডে ফিরে এল তিনজনে।

ওদের দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী, 'ছিলি কোথায়? ওয়ারনার মিলের ওদিকে অনেকগুলো বোমা ফাটার শব্দ শুনলাম। ওদিকে গিয়েছিলি নাকি?'

'হ্যাঁ, মুসাদের বাড়ির কাছে একটা গুহায় ঢুকতে গিয়েছিলাম। বোমা ফাটার শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি ওয়ারনার মিলের ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগেছে। আগুন নিভিয়ে ফেলেছে দমকলের লোকেরা। চাচা কোথায়?'

'কি জানি। ফেরেনি তো এখনও। কোন আক্কেলে যে লোকটা গোয়েন্দাগিরি ধরতে গেল! চিন্তায় বাঁচি না!'

আরও বেশি চিন্তা করতে পারেন চাচী, এ কথা ভেবে চাচা কোন্‌খানে থাকতে পারে এই সন্দেহের কথাটা আর বলল না কিশোর। সরে এসে মুসা আর রবিনকে বলল, 'তোমরা বাড়িতে ফোন করে দাও, রাতে এখানেই থাকবে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে বলল মুসা, 'কিছু ঘটার আশঙ্কা করছ নাকি?'

'ঘটনা ঘটতে যখন আরম্ভ করেছে, আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে। কিছু বলা যায় না।'

গাড়ি থেকে স্যান্ডউইচের প্যাকেট বের করে আনল মুসা। অহেতুক কিনেছে। মেরিচাচীর রান্না করা গরম গরম খাবার ফেলে ওগুলো খেতে কি আর ভাল লাগে। তবু পয়সা দিয়ে কিনেছে যখন গিলে তো ফেলতেই হবে।

খেয়েদেয়ে ওঅর্কশপে এসে বসল তিনজনে। বার বার উদ্বিগ্ন হয়ে ফোনের দিকে তাকাচ্ছে। রাশেদ পাশাকে নিশ্চয় পাওয়া যায়নি এখনও। পেলে, কিংবা তাঁর কোন খোঁজ পেলে ফোন করতেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু চাচা কি আসলেই ওয়ারনার মিলে গেছে? ভাবছে কিশোর। ওখানে না গিয়ে থাকলে আর কোথায় যেতে পারে?

খুব ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে সময়। উত্তেজনায় কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না কারও।

রাত এগারোটা বাজল।

ওঅর্কশপের দরজায় এসে দাঁড়ালেন মেরিচাচী, 'কিশোর, তোর চাচা তো এখনও ফিরল না।'

'ফিরবে। কোথাও আটকে পড়েছে হয়তো।'

'তোরা শুতে যাবি না?'

'এত তাড়াহুড়া কি। ঘুম তো পাচ্ছে না। চাচার জন্যে অপেক্ষা করি।'

মেরিচাচী চলে গেলেন।

চুপ করে থাকলে সময় কাটে না। কথা শুরু করল রবিন, 'আমি বুঝতে পারছি না, ওয়ারনার মিলে ঢুকল কি করে বোমাবাজরা। দুটো গেটই বন্ধ, কড়া পাহারা থাকে। ল্যাবরেটরিতে যতগুলো বিস্ফোরণ ঘটাল, তার জন্যে প্রচুর বিস্ফোরক দরকার। লুকিয়ে কারও পক্ষে ওগুলো ঢোকানো সম্ভব নয়, ভেতরের সাহায্য ছাড়া।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর, রবিনের দিকে তাকিয়ে থামিয়ে দিল। আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'সবুজ ট্রাক! মিলের জন্যে স্বাভাবিক মাল সাপ্লাই করার সময় মালের ভেতর ডিনামাইট লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসে।'

'ঠিক! সে জন্যেই তখন অত তাড়াহুড়া করে ছুটে যাচ্ছিল। ড্রাইভার জানত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোমা ফাটবে।' ফোনের দিকে হাত বাড়াল রবিন, 'চীফকে গাড়ির নম্বরটা জানানো দরকার।'

কিন্তু সে রিসিভার তোলার আগেই বেজে উঠল ফোন। শব্দটা চমকে দিল ওদের। নিশ্চয় রাশেদ পাশা। থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রবিন। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে নিরাশা ফুটল চেহারায়। বলল, 'রঙ নাম্বার!'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেই থানার নম্বরে ডায়াল করল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'ক্যাপ্টেন অফিসে ফিরেছেন কিনা কে জানে!' ওপাশে রিঙ হতে শুনল। কয়েক সেকেন্ড একভাবে ধরে রেখে আরও হতাশ হয়ে বলল, 'এনগেজড।'

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

মুসা বলল, 'এই টেনশন আর সহ্য করতে পারছি না আমি। চলো, আবার ওয়ারনার মিলে চলে যাই। কারও ওপর ভরসা করে কিছু হবে না। নিজেদেরই দেখা দরকার।'

একমত হয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ওঅর্কশপের দরজায় বেরোতেই গেটে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিনজনেই।

ফিরে এসেছেন রাশেদ পাশা।
ছুটে গেল ওরা।
লিভিং রুম থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মেরিচাচী।
গাড়িটা ইয়ার্ডে ঢুকে দাঁড়াতেই জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। বিধ্বস্ত, ফ্যাকাসে লাগছে চাচার চেহারা। কপালের বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা গোল আলুর মত ফুলে নীল হয়ে আছে। টলতে টলতে গাড়ি থেকে নামলেন। হাঁটার শক্তি নেই যেন।
তাড়াতাড়ি দুদিক থেকে তাঁকে ধরে ফেলল কিশোর আর মুসা। বসার ঘরে নিয়ে এল। ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন তিনি। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছেন মেরিচাচী।
'ভয়ের কিছু নেই,' মলিন হাসি হাসলেন রাশেদ পাশা। 'আমি ভালই আছি।'
'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন মেরিচাচী। বরফ আর তোয়ালে আনতে চলে গেলেন।
'স্যাবটাজ কেসটায় কাজ করছ তুমি, তাই না?' চাচাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওয়ারনার মিলের ল্যাবরেটরিতে ছিলে বিস্ফোরণের সময়।'
'আস্তে বল!' দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন রাশেদ পাশা। 'তোর চাচী শুনলে আস্ত রাখবে না!'

পনেরো

সেবা-শুশ্রূষার পর খেয়েদেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে অফিসে ঢুকলেন রাশেদ পাশা। সঙ্গে তিন গোয়েন্দা।
'কাল সকালে এফ-বি-আইকে রিপোর্ট দিতে হবে,' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোরা জানলি কি করে আমি ওয়ারনার মিলে গেছি?'
'টেলিফোনে বলতে শুনেছি তোমাকে, এইট-অ্যান্ড-ওয়ান প্যাটার্ন।'
'ও,' হাসলেন তিনি। 'বুঝে ফেলেছিস তাহলে।'
'হ্যাঁ।'
'আর লুকিয়ে লাভ নেই তোদের কাছে। স্যাবটারদের একটা দলকে ধরার চেষ্টা করছি আমি। একের পর এক অনেকগুলো কারখানায় স্যাবটাজ হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আঘাত হেনেছে স্যাবটাররা। হিসেব করে বের করলাম, আট হপ্তা একদিন পর পর এ কাজ করেছে। বুঝতে পারলাম, এরপর ওয়ারনার মিলের ওপর নজর ওদের। হিসেব মত আজই বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা। এবং তা-ই ঘটিয়েছে।'
চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।
পাশা বললেন, 'অফিস ছুটির পর পর বোমা ফাটানো হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে

একই নিয়ম মেনে চলেছে স্যাবটাররা। ওয়ারনার মিলে বোমা ফাটানো হবে বুঝতে পেরে দুদিন আগে থেকেই খোঁজ-খবর শুরু করে দিলাম। ওখানকার প্রতিটি বিল্ডিং খুঁজে দেখেছি কোথাও বোমা লুকানো আছে কিনা। সেই সঙ্গে অপরাধীদের ধরার চেষ্টা চালালাম। আমার অনুরোধে একজন গার্ড আমাকে গোপনে সাহায্য করতে রাজি হলো।

'সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলাম না। শেষে আজকে গিয়ে গোপনে নজর রাখলাম গবেষণা হয় যে বিল্ডিঙে, তার ওপর। ছুটির পর কর্মচারীরা সব বেরিয়ে গেলে চুপি চুপি পুব দিকের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লাম। আমিও ঢুকলাম, ঠিক এই সময় ঘটতে শুরু করল ঘটনা।'

দম নেয়ার জন্যে থামলেন তিনি।

'কি দেখলে?' জানার জন্যে উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়েছে কিশোর।

'হল থেকে দ্রুতপায়ে পশ্চিমের ল্যাবরেটরিতে চলে যাচ্ছে দুজন লোক। পরনে ল্যাবরেটরি কর্মীর পোশাক, হাতে চামড়ার ব্যাগ। ছুটি হয়ে গেছে। ওই সময় ল্যাবরেটরিতে কারও থাকার কথা নয়। সন্দেহ হলো। কথা বলার জন্যে ডাক দিলাম। ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখে চমকে গেল ওরা, ছুটে চলে গেল সিঁড়ির দিকে।'

'চেহারা দেখেছ? দেখতে কেমন?'

'প্রথমে দেখিনি, আমার দিকে পেছন করে হাঁটছিল। আমি ডাকলে ফিরে তাকাতে একজনের চেহারা দেখেছি। গাট্টাগোট্টা, ঘন, মোটা ভুরু। যাই হোক, ওরা দৌড় দেয়ার পর ওদের পিছু নিতে যাব এই সময় নাকে ঢুকল পোড়া গন্ধ। মনে হলো পুবের ল্যাবরেটরি থেকে আসছে। সেদিকে যাওয়াটা জরুরী মনে করে কি পুড়ছে দেখার জন্যে ছুটলাম। চোখে পড়ল লম্বা একটা ফিউজ পুড়ছে। তারটাকে অনুসরণ করে দৃষ্টি সরাতে দেখলাম দেয়ালে বসানো একটা চিঠির বাক্সে ঢুকে গেছে ওটা, ভেতরে যে ডিনামাইট আছে বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'তারটা বাক্সে না ঢোকা পর্যন্ত ডিনামাইট ফাটবে না। তাড়াতাড়ি ছুরি বের করে দৌড়ে গিয়ে ফিউজের তারটা কেটে আলাদা করে দিলাম। কিন্তু পেশাদার বোমাবাজরা একটা ডিনামাইট সেট করে সন্তুষ্ট থাকে না। বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বোমা পেতে রাখে, যাতে দু'একটা বিচ্ছিন্ন করে দিলেও বাকিগুলো ফেটে যায়। সেই সন্দেহ করেই আর কোথায় বোমা আছে খুঁজতে চললাম। পশ্চিম দিকে দেখেছি লোক দুজনকে। ভাবলাম, ওদিকেও পেতে রেখে এসেছে। সুতরাং দৌড় দিলাম সেদিকে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে কপালের ব্যথা পাওয়া জায়গাটায় হাত বোলালেন পাশা। 'কিন্তু পৌঁছতে পারলাম না ওখানে। বোমা ফেটে গেল। উড়ে গিয়ে বাড়ি খেলাম দেয়ালে। একটা সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়ে গেলাম পুব দিকে। ফোনের কাছে গিয়েই বেহুঁশ হয়ে গেলাম। কতক্ষণ পড়ে ছিলাম বলতে পারব না। আগুন নেভানোর পর ফায়ারম্যানরা আমাকে খুঁজে পেয়ে বাইরে বের করে আনল।'

'এখন তো ভাল আছ,' কিশোর বলল।

'হ্যা,.আছি।'

'বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট আগে একটা সবুজ ট্রাককে পালিয়ে যেতে দেখেছি আমরা,' মুসা বলল। 'ওটাতে করে পালাতে পারে স্যাবটাররা। আমরা পিছু নিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরিতে বোমা ফাটল। কি হয়েছে দেখার জন্যে ছুটলাম। ভাবলাম, অনেক লোক আটকা পড়ে যেতে পারে ভেতরে, তাদের সাহায্য দরকার হতে পারে। ট্রামের পিছু পিছু আর যাওয়া হলো না।'

'গাড়িটার নম্বরও মুখস্থ করে রেখেছি আমি,' একটুকরো কাগজে নম্বরটা লিখে বাড়িয়ে ধরল রবিন।

তখনই থানায় ফোন করে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে নম্বরটা জানিয়ে দিলেন পাশা। ফোন রেখে ছেলেদের জানালেন, ক্যাপ্টেন বলেছেন, মোটর ভেহিকল ব্যুরোতে খোঁজ নিয়ে সকালের মধ্যে ট্রাকটা কার, বের করে ফেলার আশা করছেন তিনি। তীরন্দাজের ফিঙ্গার গার্ডে আঙুলের ছাপের ব্যাপারেও হয়তো কিছু করতে পারবেন।

আপাতত আর কোন কাজ নেই। ইয়ার্ডে থাকারও দরকার নেই। বাড়ি রওনা হলো রবিন আর মুসা।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে রবিনকে ইয়ার্ডে আসতে ফোন করল কিশোর। মুসাকে করল না। ওকে করে লাভ নেই, আসতে পারবে না, চাকরিতে যাবে।

কিশোর বলল, 'হুমকি দিয়ে লেখা নোটগুলো আরেকবার দেখা দরকার।'

'কেন?' তাক থেকে একটা ফাইল নিয়ে এল রবিন। কাগজগুলো রেখেছে তাতে। ঠেলে দিল কিশোরের দিকে।

তীরের মাথায় গেঁথে ছোঁড়া কাগজ আর মুসার গাড়িতে ফেলে রাখা কাগজ, দুটো বের করে নিল কিশোর। মিনিটখানেক তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তারপর মাথা দোলাল, 'হুঁ, বুঝলাম।'

'কি বুঝলে?'

'দুটো কাগজের ছাপা এক রকম লাগছে। এবং এগুলোর সঙ্গে মিল দেখেছি আরও একটা লেখার—বারনি মেলের কাছে যে খামটা নিয়ে যাচ্ছিল টিম, তার ঠিকানা। আমি শিওর।'

'কি করতে চাও?'

'জানতে চাই, খামের ওপর ঠিকানা কে লিখেছে?' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর, 'কি লেখা থাকে চিঠিতে? জনসন বিল্ডিঙে টিমকে নিয়মিত পাঠানো হয় কিনা। কেন পাঠায়? বারনি মেলটাই বা কে? বোঝা যাচ্ছে, খামের ওপর ঠিকানা যে লিখেছে, সে-ই হুমকি দিয়ে নোট পাঠিয়েছে আমাদের। বারনি মেল তার সহযোগী। জনসন বিল্ডিঙে তার কাছে জরুরী কোন মেসেজ

পাঠানো হয়। সেই মেসেজটা কি, জানা দরকার।'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে জালিয়াতদের সঙ্গে স্যাবটারদের কোন সম্পর্ক আছে। সেটা কি?'

'টিমকে কথা বলাতে পারলে অনেক প্রশ্নের জবাব জানা যাবে। যাবে নাকি একবার ওয়ারনার মিলে?'

'চলো।'

হেডকোয়ার্টার থেকে বাইরে বেরোল দুজনে। বারান্দায় দেখা গেল রাশেদ পাশাকে। রাতে ভাল করে ঘুমানোর পর অনেক সুস্থ লাগছে এখন তাঁকে। ওদের দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন। জানালেন, ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন সবুজ ট্রাকটার লাইসেন্স প্লেটটা নকল। ফিঙ্গার গার্ডে পাওয়া আঙুলের ছাপের মালিকের আসল নাম জানা যায়নি, মিস্টার আর্চার নামে সে পরিচিত ছিল এক সময়।

'বেশ কয়েক বছর একটা সামার রিসর্টে কাজ করেছে সে,' পাশা বললেন। 'ধনী লোকেরা বেড়াতে যায় ওখানে। তাদের অনেককে তীর ছোঁড়া শিক্ষা দিয়েছে আর্চার। তাদের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে টাকা আদায় করেছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর গা ঢাকা দেয় সে। পুলিশের ফাইলে তার কোন ছবি নেই। তবে চেহারার বর্ণনা লেখা আছে। মাঝারি উচ্চতার লোক, কালো চুল, বাদামী চোখ। চমৎকার কণ্ঠস্বর।'

'এটুকু তথ্য দিয়ে আর কি হবে, পাওয়া যাবে না লোকটাকে,' রবিন বলল। 'খুঁজলে রকি বীচে ওরকম কয়েক ডজন লোক পাওয়া যাবে।'

'তা যাবে,' মাথা দোলাল কিশোর, 'কিন্তু ওয়ারনার মিলে ওরকম কজন আছে?'

'জানা দরকার,' ফোন করার জন্যে লিভিং রুমে রওনা হলেন রাশেদ পাশা। মিলে ফোন করে পারসোনেল ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করলেন জানার জন্যে যে ওই চেহারার কোন লোক আছে কিনা তাদের কারখানায়।

টিমের কথা চাচাকে জানাল কিশোর। তাকে দিয়ে পাঠানো খামের ঠিকানা আর হুমকি দিয়ে লেখা নোটগুলো একই টাইপরাইটারে লেখা, এটাও বলল।

'খুব মূল্যবান সূত্র,' রাশেদ পাশা বললেন। 'পারলে আমিও তোদের সঙ্গে যেতাম টিমকে জিজ্ঞেস করার জন্যে। কিন্তু পারছি না। আরও জরুরী কাজ আছে আমার।'

ষোলো

ওয়ারনার মিলে পৌঁছে গার্ড লফারের কাছে একটা অপ্রত্যাশিত খবর শুনল কিশোর আর রবিন। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে টিমকে।

অবাক হয়ে জানতে চাইল রবিন, 'কেন?'

'আসলে তার আর দরকার নেই। ভেতরে তো তেমন কোন কাজ ছিল না ওর, বাইরেই যাতায়াত করত। গার্ডহাউসের কাজের জন্যে আমি আর ব্রাউনই যথেষ্ট। পারসোনেল ডিপার্টমেন্টকে বলেছি, ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ব্রাউন কে?'

'আমার সহকারী।'

মিলের ধারে সেদিন যাকে পাতাবাহারের ডাল ছাঁটতে দেখেছিল, সে-ই নিশ্চয় ব্রাউন, অনুমান করল কিশোর। 'টিম কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

'না। মাইলখানেক দূরের এক ফার্মহাউসে থাকত, এখনও ওখানে আছে কিনা বলতে পারব না।'

ফার্মহাউসের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে টিমকে খুঁজতে চলল কিশোর আর রবিন। যে রাস্তা দিয়ে এসেছে, সেটা ধরে মাইলখানেক ফিরে গেলেই পাওয়া যাবে বাড়িটা।

কিন্তু ওখানে পৌঁছে কোন খামারবাড়ি চোখে পড়ল না ওদের।

'একটা ভুল হয়ে গেছে,' রবিন বলল। 'মাইলখানেক এসে কোনদিকে যেতে হবে গার্ডকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'ওই পেট্রল পাম্পটায় চলো। জিজ্ঞেস করব।'

কিশোরের প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকাল পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট, 'পুরানো ফার্মহাউস?' হাত তুলে পশ্চিমে দেখাল, 'ওদিকে মাইলখানেক এগোলে একটা ফার্মহাউস পাওয়া যাবে। ওটাই খুঁজছ কিনা বলতে পারব না।'

টিমের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল কিশোর, ওরকম কোন ছেলেকে দেখেছে কিনা অ্যাটেনডেন্ট।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, 'হ্যাঁ, দেখেছি। দিনে অন্তত দুবার সাইকেল নিয়ে যাওয়া-আসা করে। পশ্চিমের কাঁচা রাস্তা ধরেও যেতে দেখেছি ওকে।'

অ্যাটেনডেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে রবিনকে স্টার্ট দিতে বলল কিশোর। পাম্প হাউস থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ এগোতে দেখা গেল একটা কাঁচা রাস্তা, তাতে গাড়ি নামিয়ে আনল রবিন। সরু, ধুলোয় ঢাকা পথ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি।

পথের মাথায় অনেক পুরানো, ঝরঝরে একটা বাড়ি দেখা গেল। সামনের চত্বরে বড় বড় ঘাস গজিয়েছে. সাফ করারও লোক নেই যেন।

'লোকজন কেউ নেই নাকি!' বিড়বিড় করল রবিন।

কিশোরেরও অবাক লাগল। 'এ রকম একটা জায়গায় থাকে কি করে টিম? নাকি অন্য কোন ফার্মহাউসে থাকে?'

গাড়ি রেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। টোকা দিল কিশোর। সাড়া নেই। জোরে থাপ্পড় দিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ আছেন?'

সাড়া এল না।

'হাজার টাকা দিলেও এখানে বাস করতে পারব না আমি,' রবিন বলল।

ভাঙা একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। 'তুমি ঠিকই বলেছ।

ভেতরে তেমন কোন আসবাবও নেই।'

'এখানে মানুষ বাস করে না, তুমি যাই বলো,' রবিন বলল।

'কিন্তু অ্যাটেনডেন্ট তো বলল টিমকে এদিকে আসতে দেখেছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'কেন?'

'দেখা দরকার।'

বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে শুরু করল ওরা। বাড়িতে কেউ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে। যে কটা জানালা দেখল, সবগুলো দিয়ে উঁকি দিল। রান্নাঘরের জানালায় উঁকি দিয়ে কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। 'লোক থাকে তো! নিশ্চয় টিম!'

ধুলোয় ঢাকা কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে কিশোরও দেখতে পেল, নড়বড়ে একটা টেবিলে কয়েকটা খাবারের টিন রাখা—সদ্য কাটা হয়েছে মুখগুলো, দুধের বাক্স আছে গোটা তিনেক—সেগুলোও নতুন, ওগুলোর পাশে একটা বড় বাটি।

'কোন ভবঘুরে হবে,' কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় না টিম এখানে থাকে।'

বাড়ির পেছনে দশ গজ দূরে একটা গ্যারেজ মত চোখে পড়ল ওদের। পাথরে তৈরি দেয়াল। কোনমতে একটা গাড়ি রাখা যাবে। জানালার বদলে দেয়ালের অনেক ওপরে একটা চারকোনা ফোকর।

'ফার্মের যন্ত্রপাতি রাখা হত বোধহয় ওখানে,' পা বাড়াল কিশোর। 'দেখি কি আছে।'

শক্ত কাঠের পুরানো ধাঁচের পাল্লা, ঝাঁপের মত ওপর দিকে তুলে দেয়া হয়। হুড়কো সরিয়ে টান দিতে নিঃশব্দে উঠে গেল ওপর দিকে। 'আশ্চর্য! রীতিমত তেল দেয়া হয় মনে হয় কব্জায়?'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই,' আঙুল তুলে ভেতরে নির্দেশ করল রবিন, 'ওই দেখো।'

গ্যারেজের ভেতরে সবুজ একটা ট্রাক। দরজার দিকে মুখ করা। এটাকেই আগের দিন সন্ধ্যায় ওয়ারনার মিল থেকে বেরোতে দেখেছিল ওরা। নম্বর প্লেটের জায়গায় কিছু নেই, নকল প্লেট যেটা লাগানো দেখেছিল রবিন, সেটাও খুলে ফেলা হয়েছে।

ট্রাকের কেবিনে ঢুকল দুজনে। কিশোর সূত্র খুঁজতে লাগল গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে। গদি আর সীটগুলো উল্টে দেখতে লাগল রবিন। আচমকা ফিসফিস করে বলল, 'শব্দ কিসের!'

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল সে। দরজার দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেছে পাল্লাটা। কিশোরও নেমে এল। ছুটে গেল সেদিকে। বাইরে হুড়কো তুলে দেয়ার শব্দ হলো।

'বন্দি করা হয়েছে আমাদের!' গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর।

ধাক্কা দিয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টা চালাল দুজনে। লাভ হলো না। পুরু কাঠের ভারী দরজায় সামান্যতম ফাটল ধরল না। ইস্পাতের শক্ত

কজাগুলোও ভাঙা সহজ নয়।

বেরোনোর উপায় খুঁজল ওরা। দেয়ালের চারকোনা ফোকরটার দিকে তাকাল। অনেক ওপরে ওটা। তা ছাড়া বেশি সরু, ওটা গলে বেরোনো যাবে না।

নিচের ঠোঁটে বার কয়েক চিমটি কাটল কিশোর। তারপর ট্রাকে উঠে হাতড়াল গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট। খালি একটা সিগারেটের প্যাকেট আগেই দেখেছে ওখানে। ওটা থেকে রাঙতা কাগজটা বের করে নিল।

কিশোর কি করতে চাইছে বুঝে ফেলল রবিন। তাকিয়ে রইল চুপচাপ।

ট্রাকের ইঞ্জিনের হুড তুলে ফিউজ বক্সের কাছে স্টার্টিং ওয়্যারের মধ্যে কাগজটা দলামোচড়া করে গুঁজে দিল কিশোর। মুখ তুলে রবিনের দিকে তাকাল, 'চেষ্টা করে দেখা যাক, কি বলো? এ ভাবে স্টার্ট করা গেলে দরজা ভেঙে বেরোনো যাবে।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রবিন। তার পাশে কিশোর। দুটো তার জুড়ে দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। যতটা যায় ট্রাকটাকে পিছিয়ে নিয়ে গেল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। 'শক্ত হয়ে বসো। দিলাম টান।'

গিয়ার দিয়ে এক্সিলারেটর চেপে ধরল সে। গর্জে উঠে ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ট্রাক। প্রচণ্ড গুঁতো লাগাল দরজায়।

সতেরো

মড়মড় করে ভাঙল দরজার কাঠ। কজা থেকে ছুটে গিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। গ্যারেজের বাইরে বেরিয়ে ব্রেক কষল রবিন। হাসিমুখে তাকাল কিশোরের দিকে। 'খুব সহজেই কাজ হয়ে গেল, তাই না?'

কিশোরও হাসল। 'কেন, তোমার আফসোস হচ্ছে নাকি?'

ট্রাক থেকে নেমে চারপাশে তাকাল দুজনে। লোকটাকে খুঁজল, যে ওদেরকে বন্দি করেছিল গ্যারেজে। কাউকে দেখা গেল না। ঢোকার আগে যেমন দেখেছিল এখনও তেমনই নির্জন লাগল জায়গাটাকে।

ফার্মহাউসের দিকে তাকাল রবিন, 'বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নেই তো?'

আগের মতই বন্ধ রয়েছে সমস্ত দরজা-জানালা। ময়লা শার্সির ভেতর দিয়ে আবার উঁকি দিল ওরা। এবারও কাউকে চোখে পড়ল না।

'নেই এখানে,' জানালার কাছ থেকে সরে এল রবিন। 'দরজা লাগিয়ে দিয়েই ছুটে পালিয়েছে। গাড়ি আনেনি, তাহলে এঞ্জিনের শব্দ শুনতাম।'

আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে লোকটাকে না পেয়ে গাড়িতে এসে উঠল দুজনে। ফিরে এল পেট্রল পাম্পে। তেল নিতে হবে।

অ্যাটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটাকে পেয়েছ?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন।

'কাছেই একটা বোর্ডিং হাউস আছে, মিসেস ম্যারিয়নের বোর্ডিং। ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

বোর্ডিং হাউসটা খুঁজে বের করতে কোন ঝামেলাই হলো না। মিসেস ম্যারিয়ন মাঝবয়েসী মহিলা। হাসিখুশি। জানালেন, টিম তাঁর ওখানেই উঠেছে। পুরো গ্রীষ্মকালটা থাকবে। ছেলেটার মা-বাবা তাঁর বন্ধু। গোয়েন্দাদের লিভিং রুমে বসিয়ে ওপরতলায় টিমকে ডাকতে গেলেন তিনি।

খানিক পর নেমে এল টিম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা। হঠাৎ করে চাকরি চলে যাওয়াতে দুশ্চিন্তায় বোধহয় অমন হয়েছে, অনুমান করল কিশোর। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো কেন, জানতে চাইল।

'আমি কিছুই জানি না,' মাথা নাড়ল টিম। 'মিস্টার লয়েড ডেকে বলল, আর আমার আসার দরকার নেই। আকাশ থেকে পড়লাম। মন খারাপ হয়ে গেল। বোর্ডিং হাউসে চলে এলাম। আরেকটা চাকরি খুঁজে বের করতে না পারলে এখানে আর থাকা হবে না।'

'টিম, তোমাকে চাকরি খুঁজে দিতে সাহায্য করতে পারি আমরা,' সহানুভূতির স্বরে বলল কিশোর। 'তবে তার আগে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। একটা রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা।'

কিশোর আর রবিন গোয়েন্দা শুনে উজ্জ্বল হলো টিমের মুখ। 'কি জানতে চাও, বলো?'

'গত হপ্তায় একটা সবুজ ট্রাক একটা সাপ্লাই ইয়ার্ডে গিয়েছিল পুরানো ইঁট আর তক্তা কেনার জন্যে,' কিশোর বলল। 'বিড ওয়াকার নামে আমাদের এক বন্ধুর বাবার ইয়ার্ড ওটা। ইয়ার্ডম্যান লয়েডের কাছে জেনেছি, ট্রাকে তোমার চেহারার একটা ছেলে ছিল। সেটা কি তুমি?'

'হ্যাঁ,' দ্বিধা না করে জবাব দিল টিম।

'ড্রাইভার কে ছিল?'

'মিস্টার ব্রাউন, ওয়ারনার মিলের লোক। আমাকে বলল, হাতে ব্যথা পেয়েছে, একা আনতে পারবে না জিনিসগুলো, সঙ্গে যেতে বলল সাহায্য করার জন্যে,' অবাক মনে হলো টিমকে। 'এটাই তোমাদের রহস্য?'

'হতে পারে। যাই হোক, শোনো, মালের দামের টাকা তোমার হাত দিয়ে দিয়েছে ব্রাউন। তার মধ্যে একটা বিশ ডলারের নোট ছিল, জাল।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল টিমের। 'জাল নোট! সত্যি বলছি, আমি কিচ্ছু জানি না!'

'যে নোট দিয়ে মালের দাম শোধ করেছে, সেগুলো ব্রাউনকে কে দিয়েছিল, জানো কিছু?'

মাথা নাড়ল টিম।

'পুরানো ইঁট আর তক্তা কিনেছিল কেন ব্রাউন?' জানতে চাইল কিশোর।

'মিস্টার লয়েড বলল, মিল মেরামতের জন্যে লাগবে ওগুলো। মিলের কাছে ট্রাক থামাল ব্রাউন। আমি আর লফার দুজনে মিলে সেগুলো মাটির নিচের ঘরে নিয়ে রেখেছি।'

'এখনও আছে ওখানেই?'

'থাকতে পারে। আমি আসার আগে পর্যন্ত বের করা হয়নি, এটুকু জানি।'

লফার আর ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ভাবল কিশোর। প্রসঙ্গ বদলাল। গুহার কাছে যেদিন পিকনিকে গিয়েছিল ওরা, সেদিন মিলের জানালায় টিমকে দেখতে পেয়েছিল। সে-ই কিনা, জিজ্ঞেস করল ওকে।

'আমিই,' স্বীকার করল টিম। 'গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তোমাদের। আমাকেই যে খুঁজতে গেছিলে, কিছুই জানি না আমি।'

'ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে দেখেছি জানালায়। সে বলল, ভুল দেখেছি। মিথ্যে কথা বলল কেন?'

'কি জানি। মিলের নিরাপত্তা নিয়ে হয়তো বেশি ভাবে। আমাকে বহুবার বলেছে, ভেতরের কথা যাতে বাইরের কাউকে না বলি।'

'ওখানে কাজ করার সময় কারখানায় সন্দেহজনক কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ?'

'না। তোমার সন্দেহ কোন ক্রিমিন্যাল ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে?' অবাক হয়ে একবার কিশোরের দিকে একবার রবিনের দিকে তাকাতে লাগল টিম।

মাথা নাড়ল ওরা দুজনেই।

'তা ভাবছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে তেমন কেউ আছে কিনা ওখানে, জানার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, তীর-ধনুক দেখেছ ওখানে কারও কাছে?'

'তীর-ধনুক!' আরও অবাক হলো টিম। 'না, দেখিনি, তাহলে নিশ্চয় মনে থাকত।'

আরেক প্রসঙ্গে গেল কিশোর, 'তোমাকে চিঠি নিয়ে যেতে দেখেছি আমরা, টিম। সব সময় কি বারনি মেলের কাছেই নিয়ে যেতে?'

'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন করে জানা গেল, শুধু ওই বিল্ডিঙেই চিঠি নিয়ে যেত না টিম, রকি বীচের বাণিজ্যিক এলাকার আরও কয়েকটা অফিসে যেত।

'সব সময় বিল্ডিঙের লবিতেই তোমার সঙ্গে দেখা করত বারনি মেল?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'খামের মধ্যে কি থাকত?'

'লফার বলেছে, ওর মধ্যে ওয়ারনার করপোরেশনের বুলেটিন আর ফর্ম আছে, প্রিন্ট করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে।'

'সব সময় খামের গায়ে ব্যক্তিগত কথাটা লেখা থাকত?'

'থাকত।'

'তোমার কি মনে হয়? সত্যি ফর্ম আর বুলেটিন থাকত, নাকি অন্য কিছু?'

এক মুহূর্ত ভাবল টিম। 'আমি জানি না। কৌতূহল হয়নি কখনও, তাই খুলে দেখার কথাও মনে হয়নি। আমি ভেবেছি বারনি মেল ছাপাখানার লোক। তার হাতে খামটা তুলে দিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করেছি।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। টিমের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন যে পেটমোটা ম্যানিলা খামটা দেখেছে, ওতে সত্যিই সাধারণ কাগজ ছিল বলে বিশ্বাস হতে চাইল না ওদের।

আবার টিমের দিকে ফিরল কিশোর, 'আরেকটা প্রশ্ন, বারনি মেল দেখতে কেমন?'

'মাঝারি উচ্চতা, গাট্টাগোট্টা, চোখা নাক। চোখে সানগ্লাস পরে থাকে।'

'গাট্টাগোট্টা, চোখা নাক!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'সানগ্লাস!' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'ওরকম কাকে দেখেছি আমরা?'

উত্তেজনায় পিঠ সোজা হয়ে গেল রবিনের। 'স্টেশনের সেই লোকটা! মুসাকে বিশ ডলারের জাল নোট ধরিয়ে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠেছিল যে!'

অতি জরুরী একটা সূত্র পাওয়া গেছে। উত্তেজিত হয়ে উঠল দুই গোয়েন্দা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'টিম, বারনি মেলকে দেয়ার জন্যে খামটা কে দিয়েছিল লফারকে?'

'সরি, এই প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলাম না। জানি না আমি।'

বারনি মেল কোথায় থাকে, জানতে পারলে হত, ভাবল কিশোর। রকি বীচেই থাকে?

'টিম,' কথা বলল রবিন, 'তোমাকে একটা পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে যেতে দেখেছে পাম্প হাউসের অ্যাটেনডেন্ট। যাওয়ার কোন কারণ ছিল?'

'হ্যাঁ। লফার বলল ওখানে একজন বুড়ো মানুষ থাকে। বেচারা! তার অবস্থা খুব খারাপ। আমি যেন হপ্তায় দুবার করে খাবারের টিন রেখে আসি বাড়ির সামনের বারান্দায়।'

'বেচারা বুড়ো মানুষটাকে দেখেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কিংবা সবুজ ট্রাকটা?'

কোনটাকেই দেখেনি টিম। জবাব শুনে অবাক হলো না গোয়েন্দারা। কিশোরের ধারণা, 'বেচারা বুড়ো মানুষটা' মোটেও বুড়ো নয়, স্বয়ং বারনি মেল, কোন কারণে গিয়ে লুকিয়েছে ওই পোড়ো বাড়িতে। ট্রাকটাও লুকিয়ে রেখেছিল।

চুপ করে ভাবতে লাগল রবিনও। যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, ট্রাকটার মালিক জালিয়াতরা। কিন্তু ওদের সঙ্গে স্যাবটারদের কি সম্পর্ক? পলাতক আর্চারের সঙ্গেও কি এসবের কোন সম্পর্ক আছে? বারনি মেলের কাছে খামে ভরে

কোন ধরনের মেসেজ সে-ই পাঠাচ্ছে না তো?

কিশোর ভাবছে, ওদের হুমকি দিয়ে চিঠি লিখল কে? আর্চার? নাকি তার কোন সহযোগী, যে ওয়ারনার কোম্পানিতে চাকরি করে?

টিমের দিকে তাকাল কিশোর, 'টিম, অসুবিধে না হলে এক কাজ করো না, আমাদের সঙ্গে চলো। যতদিন এ কেসের সমাধান না হয়, আমাদের বাড়িতেই থাকবে। তদন্তে সাহায্য করতে পারবে আমাদের। করবে?'

তদন্তে সাহায্যের জন্যে আসলে প্রস্তাবটা দেয়নি কিশোর। তার অনুমান, বোর্ডিং হাউসে নিরাপদ নয় টিম, মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে; বলা যায় না, অনেক কিছু জানে বলে মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে খুনও করে ফেলা হতে পারে ওকে।

কিশোরের প্রস্তাবে আনন্দে লাফিয়ে উঠল টিম। তখনই গিয়ে মিসেস ম্যারিয়নকে বলল। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডটা চেনেন মহিলা, তিন গোয়েন্দার নামও শুনেছেন। টিমকে ওখানে থাকতে দিতে রাজি হলেন।

টিম একটা বিপদের মধ্যে আছে, এ কথা জানিয়ে মিসেস ম্যারিয়নকে অনুরোধ করল কিশোর, কোন অপরিচিত লোক যদি এসে টিম কোথায় আছে জানতে চায়, তিনি যেন না বলেন; তাতে ছেলেটার বিপদ হতে পারে।

মিসেস ম্যারিয়ন বললেন, 'আচ্ছা।'

আঠারো

টিমকে ইয়ার্ডে নিয়ে এল কিশোর। তুলে দিল মেরিচাচীর জিম্মায়।

চাচা নেই বাড়িতে। চাচীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেছেন তিনি। বলে গেছেন, সারা দিনে নাও ফিরতে পারেন।

ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করল কিশোর। পরিত্যক্ত ফার্মহাউসটায় কি ঘটেছে, সব বলল।

'আমি এখুনি এফ-বি-আইকে জানিয়ে দিচ্ছি,' ক্যাপ্টেন বললেন। ট্রাকে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কিনা, ওরাই দেখবে। আরেকটা কথা, ওয়ারনার কোম্পানিতে খোঁজ নিয়েছি, আর্চারের চেহারার কোন লোক নেই ওখানে।'

লাঞ্চের পর আলোচনায় বসল কিশোর আর রবিন। টিমকেও সঙ্গে রাখল। ঠিক হলো, ওদের এর পরের কাজ হবে খামে করে কি মেসেজ নিয়ে যেত টিম, সেটা জানা।

'ওয়ারনার কোম্পানিতে গিয়ে অফিসের লোককে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা,' রবিন বলল, 'লফারের কাছে খামটা কে পাঠাত?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'ওরা যদি কিছু না বলতে চায়? টপ-সিক্রেট কাজ

করছে ওরা, যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া বাইরের লোকের কাছে মুখ খুলবে কেন?'

'চেষ্টা করে দেখতে অসুবিধে কি?'

আরও কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে রিসিভার তুলে ওয়ারনার মিলের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ফোন করে জানতে চাইল কিশোর, কোম্পানির প্রিন্টিঙের কাজগুলো ওরা কোন ছাপাখানা থেকে করায়। অ্যাকাউন্টিং ক্লার্ককে জানাল সে, সে-ও একটা কোম্পানির ক্লার্ক; ওরাও ছাপার কাজ করাবে, তাই ঠিকানাটা জানতে চাইছে।

কোন রকম সন্দেহ করল না ওয়ারনার কোম্পানির ক্লার্ক। জানিয়ে দিল কোথায় করায়।

কিশোর রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল রবিন, 'কোথায় করায়?'

'ওদের নাকি নিজেদেরই ছাপাখানা আছে, মিলের সীমানার ভেতরে।'

'তারমানেই ঘাপলা!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'টিমকে দিয়ে বারনি মেলের কাছে পাঠানোর জন্যে লফার যে খামগুলো পেত, সেগুলো ওয়ারনার কোম্পানির নয়, অন্য কারও দেয়া।'

ওদের কথাবার্তা কেবল শুনছেই টিম, কিছু বুঝতে পারছে না, রহস্যময় লাগছে সবকিছু। শেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি অন্যায় কিছু করেছি?'

টিমের দিকে তাকাল কিশোর, 'না। কে করেছে সেটাই বুঝতে চাইছি।'

গেটের কাছে এঞ্জিনের বিকট শব্দ শোনা গেল। ভেতরে এসে ঢুকল শব্দটা।

'মুসা এসেছে!' রবিন বলল।

দরজায় দেখা দিল মুসা। ঝকঝকে সাদা দাঁত সব বের করে হেসে বলল, 'হাই, কেমন আছ তোমরা? আমি এখন ওয়ারনার কোম্পানির কর্মচারী। এই দেখো ব্যাজ,' বুকে লাগানো চারকোনা কার্ডটা দেখাল সে। তাতে ওর একটা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি লাগানো। 'যতক্ষণ কাজ করব, পরে থাকতে হবে এটা। ওখানে যারা কাজ করে সবাইকেই পরতে হয়। এমনকি প্রেসিডেন্টকেও।'

ঘরের ভেতর আরেক পা এগিয়ে আসার পর টিমের ওপর চোখ পড়ল ওর। 'আরি, তুমি?'

'ওকে নিয়ে এলাম এখানে,' কিশোর বলল।

সকালে সে আর রবিন যা যা করে এসেছে, সব খুলে বলল মুসাকে।

'খাইছে!' সব শোনার পর চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তারমানে দ্রুত ঘুরতে আরম্ভ করেছে ঘটনার চাকা!'

হাসল রবিন, 'বাহ্, আজকাল কবিত্ব করে কথা বলতে শুরু করেছ দেখি।'

'সহজ করেই তো বললাম, কবিতার কি দেখলে?'

ওদের কথায় কান নেই কিশোরের, কি যেন ভাবছে। উত্তেজনা ফুটেছে

চেহারায়। 'মূসা, ওয়ারনারের সবাইকেই ব্যাজ পরতে হয়?'

'বললামই তো, প্রেসিডেন্টকেও। কেন?'

'কাল বিস্ফোরণের আগে সবুজ ট্রাকটাকে যখন ঢুকতে দিল গার্ড, ড্রাইভারের ব্যাজ বা আইডেনটিটি কিন্তু দেখতে চায়নি!'

'তাই তো!' ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'লফারের মত কড়া গার্ড ড্রাইভারের আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইল না কেন?'

'একটাই কারণ, ড্রাইভারকে চেনে ও।'

'তুমি বলতে চাইছ, জালিয়াত, স্যাবটার, সবার সঙ্গেই যোগাযোগ আছে লফারের? তার সহযোগিতায়ই স্যাবটাররা সবুজ ট্রাকে করে ডিনামাইট নিয়ে ভেতরে ঢুকে বোমা ফিট করে রেখে পালিয়ে গেছে নির্বিঘ্নে?'

'শুধু লফারই নয়, ওর সঙ্গে ব্রাউনও আছে।'

হাঁ হয়ে গেছে মূসা। 'কি বলছ!'

'ঠিকই বলছি। ওদেরকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। লফার নিজে টিমকে বলেছে খামটা বাইরের কোন ছাপাখানায় পাঠানো হচ্ছে, অথচ ওয়ারনার কোম্পানির নিজস্ব ছাপাখানা আছে, নিজেদের সব কাজ ওরা সেই প্রেসেই করায়। আমরা সেদিন মিলের জানালায় টিমকে দেখলাম, কিন্তু ব্রাউন বলল আমরা ভুল দেখেছি। দুজনেই মিথ্যে কথা বলল কেন? আজ সকালে হঠাৎ করে ওকে বরখাস্তই বা করল কেন?'

বুঝতে পেরে মূসাও উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'যাতে আমরা ওর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করতে না পারি!'

'ঠিক। ওদের ভয়, টিম এমন সব তথ্য জানে, যেটা ওদের জন্যে বিপজ্জনক। ওর সঙ্গে আমরা কথা বললে ওদের অনেক মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে। চাকরিতে থাকার সময় বাইরের কারও সঙ্গে ওকে কথা বলতে দিত না এ জন্যেই।' টিমের দিকে তাকাল কিশোর। 'সাইকেল নিয়ে পড়ে যাওয়ার পর আমরা তোমাকে সাহায্য করেছি, খামটা দেখেছি, এ কথা লফার কিংবা ব্রাউনকে বলেছিলে?'

'না,' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে টিম। 'তোমাদের কথায় মনে হচ্ছে লফার আর ব্রাউন অপরাধী। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'জোর করে আমিও কিছু বলতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'সবই অনুমান। ওদেরকে অপরাধী বলার আগে আরও প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।' থামল সে। এক এক করে দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'সবুজ ট্রাকটার মালিক গেটের ওই দুই গার্ডও হতে পারে। গোপন কাজে ব্যবহার করে। লুকিয়ে রাখে পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে।'

'আর,' সুর মেলাল রবিন, 'বারনি মেল ওদের সহযোগী। একই দলের লোক।'

'এবং,' বলল কিশোর, 'আরও একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না—টিমের সাইকেলটা এমন জায়গায় রাখা হত, রাতের বেলা যখন ইচ্ছে ব্যবহার করতে কোন অসুবিধে হত না ওদের। তীর ছুঁড়ে আমাদের হুমকি

দেয়া হয়েছে যে জায়গায়, সেটা মিল থেকে দূরে নয়। বনের মধ্যে আমাদের পিটিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছে যেখানে, সেটাও মিলের কাছাকাছি। মুসার গাড়িতে নোট রেখে যাওয়া হয়েছে মিলের গেটের কাছেই। প্রথম দিন যখন চাকরি চাইতে গেল মুসা, ওকে ঢুকতে দিচ্ছিল না লফার। চাকরি খালি আছে কিনা, পারসোনেল অফিসে ফোন করে জানতে চাওয়াটাও ওর একটা ভান ছিল। কাউকে ফোন না করেই অহেতুক রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কথা বলেছে, "চাকরি নেই" বলে দিয়েছে মুসাকে।'

'আরও একটা ব্যাপার,' এক আঙুল তুলল রবিন, 'মিলের মধ্যে যাতায়াত করা ওদের জন্যে সহজ, কারণ ওরা সিকিউরিটির লোক। কারও সন্দেহ না জাগিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারে।'

এরপর কি ভাবে এগোনো যায়, চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। অবশেষে মুখ তুলে বলল, 'সমস্ত প্রশ্নের জবাব রয়েছে ওই মিলের মধ্যে। জানতে হলে ওখানেই যেতে হবে। আজ রাতেই যাওয়া যাক, কি বলো?'

মুসা বা রবিন, কারোরই আপত্তি নেই।

কিশোর বলল, 'ভাবছি, বিডকেও খবর দেব। ওর সাহায্যের দরকার আছে।'

ফোন করল কিশোর।

বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল বিড। 'মনে হচ্ছে রহস্যের কিনারা করেই ফেলেছ?'

'অনেকটা। এলেই জানতে পারবে,' জবাব দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর।

উনিশ

সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় মুসার গাড়িতে চাপল কিশোর, মুসা, রবিন আর বিড।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাশে দাঁড়ানো টিমকে বলল কিশোর, 'তোমাকে সঙ্গে নিতে পারলে খুশিই হতাম, টিম, কিন্তু অহেতুক ঝুঁকি নেয়া হবে।'

'কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারতাম,' বিষণ্ন স্বরে বলল টিম।

'তোমাকে যা করতে বলেছি, ঠিকমত সেটা করতে পারলেই অনেক সাহায্য হবে আমাদের। ঠিক এগারোটা, মনে থাকে যেন।'

'থাকবে,' মাথা কাত করল টিম।

ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে মিলের দিকে গাড়ি চালাল মুসা। গেটের কাছ থেকে একশো গজ দূরে থাকতে গাড়ি থামাল। সে আর বিড নেমে কিশোর ও

রবিনের উদ্দেশে হাত নেড়ে ঢুকে গেল বনের মধ্যে।

ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন, 'প্ল্যানমত কাজ হলেই হয় এখন।'

জবাব দিল না কিশোর। চুপ করে ভাবছে।

গাড়ি ঘোরাল রবিন। পেট্রল স্টেশনটায় এনে ঢোকাল। একধারের খালি জায়গায় পার্ক করে নেমে এগোল ফোন বুদের দিকে। পকেট থেকে বের করল এক টুকরো কাগজ। তাতে ওয়ারনার মিলের গেটহাউসের নম্বর লিখে দিয়েছে টিম।

রিসিভারের মাউথপিস রুমাল দিয়ে ঢেকে নিল রবিন। ওপাশ থেকে সাড়া এল, পরিচিত একটা কণ্ঠ বলল, 'গেটহাউস। লফার বলছি।'

গলার স্বরটাকে আরেক রকম করে রবিন বলল, 'আমি বারনি। একটা গোলমাল হয়ে গেছে। জনসন বিল্ডিঙের বাইরে দুজনেই দেখা করো। জলদি আসবে।'

লাইন কেটে দিল রবিন।

গড়িতে ফিরে এল সে। অন্ধকারে বসে থাকা কিশোরকে জানাল, 'কথা বলেছি।'

পাম্প থেকে বেরিয়ে আবার মিলের দিকে গাড়ি ছোটাল রবিন। দশ মিনিটের মধ্যে পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে যাওয়ার সরু রাস্তাটায় পৌছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল গাড়িটা।

গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল দুজনে। বড় একটা ওক গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে মুসা আর বিড। ইঙ্গিতে ডাকল ওদেরকে। এগিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। গেটহাউসটা দেখা যায় এখান থেকে।

'কাজ হয়েছে!' উত্তেজিত স্বরে জানাল বিড, 'পনেরো মিনিট আগে আলো নিভিয়ে দিয়ে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেছে লফার আর ব্রাউন।'

'হেঁটে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'গুড। বাসে করে যাবে। তাতে সময় বেশি পাব আমরা।'

বিড আর মুসাকে ওখানে বসে নজর রাখতে বলে রবিনকে নিয়ে মিলের দিকে এগোল কিশোর। অন্ধকার। কিন্তু টর্চ জ্বালা নিরাপদ মনে করল না সে। কাছে এসে দেখল, মিলের ঘরগুলোর দরজা-জানালা সব বন্ধ। গাছের ডালে বাতাসের শব্দ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পুরানো বিশাল চাকাটার গোঙানি আর ক্যাঁচকোঁচ।

মিলটার মধ্যেই খোঁজার ইচ্ছে কিশোরের, ওখানে থাকে দুই গার্ড, ওদের বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া গেলে ওখানেই যাবে।

বাড়িটার কাছে এসে সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই থেমে গেল হুইল। অকস্মাৎ নীরবতা। অবাক হয়ে অন্ধকারে পরস্পরের মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল দুজনে।

'গেল মনে হয় আটকে,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'সেদিনকার মত!'

'একটা ব্যাপারে খুব অবাক হচ্ছি আমি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'সেদিনও যখন হলো, চাকাটার কাছ থেকে ঠিক এতটাই দূরে ছিলাম আমরা।'

সিঁড়ি থেকে নেমে এল সে। হুইলটার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ আবার গুঙিয়ে উঠে চালু হয়ে গেল ওটা।

গেটহাউসের দিকে এগোল কিশোর। কেন যাচ্ছে, কিছু না বুঝে রবিনও চলল কিশোরের সঙ্গে। আবার বন্ধ হয়ে গেল হুইল।

রবিনও বুঝে ফেলল এখন, 'হুঁ, ইলেকট্রিক-আই বসানো দরজার মতই কাজ করছে চাকাটাও!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কাছে গিয়ে, সরে গিয়ে এটাই বুঝতে চেয়েছিলাম। চাকাটাকে মেরামত করে নিয়ে সিগন্যাল দেয়ার যন্ত্র বানানো হয়েছে। যান্ত্রিক প্রহরী। রাতে কেউ চুরি করে ঢুকলে যাতে ওটা সঙ্কেত দিতে পারে। ওটাকে ঘোরানোর মোটরের সঙ্গে সেট করা আছে ইলেকট্রিক-আই। ওই যান্ত্রিক চোখের দৃষ্টিপথে বাধা পড়লে, অর্থাৎ ইনভিজিবল বীমের সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেই সঙ্কেত চলে যায় নিয়ন্ত্রক যন্ত্রে, অফ করে দেয় মোটরটাকে, থেমে যায় চাকা। বীমের সামনে থেকে সরে গেলেই আবার চালু হয়ে যায় মোটর। কিছু কিছু জায়গার আলোও নিভে যায়, কারণ চাকা ঘোরানোর জেনারেটর থেকে লাইন দেয়া হয়েছে ওগুলোর।'

বীমের উৎস কোনখানে, খুঁজতে লাগল ওরা। ময়দা রাখার পুরানো পিপার মধ্যে লুকানো রয়েছে যন্ত্রটা। দেখলে মনে হবে, অতি সাধারণ একটা পিপাকে ফুল গাছ লাগানোর টব বানানো হয়েছে। কল্পনাও করবে না কেউ ওটার মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তাতে খাপে খাপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে একটা বিশেষ যন্ত্র আর সেটাকে চালানোর জন্যে বড় ব্যাটারি। পিপাতে জন্মানো গাছটা আড়াল করে রেখেছে সব যন্ত্রপাতি। খুব ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না কিছু।

একটা ঝোপের ভেতর লুকানো একটা আয়নাও খুঁজে পাওয়া গেল, ওটা যন্ত্রের চোখ। অনুপ্রবেশকারীর ছবি আয়নায় পড়লে বিশেষ পদ্ধতিতে সেটা পাচার করে দেয়া হয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের মগজে। কাজ শুরু করে সেটা। খুঁজলে এ রকম আয়না আরও কয়েকটা পাওয়া যাবে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। আয়নাগুলো এমন অ্যাঙ্গেলে বসানো, যে কোন দিক থেকেই ঢুকুক না কেন অনুপ্রবেশকারী, কোন না কোন আয়নার মধ্যে তার ছবি পড়বেই।

ফটো-ইলেকট্রিক সিসটেমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এদিক দিয়ে চুরি করে যাতে কেউ মিলে ঢুকতে না পারে, সে জন্যে।

'বুদ্ধিটা নিশ্চয় লফার আর ব্রাউনের,' রবিন বলল। 'অবৈধ কিছু একটা করছে ওরা এখানে, লুকিয়ে রাখতে চাইছে, নইলে এতসব ঝামেলার মধ্যে যেত না। ঢোকা যায় কি করে, বলো তো?'

এদিক দিয়ে ফটো-ইলেকট্রিকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢোকা সম্ভব নয়।

মিল-বাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে চলে এল ওরা। তাতে চাকা বন্ধ হলো না। কিন্তু ভেতরে ঢোকার কোন পথও দেখতে পেল না। সমস্ত জানালাগুলোর পাল্লা ভেতর থেকে বন্ধ। সামনের দরজায় তালা দেয়া।

'এদিক দিয়ে ঢোকা যাবে না,' রবিন বলল।

বাড়িটার চারপাশে আরেকবার চক্কর দিয়ে এল ওরা। হুইলটা ঘুরছে। ওটার ওপরের দিকে তাকাতে একটা জানালা দেখতে পেল রবিন। চাকাটার ঠিক ওপরে একটা ঘর। একটা জানালার পাল্লা খোলা আছে ওখানে। কিশোরের হাত খামচে ধরে দেখাল সে।

'ওটাই একমাত্র পথ,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'চলো, উঠে পড়ি।'

বিশ

উঠে পড়ার কথাটা সহজেই বলে ফেললেও ওঠা অত সহজ হলো না। অনেক মিলের হুইলের পাশে মই লাগানো থাকে, কিছু নষ্ট হলে ওপরে উঠে মেরামত করার জন্যে। কিন্তু এটাতে সেরকম কিছু নেই। উঠতে হলে একটা উপায়ই আছে। চাকার কোন একটা প্যাডেল ধরে ঝুলে থাকা। ঘুরতে ঘুরতে যখন ওপরে উঠে যাবে ওটা, তখন ছেড়ে দিয়ে ওপরের প্লাটফর্মে নেমে যাওয়া। সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ। হাত ফসকে নিচে পড়ে গেলে মারাত্মক জখম হবে। মারাও যেতে পারে।

কিন্তু আর কোন উপায় না দেখে ঝুঁকিটা নিল কিশোর। সরে গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াল রবিন, যাতে ইলেকট্রিক-আইয়ের অদৃশ্য রশ্মিতে বাধা পড়ে। থেমে গেল হুইলটা। এই সুযোগে একটা প্যাডেল ধরে ঝুলে পড়ল কিশোর। রবিন সরে যেতেই ঘুরতে শুরু করল চাকাটা। ওপরে উঠতে লাগল কিশোর।

দাঁড়িয়ে না থেকে হুইলের গতি কম থাকতে থাকতে কিশোরের নিচের আরেকটা প্যাডেল ধরে ফেলল রবিন। হ্যাঁচকা টান লাগল হাতে। কিন্তু পরোয়া করল না সে। ঝুলে রইল।

কি ভয়ানক ঝুঁকি নিয়েছে দুজনে, প্যাডেল ধরার পর বুঝতে পারল। সারাক্ষণ পানিতে ভিজে থেকে এমনিতেই পিচ্ছিল হয়ে আছে চাকার গা, তার ওপর শ্যাওলা জন্মে আরও পিচ্ছিল করে ফেলেছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না এ ভাবে।

কিছুটা ওঠার পরই আঙুলগুলো পিছলে যেতে লাগল রবিনের। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল সে। ওপরের জানালাটা মনে হলো অনেক দূরে রয়েছে, কিছুতেই কাছে আসতে চাইছে না।

কিশোরের অতটা অসুবিধে হচ্ছে না, তার কারণ চাকাটা থেমে থাকার

সময় প্যাডেল ধরেছে সে, ধরতে পেরেছে ভালমত। প্লাটফর্মের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পা রাখল ওটাতে, হাত সরিয়ে আনল প্যাডেল থেকে। এই সময় চিৎকার করে উঠল রবিন, 'কিশোর, আমার হাত পিছলে যাচ্ছে!'

নিচু হয়ে ঝুঁকে বসে থাবা মারল কিশোর। রবিনের বাঁ হাতটা ছুটে গেছে ইতিমধ্যেই। অন্য হাতটাও যাচ্ছে। ধরে ফেলল ওই হাতের কব্জি। অনেক কসরত করে তুলে আনল ওকে প্লাটফর্মে। বসে হাঁপাতে লাগল দুজনেই।

মিনিটখানেক জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। জানালা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কাঠের মেঝে মড়মড় করে উঠল ওদের পায়ের চাপে। কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আলো জ্বালতে সাহস করল না। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তাকাতে লাগল।

'মনে হচ্ছে পুরানো পেষাইয়ের ঘরটাতে ঢুকেছি,' ঘরের মাঝখানের দুটো বিশাল পাথরের সিলিন্ডারের মত জিনিস দেখাল কিশোর। ওগুলো জাঁতা, অন্ধকারে স্পষ্ট নয়, আবছা অবয়ব শুধু দেখা যাচ্ছে।

'ঠিক,' একমত হলো রবিন। 'ওই যে চোঙা, যেটা দিয়ে জাঁতার মধ্যে শস্য ঢালা হত।'

বহুদিন আগে মিলটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এখনও ঘরের বাতাসে রয়ে গেছে শস্যের শুকনো, ভাপসা গন্ধ। দুই কিনারে চারপায়া ফেলে রাখা হয়েছে। একধারে একটা সাধারণ তাক, তাতে কাপড়-চোপড় রাখা।

জাঁতাগুলোর নিচে ঝনঝন করে পড়ল কি যেন। চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। মেঝের তক্তার ফাঁক দিয়ে হলদে আলো চোখে পড়ল।

'কেউ আছে!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। দম নিতে ভয় পাচ্ছে। কে আলো জ্বালল নিচের ঘরে?

উত্তেজনাটা অসহ্য হয়ে উঠল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। উবু হয়ে বসে তক্তার ফাঁক দিয়ে নিচে উঁকি মেরে দেখে উঠে দাঁড়াল, 'কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিচে গিয়ে দেখা দরকার।'

অন্ধকারে নামতে গেলে কিসের মধ্যে পা পড়ে শব্দ হয়ে যায়, এই ভয়ে টর্চ না জ্বেলে আর পারল না ওরা। তবে টর্চের কাঁচে হাত চাপা দিয়ে নিল যাতে আলোটা না ছড়ায়। সাবধানে এগিয়ে একটা দরজা খুঁজে বের করল। ওপাশে খাটো একটা প্যাসেজ। তার ওপাশে সিঁড়ি।

ছোট একটা হলঘরে নেমে এল ওরা। সামনে আধখোলা আরেকটা দরজা। ওটার ভেতর দিয়ে আলো আসছে।

সেদিকে পা বাড়াল ওরা। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল স্নায়ু। দরজার কাছে এসে সাবধানে অন্য পাশে উঁকি দিল কিশোর। দিয়েই ঢিল করে দিল শরীর।

'কি আছে?' ফিসফিস করল রবিন।
ওকে তাজ্জব করে দিয়ে হেসে ফেলল কিশোর।
'হাসছ কেন!'
'নিজেই দেখো,' সরে জায়গা করে দিল কিশোর।
ফেলে রাখা একটা জাঁতার ওপর বসে আছে একটা বিশাল সাদা বেড়াল। ধীরে ধীরে নাড়ছে লেজের ডগাটা। একটা টেবিলে উল্টে পড়ে আছে একটা টেবিল ল্যাম্প।
রবিনও হেসে ফেলল। বুঝতে পারল, বেড়ালটাই লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ে ল্যাম্প উল্টে দিয়েছে। সুইচে চাপ লেগে আলো জ্বলে উঠেছে। 'নিশ্চয় আমাদের সাড়া পেয়ে লাফ দিয়েছিল।'
বিশাল হুইলের গিয়ার আর শ্যাফট রয়েছে এ ঘরটায়। তবে একধারে বসবাসেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বর্তমান বাসিন্দাদের। দুটো চেয়ার দেখা গেল, জিনিসপত্র উপচে পড়ছে ওগুলোতে। আর আছে একটা টেবিল ও একটা আলমারি। মেঝেতে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে একটা খবরের কাগজ।
'সন্দেহ করার মত কিছু নেই এখানে,' রবিন বলল। 'চলো, অন্য ঘরগুলোতে দেখি।'
আবার ওপরতলায় উঠে এল দুজনে, একেবারে তিনতলার ঘরে। লোক নেই বুঝে আলো জ্বালতে আর দ্বিধা করল না। শস্য রাখার গুদাম ছিল এটা এক সময়। এখন নানা রকম বাতিল আসবাবে ভর্তি।
'কই,' দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'কোন কিছু এখানে লুকানো আছে বলে তো মনে হয় না।'
মিলের সব কটা ঘরে খুঁজে দেখল ওরা। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না।
হতাশ হয়ে যাচ্ছে রবিন, 'খামোকাই সন্দেহ করলাম নাকি লফার আর ব্রাউনকে!'
কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি নয় কিশোর, 'আসল জায়গাটাই দেখিনি এখনও, মাটির নিচের ঘর—সেলার।'
রান্নাঘরে নেমে এল ওরা। সেলারে নামার সিঁড়ির দিকে এগোল। হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠল রবিন। কি যেন ওর প্যান্ট ছুঁয়ে গেছে।
শাঁই করে টর্চের আলো ঘুরিয়ে দিল কিশোর। আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুটো জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ।
'বেড়ালটা!' বোকা হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করল রবিন। 'বার বার চমকে দিচ্ছে শয়তানটা!'
শব্দ করে হেসে ফেলল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে পা রাখল সিঁড়িতে।
সেলারে নামল ওরা। ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা আবহাওয়া। লম্বা, সরু একটা ঘর। ছোট ছোট দুটো জানালা আছে। পাথর আর সুড়কি দিয়ে তৈরি তিন দিকের সাধারণ দেয়াল। চতুর্থ দেয়ালটায় বসানো সারি সারি কাঠের

তাক।

ঘরের সমস্ত জায়গায় আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল দুজনে।

'কিছুই নেই,' আবার হতাশা ফুটল রবিনের কণ্ঠে। 'ঠেলাগাড়ি, বেলচা, শাবল, কুড়াল—অতি সাধারণ সব জিনিস।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল একবার কিশোর। 'পুরানো ইঁট আর তক্তাগুলো কই? টিম যে বলল নিচের তলার ঘরে রাখা হয়েছে ওগুলো?'

'তাই তো! এখানেই তো সব, রাখার আর তো কোন জায়গাও দেখছি না।'

তাকগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। নানা রকম যন্ত্রপাতি রাখা আছে। একটা হাতুড়ি তুলে আনার জন্যে হাত বাড়াল সে।

অবাক হয়ে গেল। তুলতে পারল না। ব্যাপার কি? ভাল করে লক্ষ করতে দেখল, সব যন্ত্র আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে তাকের সঙ্গে।

'রবিন!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এ ভাবে আটকে রাখার নিশ্চয় কোন কারণ আছে! এটা কোন ধরনের ক্যামোফ্লেজ!'

'তারমানে তাকগুলো নড়ানো যায়? নড়চড়ায় যাতে পড়ে না যায় জিনিসগুলো, সেজন্যে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছে?'

'এ ছাড়া আর কি! বিডদের ইয়ার্ড থেকে আনা কাঠগুলোরও সন্ধান পেয়ে গেছি মনে হয়। এগুলোই। ওই তক্তা দিয়েই এই তাক বানানো হয়েছে।'

'তাহলে ইঁটগুলো কোথায়?'

'মনে করে দেখো, বহুকাল আগে ঔপনিবেশিকরা মিলটা তৈরি করেছিল এখানে। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত কখন আক্রমণ করে বসে শত্রু ইনডিয়ানরা। নানা রকম গুপ্তঘর তৈরি করে রাখত যাতে দরকার পড়লেই তার মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে...'

'বুঝেছি! ইঁটগুলো ওরকম কোন গুপ্তঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মিলের মধ্যে গুপ্তঘর বানানোর সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হলো এই সেলার।'

'তাই। এখানে একমাত্র অস্বাভাবিক জিনিস এই তাকগুলো। আমার ধারণা, গুপ্তঘরে ঢোকার গুপ্তদরজা এটাই।'

'খোলে কি করে?'

তাক এবং আশেপাশের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখতে লাগল দুজনে। টেনে দেখল, চাপ দিয়ে দেখল, কিছুই ঘটল না। অবশেষে একদম নিচের তাকটায় কাঠের একটা গিট চোখে পড়ল কিশোরের। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল ওটা।

মোটরের মৃদু গুঞ্জন তুলে প্রায় নিঃশব্দে তাকগুলোর মাঝখানের গোপন পাল্লা সরে গিয়ে একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল। নিয়মিত গ্রীজ মেখে সচল করে রাখা হয়, বোঝা গেল।

'এই তো গুপ্তঘরের দরজা!' বলে উঠল কিশোর।

ভেতরে ঢুকল ওরা। প্রথমেই চোখে পড়ল মেঝে। নতুন করে ইঁট

বসানো হয়েছে। দরজার পাশের দেয়ালে সুইচ দেখে সেটা টিপে দিল কিশোর।

নিচু ছাতে ঝোলানো দুটো হাই পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে উঠল। হঠাৎ এই উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারল না চোখ। মিটমিট করতে লাগল। চোখে আলো সয়ে এলে দেখতে পেল ছোট একটা ছাপার মেশিন, হাতে চালানো হয়।

'জালিয়াতদের ছাপাখানা!' ভুরু কুঁচকে ফেলল রবিন।

ঘরের পেছনে একটা টেবিলে রাখা ক্যামেরা, খোদাই করার যন্ত্রপাতি, জিঙ্ক প্লেট, বড় একটা ট্রে—তাতে অসংখ্য ছোট ছোট খোপ, সেগুলোতে নানান রকমের রঙ। আর আছে টেবিলের একধারে রাখা একটা টাইপ রাইটার। পাশে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া কিছু কাগজ।

এক তা কাগজ তুলে নিয়ে মেশিনের রোলারে পরাল কিশোর। কয়েকটা লাইন টাইপ করে কাগজটা খুলে এনে রবিনকে দেখাল।

'এই মেশিন দিয়েই নোটগুলো লেখা হয়েছিল, কোন সন্দেহ নেই,' একবার দেখেই বলে দিল রবিন। 'আমরা তদন্ত করলে ধরা পড়ে যেতে পারে, এই ভয়ে আগেই হুমকি দিয়ে ঠেকাতে চেয়েছিল আমাদের।'

'আর এই যে দেখো আসল জিনিস!' যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়ে থাকা এক বান্ডিল বিশ ডলারের নোট দেখাল কিশোর। 'সব নকল।'

এক কোণে ধনুকটাও খুঁজে পেল রবিন। তিনটে তীর ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে। তুলে নিয়ে দেখল একটা। 'ঠিক এই জিনিসই ছোঁড়া হয়েছিল সেদিন গুহার কাছে।'

'ব্রাউনের সঙ্গে আর্চারের চেহারা আর শরীরের গঠন মিলে যায়,' কিশোর বলল। 'কেবল চুলের রঙ বাদে। রঙ করে চুলের রঙ বদলে নেয়াটা এমন কোন ব্যাপার নয়।'

'এখন বুঝলাম, হুইলের সঙ্গে ইলেকট্রিক-আইয়ের কারসাজি কেন করে রেখেছে লফার আর ব্রাউন। ওরা এখানে কাজ করার সময় কেউ যদি চলে আসে, চাকাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে সতর্ক করে দেবে ওদের।'

'বারনি মেলের কাছে খামে করে কি পাঠানো হত, তাও বুঝতে পারছি এখন—বিশ ডলারের জাল নোটের বাণ্ডিল।'

'প্রমাণ তো পাওয়া গেল,' কতগুলো নোট তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রবিন। 'পুলিশকে জানাতে হবে এখন।'

বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে ওরা, ঠিক এই সময় নিভে গেল আলো। বরফের মত জমে গেল যেন দুই গোয়েন্দা। আলো নেভার মানে হলো চাকাটা থেমে গেছে।

কম্পিত স্বরে বিড়বিড় করল রবিন, 'কেউ আসছে!'

একুশ

তাড়াতাড়ি সেলারে ফিরে এল দুজনে। আবার জ্বলে উঠল আলো। বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে ওদের। সিঁড়ির গোড়ায় এসে শুনতে পেল সামনের দরজার তালা খোলার শব্দ।

'লফার! ব্রাউন! কোথায় তোমরা?' ডাক শোনা গেল।

কান খাড়া করে আছে দুই গোয়েন্দা। কেটে পড়ার উপায় খুঁজছে।

নিচ তলার ঘরে ঢুকল লোকটা। মেঝেতে তার জুতোর শব্দ হচ্ছে।

'দৌড় দেব নাকি?' ফিসফিস করে বলল রবিন।

এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল দুজনে। রান্নাঘরের বন্ধ দরজার তক্তার ফাঁক দিয়ে আলো আসতে দেখল। আচমকা নিভে গেল আলোটা। ঘড়ঘড় করে আবার চলতে শুরু করল হুইল।

আবার স্থির হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

'আরও কেউ আসছে!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'এবার নিশ্চয় লফার আর ব্রাউন। আটকা পড়লাম আমরা।'

আবার খুলে গেল সামনের দরজা। জোরে, রাগত স্বরে কথা বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল দুজন লোক। পায়ের শব্দ এগিয়ে এল ঘরের দিকে।

'বারনি, তুমি এখানে!' ব্রাউনের গলা চিনতে পারল ছেলেরা। 'কোথায় ছিলে? কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা!'

'কি বলছ?' বারনি অবাক। 'তোমাদেরকে তো বলেছিই রাত এগারোটায় এখানে দেখা করব।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!' খেঁকিয়ে উঠল লফার। 'এক ঘণ্টা আগেই তো ফোন করে বললে আবার নাকি কি গোলমাল হয়ে গেছে, জনসন বিল্ডিঙের সামনে আমাদের দেখা করতে।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বারনির কণ্ঠ, 'মাথা আসলে তোমাদের খারাপ! আমি ফোন করতে যাব কেন? রেডিও আছে আমার কাছে, জানো। হয়েছেটা কি তোমাদের?'

'বুঝেছি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল লফার, 'অন্য কেউ করেছে তোমার নাম করে। গলা শুনে তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার। কিন্তু কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি। তার আগেই লাইন কেটে দিল। ভাবলাম, তোমার রেডিও বুঝি খারাপ হয়ে গেছে, সে জন্যেই ফোনে কথা বলেছ।'

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে জালিয়াতদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

গর্জে উঠল ব্রাউন, 'কিছু একটা ঘটছে! ফোন যে করেছে, নিশ্চয় আমাদের ওপর সন্দেহ হয়েছে তার। ফোন করে আমাদের সরিয়ে দিয়েছে

যাতে এখানে এসে নিরাপদে খোঁজাখুঁজি করতে পারে।'

'এফ-বি-আই না তো!' ভয় ফুটল লফারের কণ্ঠে। 'পালানো দরকার!'

'এত তাড়াতাড়ি কিসের!' ধমকে উঠল ব্রাউন। 'ভয় পাচ্ছ কেন? কেউ ঢুকল কিনা আগে দেখা দরকার। সেলারে দেখতে হবে। এসো।'

রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'নামো! গুপ্তঘরটায় ঢুকে পড়তে হবে! আর কোন উপায় নেই!'

সোজা এসে জালিয়াতদের কারখানায় ঢুকল দুজনে। পাল্লা লাগিয়ে ভারী ছিটকানিটা তুলে দিল কিশোর। দরজায় কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল ওপাশে কি ঘটে শোনার জন্যে।

সেলারে নামল লোকগুলো। ওদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

'কই, কেউ তো নেই এখানে,' ব্রাউন বলল। 'আমি বাকি ঘরগুলো দেখতে যাচ্ছি। তোমরা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যাও। বাইরে অপেক্ষা কোরো। আমি দেখা করব ওখানে। কুটারের আজ টাকা দেয়ার কথা। দিলেই নিয়ে গায়েব হয়ে যাব। এখানে কাজ করা আর নিরাপদ না।'

কিশোরের কানে কানে বলল রবিন, 'ভাল বিপদে পড়লাম! এখানেই আসছে।...কোন্ সুড়ঙ্গের কথা বলল ওরা?'

'কুটারটাই বা কে?'

গুঞ্জন করে উঠল মোটর। কিন্তু গুপ্তদরজার পাল্লা খুলল না। ছিটকানি লাগানো থাকায় আটকে রয়েছে।

'অ্যাই, মেকানিজম কাজ করছে না তো!' বলে উঠল লফার।

'আটকে গেছে হয়তো,' বারনি বলল। 'চেষ্টা করতে থাকো।'

কয়েকবার চেষ্টা করেও দরজা খুলতে পারল না ওরা। শেষে ভারী কিছু দিয়ে পেটাতে শুরু করল জোরে জোরে। ভাঙার চেষ্টা করছে।

'কি ব্যাপার?' ব্রাউনের গলা। শব্দ শুনে ফিরে এসেছে।

'কি আর,' জবাব দিল বারনি। 'দরজা ফেঁসে গেছে। তোমার সাধের ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি আর কাজ করছে না।'

'বাজে কথা বোলো না!' গর্জে উঠল ব্রাউন। 'এ ভাবে আটকে যেতে পারে না দরজা। নিশ্চয় কেউ আছে ওপাশে। ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছে। ভাঙো! জলদি করো!'

আবার বাড়ি পড়তে লাগল দরজায়।

'কুড়াল দিয়ে কোপাচ্ছে!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'এবার কি করব?'

'বেরোতে হবে!'

'রাস্তা কই?'

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। 'ওরা সুড়ঙ্গের কথা বলল। এ ঘর থেকেই বেরিয়েছে সুড়ঙ্গটা। খোঁজো। তাড়াতাড়ি করো।'

সুড়ঙ্গের মুখ খুঁজতে আরম্ভ করল দুজনে। নতুন করে ইঁট বিছানো হয়েছে

মেঝেতে। হয়তো সুড়ঙ্গমুখটা ঢেকে দেয়া হয়েছে, ভেবে, একটা একটা করে ইঁট তুলে ফেলতে লাগল ওরা। কিন্তু বেরোল না সুড়ঙ্গে নামার ট্র্যাপডোর।

'নেই!' হতাশ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল রবিন।

ওদিকে দরজায় কুড়াল পড়ছে দমাদ্দম।

'পুরানো তক্তা, সাংঘাতিক শক্ত,' কিশোর বলল। 'নরম হলে এতক্ষণে ভেঙে যেত। এটাও আর বেশিক্ষণ টিকবে না।'

হাত তুলল রবিন, 'ওই যে, বেঞ্চের নিচে!'

ভাঙা পাথর আর আলগা মাটি স্তূপ হয়ে আছে একটা বেঞ্চের ওপাশে। এ পাশে একটা বেলচা পড়ে আছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। একটানে বেঞ্চটা সরিয়ে ফেলল। দেয়াল ঘেঁষে থাকা মাটির স্তূপের দিকে তাকিয়ে রইল একটা মুহূর্ত। পরক্ষণে বেলচাটা তুলে নিয়ে খোঁচা মারল স্তূপের মধ্যে।

রবিনও উঠে এল। দু'হাতে খামচি মেরে মেরে মাটি সরাতে লাগল। বুঝে গেছে, এই স্তূপের ওপাশেই লুকানো আছে সুড়ঙ্গমুখ।

পেছনে কড়মড় করে কাঠ ভেঙে পড়ার শব্দ হলো। ফিরে তাকাল রবিন। একটা ফোকর হয়ে গেছে দরজার পাল্লায়। কুড়ালের আঘাতে ক্রমে বড় হচ্ছে সেটা।

'আর দুই-তিন কোপ!' চিৎকার করে বলল ব্রাউন। 'জলদি করো!'

আরও জোরে বেলচা চালাল কিশোর। রবিনও আঙুল দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল কুকুরের মত। চোখা পাথরে খোঁচা লেগে চামড়া কাটছে, নখ ভেঙে গেল একটা, কেয়ারই করল না সে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ব্যথাও টের পাচ্ছে না।

অবশেষে বেরিয়ে পড়ল একটা গোল ফোকর। বেলচার আরও কয়েকটা খোঁচা মেরে ফোকরটাকে আরেকটু বড় করে হামাগুড়ি দিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল কিশোর। পেছনে ঢুকল রবিন।

ঠিক এই সময় পেছনে শোনা গেল প্রচণ্ড মড়মড় শব্দ। ভেঙে পড়েছে দরজার পাল্লা।

লফারের চিৎকার শোনা গেল, 'সুড়ঙ্গে ঢুকেছে! ধরো, ধরো!'

কিছু দেখার বা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না দুই গোয়েন্দা। অন্ধকারে হাত-পায়ে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। পেছনে থাকায় বুঝতে পারল রবিন, কেউ পিছু নিয়েছে ওদের। সুড়ঙ্গে জায়গা একেবারেই কম। মুখোমুখি হয়ে যে লড়াই করে বাধা দেবে তার উপায় নেই।

সরু, আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গে যতটা সম্ভব গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। পাথরে ঘষা লেগে হাঁটু আর কাঁধ ছড়ে যেতে লাগল। পরোয়া করল না। বাঁচতে হলে বেরিয়ে যেতে হবে এই সুড়ঙ্গ থেকে। কোথায় যাচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না। সঙ্গে টর্চ আছে। কিন্তু খুলে এনে জ্বালানোরও সময় নেই। আরও একটা কারণে জ্বালতে সাহস পাচ্ছে না, লোকটার চোখে পড়ে যাবার ভয়ে।

এ সুড়ঙ্গের যেন শেষ নেই, মনে হলো ওদের। ভেজা, বদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অক্সিজেন কমে এসেছে, বোঝা যায়। সামনে পথ রুদ্ধ নয় তো? তাহলে মরেছে!

পেছনে শোনা যাচ্ছে লোকটার এগিয়ে আসার শব্দ। ক্ষণিকের জন্যে বিরতি দিচ্ছে না।

সামনে আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড় ঘুরে অন্য পাশে বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল হঠাৎ ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে ছাত। শেষ মাথায় বোধহয় চলে এসেছে, আশা হলো কিশোরের। জন্তুর মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগল সে।

কিছুক্ষণ পর আচমকা থেমে গেল। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রবিন। 'কি হলো?'

'সামনে বন্ধ!'

চেপেচুপে কিশোরের পাশে চলে এল রবিন। হাত বাড়িয়ে দেখল, সামনে পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে আছে পথ। পেছনে আসা লোকটার হাঁপানোর শব্দ কানে এল।

'সরাতে হবে,' বলল কিশোর।

বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে কাজে লেগে গেল দুজনে। কয়েকটা পাথর সরাতেই মুখে এসে লাগল তাজা বাতাস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা। বুক ভরে টেনে নিল অক্সিজেন। দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে লাগল।

কোনমতে বেরোনোর মত একটা ফোকর তৈরি হতেই মাথা গলিয়ে দিল কিশোর। শরীরটাকে মুচড়ে বের করে নিয়ে এল অন্য পাশে।

রবিনও বেরিয়ে এল।

টর্চ জ্বালল কিশোর। চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'রবিন, দেখো, নদীর পাড়ের সেই গুহাটা! আমরা যে পাথরগুলো সরিয়ে ছিলাম, সেগুলো দিয়ে আবার কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল মুখটা।'

গুহামুখের দিকে ছুটল দুজনে।

'মনে হয় পারব পালাতে!' আশা হলো রবিনের।

'তাই, না?' গুহামুখের কাছ থেকে বলে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

দুটো টর্চের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল গোয়েন্দাদের মুখে। প্রায় অন্ধ করে দিল। অস্পষ্ট ভাবে দেখল, উদ্যত পিস্তল হাতে গুহায় ঢুকল লফার আর ব্রাউন।

বাইশ

'তিন গোয়েন্দা!' বলে উঠল একজন।

কিশোর আর রবিনকে চিনতে পেরে লোক দুটোও অবাক।

খেঁকিয়ে উঠল ব্রাউন, 'তোমরাই তাহলে খুঁজতে গিয়েছিলে সেলারে!'
ছেলেদের পেছনের সুড়ঙ্গে পাথর সরানোর শব্দ শোনা গেল। হাঁসফাঁস করতে করতে বেরিয়ে এল মাঝবয়েসী, গাট্টাগোট্টা একজন লোক। চিনতে পারল ওকে গোয়েন্দারা: বারনি মেল।
হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল বারনি, 'এরা এখানে কি করছে?'
'ভাল প্রশ্ন!' চোখ গরম করে বারনির দিকে তাকাল লফার। 'তুমি তো বলেছিলে ওদেরকে ট্রাকের সঙ্গে গ্যারেজে আটকে রেখেছ!'
গুঙিয়ে উঠল বারনি, 'তাই তো রেখেছিলাম! বেরিয়ে চলে এসেছে!'
'ঠিকমত আটকাতে না পারলে তো আসবেই,' বারনির ওপর ব্রাউনও অসন্তুষ্ট হলো। গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল সে, 'কি করে বেরোলে?'
শীতল দৃষ্টিতে তার চোখে চোখে তাকিয়ে রইল কিশোর, 'সেটা জানার দরকার নেই আপনার।'
সঙ্গীদের দিকে ফিরল ব্রাউন, 'ভাগ্যিস এদিক দিয়ে আসার কথা ভেবেছিলাম, নইলে এবারও পালিয়ে যেত বিচ্ছু দুটো।'
গম্ভীর হয়ে গেল বারনি, 'অহেতুক ধমকাচ্ছ আমাকে। ভুল আমি একাই করিনি। দুদিন আগেই বলেছিলাম তোমাদের, টিমকে সরিয়ে দাও। তাহলে আর গন্ধ শুঁকে এগোতে পারত না এরা।'
লোকগুলো যখন কথা বলছে, কিশোরের মাথায় তখন ভাবনা চলেছে, কি করে ওদের ফাঁকি দিয়ে পালানো যায়। তার মনের কথা পড়ে ফেলেই যেন পিস্তল নাড়ল লফার, 'খবরদার, নড়লেই গুলি করব!'
ব্রাউনের ওপর ঝাল ঝাড়া বন্ধ হয়নি বারনির। 'তা ছাড়া বার বার ছেলেগুলোকে সাবধান করতে না গিয়ে এদেরও খতম করে দেয়া উচিত ছিল। ওদের গাড়িতে একটা ডিনামাইট রেখে দিলেই আর কিছু লাগত না, ল্যাঠা চুকে যেত।'
কথা বলে লোকগুলো সময় নষ্ট করাতে মনে মনে খুশি হলো কিশোর। মুসা আর বিড আসার সুযোগ পাবে।
ঘড়ি দেখল ব্রাউন। 'কুটারই বা অত দেরি করছে কেন? এতক্ষণে তার চলে আসার কথা।'
'কুটার কে?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'আপনাদের আরেকজন জালিয়াত বন্ধু?'
জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল ব্রাউন। বারনি চুপ করে রইল। হেসে উঠল লফার। 'না, জালিয়াতির ও কিছু জানে না। এটা কেবল আমাদের তিনজনের গোপন ব্যবসা। যদিও ওয়ারনার কোম্পানিতে কাজটা সেই জোগাড় করে দিয়েছে আমাকে আর ব্রাউনকে...'
বাধা দিল ব্রাউন, 'ওদের বলছ কেন!'
'তাতে কি? ওরা তো বেরিয়ে গিয়ে কাউকে কিছু বলতে পারছে না। ওদের কৌতূহল না হয় মেটালাম, মরার আগে ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছেও

পূরণ করা হয়।'

লফারের দিকে তাকাল কিশোর। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল সে, 'ওয়ারনার মিলে সবুজ ট্রাকটা ঢুকতে দেয়ার জন্যে কে আপনাদের ঘুষ দিয়েছে?'

ঝট করে তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে।

'কে বলেছে তোমাদের?' কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল লফার।

'বলেনি। অনুমান।'

কাঁধ ঢিল করে দিল লফার, 'দেয়নি এখনও। আজ রাতে দেবে। সেটার জন্যেই অপেক্ষা করছি। ছোট্ট একটা কাজ করে দিয়েছি ওর।'

তবে কি কুটারই স্যাবটারদের দলের নেতা?—ভাবতে লাগল কিশোর আর রবিন। একসঙ্গে দুটো অপরাধ করেছে লফার আর ব্রাউন। নোট জালিয়াতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিন্যালদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ওদের ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দিয়েছে।

বরফ-শীতল গলায় কিশোর বলল, 'ডিনামাইট দিয়ে বিল্ডিং উড়িয়ে দেয়াকে একটা ছোট্ট কাজ বলছেন?'

চমকে গেল তিন জালিয়াত। চোখের পাতা সরু হয়ে এল লফারের, 'কি বললে!'

খোঁত খোঁত করে নাক টানল রবিন। 'আপনারা জানতেন না ট্রাকের মধ্যে ডিনামাইট ছিল?'

লফার জবাব দেয়ার আগেই ওর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল বারনি। 'সর্বনাশ করেছ, গাধার দল! টাকার লোভে স্যাবটারদের ঢুকতে দিয়েছ তোমরা। কোনভাবে জানতে পারলেই হয়, পুলিশ আর ফেডারেলের লোকে ছেয়ে ফেলবে এখানটা!'

ছাই হয়ে গেল চেহারা। পিস্তলটা আরেকটু তুলে ধরল গোয়েন্দাদের দিকে। কাকে আগে তাক করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'থামো!' বাধা দিল ব্রাউন। 'খুন করে বিপদ আরও বাড়াবে নাকি! কুটার এলেই টাকা নিয়ে চলে যাব। এমন জায়গায় ডুব দেব, পুলিশের বাপেও ধরতে পারবে না।'

'আর্চার নামে আপনিই তীর ছোঁড়া শেখাতেন এক সময়, তাই না?' আচমকা ব্রাউনের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।

'তাও জানো! এ রকম বিচ্ছু জানলে তোমাদের ওপরই তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করতাম।'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল কিশোর আর রবিন। কায়দা করে লোকগুলোর পেট থেকে কথা আদায় করে নিল, বিশেষ করে লফারের। জবাব দেয়ার জন্যে যেন মুখিয়েই আছে সে। জানা গেল, কয়েক মাস আগে একদিন কুটার এসে লফার আর ব্রাউনকে প্রস্তাব দিল, ওয়ারনার মিলে চাকরি করার। গেট পাহারা দিতে হবে। ভাল বেতন।

লোভনীয় চাকরি, নিয়ে নিল ওরা। কয়েক দিন পর কুটার এসে ওদের

পটাল, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক পাওয়া গেছে, খুব অল্প দামে, ওদের কেনা উচিত। কাজে লাগবে। তাও কিনল ওরা। একদিন ট্রাকটা একটা কাজের জন্যে ধার চাইল কুটার। বলল, কারখানা ছুটির সময় ট্রাক নিয়ে ভেতরে ঢুকবে সে, একটা বিশেষ কাজ সেরে আবার বেরোবে, এর জন্যে মোটা টাকা দেয়া হবে দুজনকে। তাতেও রাজি হয়ে গেল ওরা।

লফার আর ব্রাউন দুজনেই অপরাধী, ভিন্ন স্টেটে জেল খেটে এসেছে জাল নোট বানানো আর প্রতারণার অভিযোগে। রকি বীচে এসে ছদ্মনামে চাকরি নিয়েছে ওয়ারনার কোম্পানিতে। মিল হাউসে থাকতে গিয়ে দেখল সেলার আর পাশের গুপ্তকক্ষটা। সুড়ঙ্গটাও আবিষ্কার করল। দুষ্ট বুদ্ধি মাথা চাড়া দিল মনে। গুপ্তকক্ষে টাকা বানানোর কারখানা বসাবে ঠিক করল ওরা। ট্রাকটাকে ব্যবহার করল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বয়ে আনার কাজে।

'ইলেকট্রিক-আই বসানোর বুদ্ধিটা কার?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমার,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল ব্রাউন।

জানা গেল, বারনি মেল ওদের পরিচিত। সেও জেল খাটা আসামী। সেও যোগ দিল দুই জালিয়াতের সঙ্গে। জাল টাকা সরবরাহ করার দায়িত্ব নিল। বুড়ো মানুষ সেজে পোড়ো ফার্মহাউসটাতে বাস করতে লাগল।

'টিমের সাইকেলটা নিয়ে গিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে চিঠি রেখে এসেছিলেন কে?' লফার আর ব্রাউনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনি, না আপনি?'

'আমি,' জবাব দিল লফার।

'কেন, চাচাকে হুমকি দেয়ার দরকার পড়ল কেন? চাচা তো আর জাল নোটের তদন্ত করছিল না।'

'মনে করেছিলাম, করছে। পার্সোনেল অফিসে সেদিন ম্যানেজারকে কথা বলতে শুনলাম। ফোনে বলছিল, "রাশেদ পাশা কেসটা নিয়েছেন"। মনে করলাম টাকা জালের তদন্ত করতে আসবে সে। আগেই হুমকি দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলাম।'

'হুঁ, চোরের মন পুলিশ পুলিশ,' ব্যঙ্গ করল রবিন।

রাগে চেহারা বিকৃত করে ফেলল বারনি। লফার আর ব্রাউনের দিকে তাকাল। 'বেশি চালাকি করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলে তো! একজন গেলে চিঠি দিয়ে আসতে, একজন করলে ফোন···চমৎকার! বোঝো এখন ঠেলা!'

'শুধু কি তাই,' খোঁচা মেরে বারনিকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে বলল কিশোর, 'ইয়ার্ড থেকে পুরানো ইঁট আর তক্তা কিনে আনার সময় একটা বিশ ডলারের জাল নোটও ধরিয়ে দিয়ে এল সেলসম্যানের হাতে।' লফারের দিকে তাকাল সে, 'আপনিই করেছিলেন কাজটা, তাই না?'

রাগে কথা হারিয়ে ফেলল বারনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল গুহার মেঝেতে। বিড়বিড় করে বলল, 'আগে জানলে এই গর্দভদের সঙ্গে কে কাজ করত!'

এঞ্জিনের শব্দ কানে এল। বাড়ল সেটা। একটা মোটর বোট আসছে। গুহার বাইরে নদীর পাড়ে থামল সেটা।

গুহায় ঢুকল ভারী শরীরের কালো চুলওয়ালা একজন লোক।

ফিরে তাকাল লফার, 'কুটার!'

'ছেলে দুটো কে?'

'এর নাম কিশোর, ও রবিন; তিন গোয়েন্দা…'

'তিন গোয়েন্দা!' তীক্ষ্ণ হলো আগন্তুকের কণ্ঠ। 'মানে রাশেদ পাশার ভাতিজা…' সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'শোনো, বিপদ আসছে। এইমাত্র জেটিতে রাশেদ পাশাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি, অনেক কষ্টে, সেজন্যেই আসতে দেরি হয়েছে। পুলিশের লঞ্চে উঠেছে দেখলাম।'

'তারমানে এখনই পালাতে হবে!' জরুরী গলায় তাগাদা দিল লফার, 'যা দেবার দিয়ে দাও। চলে যাই এখান থেকে।'

'বোকা গাধার দল!' তিক্তকণ্ঠে বলল কুটার। 'তোমাদের সাহায্য নিতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছিল আমার, কয়েকটা ছেলের সঙ্গে যারা পেরে ওঠে না…' পকেট থেকে মানিব্যাগ নিয়ে কয়েকটা নোট বের করে দিল সে। 'এই নাও, তোমাদের ফি। নিয়ে কেটে পড়ো, আমিও বাঁচি। বাঁচতে চাইলে এ শহরের ত্রিসীমানায় থাকবে না।'

'আমাদের গালাগাল করছ কেন?' সমান তেজে ফুঁসে উঠল ব্রাউন। 'তুমিও কম নও। যদি জানতাম স্যাবটারদের সঙ্গে কাজ করছি, জিন্দেগিতে তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।'

চমকে গেল মনে হলো কুটার।

সুযোগটা লুফে নিল কিশোর, 'আমরা সবাই জানি আপনি স্যাবটারের দলের লোক। এ কাজের জন্যে কে টাকা দিচ্ছে আপনাকে? ওয়ারনার কোম্পানির সেই বেঈমান লোকটি কে?' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর, 'ল্যাবরেটরির কেউ?'

কুঁচকে গেল কুটারের ভুরু। 'ও, তাও আন্দাজ করে ফেলেছ! ভাল গোয়েন্দাই দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের আন্ডারএস্টিমেট করা উচিত হয়নি এই গাধাগুলোর। বুদ্ধিমান ছেলে, সেজন্যেই তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি—একটা বিদেশী কোম্পানি টাকা দিচ্ছে আমাকে মিসাইল কোম্পানিগুলোতে স্যাবটাজ করার জন্যে, যাতে সাকসেসফুল না হতে পারে ওরা। ল্যাবরেটরি চীফ হোগারফের হাত দিয়ে। আরও শুনবে? তোমার চাচা যেদিন ল্যাবরেটিতে ঢুকল, সেদিন আমি আর আমার এক অ্যাসিসট্যান্ট ডিনামাইট ফিট করছিলাম। হোগারফের নির্দেশে সেদিনই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম রাশেদ পাশাকে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল।'

উঠে দাঁড়াল বারনি। 'তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমি আর এ সবের মধ্যে নেই! আমি গেলাম!'

কেউ বাধা দেয়ার আগেই গুহা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'আমিও যাই,' কুটার বলল।

'এগুলোকে কি করব?' ছেলেদের দেখাল ব্রাউন।

'সেটা তোমাদের ব্যাপার। তোমাদের টাকা পাওনা ছিল, দিয়ে দিয়েছি, আমার কাজ শেষ। আমি যাচ্ছি।'

'এ ভাবে আমাদের ঝামেলার মধ্যে ফেলে বিদেয় হচ্ছ!' ককিয়ে উঠল লফার।

'ঝামেলাটা তোমরা পাকিয়েছ, তোমরাই এর সমাধান করো, আমার কি করার আছে?' গুহামুখের দিকে পা বাড়াল কুটার।

'দাঁড়াও!' কঠিন স্বরে আদেশ দিল ব্রাউন। 'আর এক পা এগোলেই গুলি করব!'

ফিরে তাকিয়ে ব্রাউনের উদ্যত পিস্তলের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল কুটার।

দাঁতে দাঁত চাপল ব্রাউন, 'ঝামেলাটা আমরা করিনি, তুমি করেছ। তোমার কারণেই এই বিপদে পড়েছি। অতএব তোমাকেও যেতে দিচ্ছি না আমি। মরলে তোমাকে নিয়ে মরব।'

গুহামুখের দিকে ফিরে আছে রবিন আর কিশোর। একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো মূর্তি। মুসা আর বিড। দুজনের হাতে দুটো লাঠি।

চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া দেখে মুহূর্তের জন্যে মুখ ঘোরাল দুই জালিয়াত। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর আর রবিন। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ে ওদের পিস্তল ধরা হাত চেপে ধরল। ট্রিগারে চাপ লেগে ব্রাউনের পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে ঠেলা দিয়ে হাতটা ওপরের দিকে তুলে ফেলেছে কিশোর। ছাতে লাগল গুলি।

কিশোররা লাফ দিতেই মুসা আর বিডও লাফ দিয়েছে। এগিয়ে এসে ধাঁ করে কুটারের মাথায় লাঠি বসিয়ে দিল মুসা। বিড বাড়ি মারল লফারের মাথায়।

টুঁ শব্দ করতে পারল না দুজনের একজনও। জ্ঞান হারিয়ে নিঃশব্দে মাটিতে পড়ে গেল কুটার। লফারের হাতটা ছেড়ে দিল রবিন, সেও পড়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ওটা তুলে নিল রবিন।

ব্রাউনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে কিশোর।

মাথা সই করে বাড়ি মারল মুসা।

মাথা কাত করে ফেলল ব্রাউন। বাড়িটা ফসকে গিয়ে কাঁধে লাগল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। ডান হাতটা ঝটকা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে মুসার দিকে পিস্তল তুলতে গেল। পাশ থেকে হাতে বাড়ি মেরে পিস্তলটা ফেলে দিল বিড। মুসা মারল আরেক বাড়ি। তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বেশিক্ষণ আর সামলাতে পারল না ব্রাউন। অন্য দুজনের মত সেও জ্ঞান হারাল।

লাঠিটা ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা বলল, 'যাক, শোধ নিলাম। সেদিন আমাদের মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করেছিল, আজ আমরা

করলাম।'

হেসে বলল রবিন, 'কিন্তু আরেকটা যে বেঁচে গেল। ফেডারেল এজেন্টের নাম শুনেই প্যান্ট খারাপ করে ফেলল। পালিয়েছে।'

'না, পারেনি। ওটাকে আগেই বেহুঁশ করেছি,' ব্রাউনের পিস্তলটা তুলে নিল মুসা।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কিশোর। 'একেবারে সময়মত এসেছ।'

'তোমরা চলে যাওয়ার পর গেটহাউস আর মিলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম,' বিড বলল। 'হঠাৎ দেখি দুই দারোয়ান গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বনের দিকে ছুটল, যেন ভূতে তাড়া করেছে। মুসা আর আমি যুক্তি করে এরা কোথায় যায় দেখার জন্যে পিছু নিলাম।' পড়ে থাকা লোকগুলোকে দেখিয়ে বিড বলল, 'এগুলোকে কি করা যায়? দড়ি থাকলে বেঁধে রাখা যেত।'

'এক কাজ করো বরং, তুমি গিয়ে পুলিশ নিয়ে এসো। পিস্তল নিয়ে বসে এদের পাহারা দিই আমরা। গাড়িটা কোথায়?'

'কাছেই রেখে এসেছি, নদীর পাড়ে।'

'তাহলে আর দেরি করো না, চলে যাও।'

আধঘণ্টা পরই পুলিশ এসে ঢুকল গুহার ভেতর। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে রয়েছে আরও কয়েকজন পুলিশ। রাশেদ পাশাও আছেন সঙ্গে। আর আছে টিম।

বিডও ফিরে এসেছে। সে বলল, 'থানা পর্যন্ত যেতে হয়নি আমাকে। মুসাদের বাড়ির পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নামতেই দেখি পুলিশের গাড়ি।'

রাশেদ পাশা জানালেন, 'জেটিতে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাল কুটার। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। ঢুকতেই টিম জানাল, তোরা কোথায় গেছিস। তুই নাকি একটা মেসেজ দিয়ে এসেছিস আমার জন্যে।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কি মেসেজ?'

হাসল কিশোর, 'ওকে বলে এসেছিলাম, রাত এগারোটার মধ্যে যদি আমরা বাড়ি না ফিরি তাহলে যেন ক্যাপ্টেনকে ফোন করে জানায় কোথায় গেছি।'

'ওর কথা মত মিলে চলে গেলাম,' ফ্লেচার বললেন। 'মিলের মধ্যে ঢুকে সেলারে রাখা ছাপার মেশিন আর নোটগুলো দেখলাম। সুড়ঙ্গমুখটাও দেখেছি। রাশেদ পাশা বললেন একটা গুহার কথা নাকি বলেছ তোমরা। দুজনেই একমত হলাম, ওই গুহার সঙ্গে সুড়ঙ্গের যোগাযোগ থাকতে পারে। এদিকেই আসছিলাম, এই সময় বিডের সঙ্গে দেখা।'

চাচার দিকে তাকাল কিশোর, 'স্যাবটারদের সর্দারটা কে জানতে পেরেছ? আমরা কিন্তু জেনে গেছি।'

মুচকি হাসলেন রাশেদ পাশা, 'ল্যাবরেটরি চীফ, হোগারফ। অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম আমি তাকে। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিলাম না।'

'এখন প্রমাণ আছে?'

মাথা কাত করলেন রাশেদ পাশা, 'আছে।'

বন্দিদেরকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সঙ্গের পুলিশদের আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আরও একটা রহস্যের সমাধান করলে তোমরা। থ্যাংক ইউ। কাল থেকে আবার কোন নতুন রহস্যের সমাধানে লাগবে নাকি?'

'পেলে তো লাগবই,' জবাব দিল কিশোর।

'আর না পেলে?' বিড়ের প্রশ্ন।

'কত রকমের নমুনা লুকিয়ে আছে পুরানো মিলের মাটিতে,' হেসে বলল রবিন। 'মুসার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে নাকি কোনটার।'

রেগে গেল মুসা, 'ইয়ার্কি মেরো না! সময় মত ওটা না কিনলে এত তাড়াতাড়ি জাল নোটের রহস্য আর ভেদ করা লাগত না।'

****

ভলিউম ৩৩

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০